অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্

দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়

অযোধ্যার নবাব
ওয়াজেদ আলী শাহ্

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

শঙ্খ প্রকাশন
৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

© রুমা মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ ঃ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১
মে ১৯৮৪

প্রকাশক ঃ
দিব্যেন্দু সিংহ
শঙ্খ প্রকাশন
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ
নীরজ ঘোষ

মুদ্রাকর ঃ
অশোককুমার ঘোষ
নিউ শশী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৬

দাম—১৮·০০

উৎসর্গ

শ্রীজয়াদ্রিনাথ সান্ন্যাল

কল্যাণবরেষু

লেখকের অন্য গ্রন্থ

আসরের গল্প

শ্রীকৃষ্ণের ছেলেবেলা

লেখকের নিবেদন

নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্-র এই জীবনী প্রকাশের প্রাক্‌কালে অনেকদিন আগেকার কথা মনে পড়ছে। নবাবের নাম প্রথম শুনি পঞ্চাশ বছর আগে, ১৯৩৪ সালে; আমার কলেজ ছাত্র জীবনের ঠিক আগে। সেতারী ওয়ালিউল্লা খাঁর কাছে তখন সেতার বাজনা শিখতে আরম্ভ করেছি। খাঁ সাহেব ছিলেন মেটেবুরুজের বাসিন্দা। সেখান থেকে আমাদের খিদিরপুরে শেখাতে আসতেন। তাঁর বাবা, স্বনামধন্য শরদী কৌকব খাঁও অনেক বছর বাস করেছেন মেটেবুরুজে, প্রথম জীবনে। কৌকবের জন্মও মেটেবুরুজে, তাঁর বাবা নিয়ামতুল্লা শরদী মেটেবুরুজ নবাব দরবারে নিযুক্ত থাকার সময়ে। কৌকব খাঁর কবরও হয় মেটেবুরুজে। সুতরাং ওয়ালিউল্লা খাঁর সঙ্গে মেটেবুরুজের সম্বন্ধ তিন পুরুষের। তাঁর মুখেই ওয়াজেদ আলীর নাম প্রথম শুনেছি—মেটেবুরুজের নবাব হিসেবে।

ওয়ালিউল্লা খাঁর কাছে যে বাড়িতে আমরা সেতার শিখতুম তার সামনেই ছিল এক নবাব বাড়ি। সেটি ওয়াজেদ আলী বংশীয় এক শাখার আবাস, খিদিরপুরে। আমাদের বসত বাড়িও তার কাছে। খিদিরপুরে আমার সেই আশৈশব আবাস। সেই সেতারচর্চার পরিবেশে কজন প্রবীণ সঙ্গীতামোদীর সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁরাও খিদিরপুর নিবাসী। আর খিদিরপুরের অতি নিকট মেটেবুরুজ বলে, তাঁরাও ওয়াজেদ আলীর নাম করতেন তাঁর দরবারের সঙ্গে। সেই মেটেবুরুজ দরবারে নানা কলাবৎ ছিলেন, তাঁদের নামও কানে আসত। তখন থেকে সাতচল্লিশ বছর আগেও নবাব ওয়াজেদ আলী জীবিত ছিলেন আর তাঁর বিখ্যাত সঙ্গীত দরবারও ছিল মেটে-বুরুজে (১৮৮৭ পর্যন্ত)।

আমার সেতারচর্চা ক বছরের মধ্যেই একেবারে বিসর্জন দিতে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র জীবনের শেষেই। নিতান্ত বিরুদ্ধ পরিবেশে, পৈত্রিক ব্যবসায়ে আকণ্ঠ ডুবে থাকতে হত, মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় থেকে। সঙ্গীতের সঙ্গে সাহিত্যচর্চা যেটুকু ছিল—মাসিকপত্রে কবিতা, গল্প লেখা—বন্ধ হয়ে গেল। এক যুগ এই মরুজীবনে বিচরণের পর সাহিত্যজগতে আংশিক ফিরে আসি—প্রাণপণ চেষ্টায়, প্রাণেরই দায়ে, প্রাণের আরামে। গুণে না হতে পারে,প্রেমে সাহিত্যই আমার কাছে প্রথম আর দ্বিতীয় প্রেম—সঙ্গীতে, যার ব্যবহারিক চর্চায় বঞ্চিত হয়ে এ্যাকাডেমিক ব্যাপারে দাঁড়াল। সর্বনাশ সমুৎপন্নে···নিরুপায়ে ভাগ্যকে মেনে নিতে হল। আর স্বভাবের দোষে বা টানে সাহিত্য আর সঙ্গীত অঙ্গাঙ্গি হয়ে গেল। আমার সাহিত্যের বিষয়বস্তু হল, সঙ্গীত। কিছু সাঙ্গীতিক ইতিহাস আর বিগতযুগের গুণী কাহিনী নিয়ে আমার লেখা চলতে লাগল। সেদিকে কারও দৃষ্টি নেই দেখে—সেসব লুপ্ত হয়ে যাবার ভাবনায়—সচেতনভাবে এই দায়িত্ব নিই। এইসব সংগ্রহ আর একপ্রকার গবেষণারও মধ্যে নবাব ওয়াজেদ আলী আবার এসে পড়লেন, নতুন ভাবে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিশ শতকের প্রথমে নানা সঙ্গীতশিল্পীদের কথা পেতে থাকি, যাঁরা নবাবের দরবারী—লক্ষ্ণৌতে ও মেটেবুরুজে। তাঁর তুল্য সঙ্গীত-সভা সেকালের

ভারতে অল্পই ছিল। মুক্তহস্ত পোষকতা ভিন্ন নবাবের গান রচয়িতা এবং লেখক রূপেও কিছু পরিচয় পাই। তাঁর বিষয়ে প্রথম নিবন্ধ লিখি 'দেশ' পত্রিকায় (১৯৫৮) 'নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ ও তাঁর দরবার।'

তারপর আমার নানা বই (বিষ্ণুপুর ঘরানা, সঙ্গীতের আসরে, সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীতে কল্পতরু) বেরুবার সমকালীন নবাব সম্বন্ধেও অনেক তথ্য পাই, তাঁর বহুমুখী সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচিতি রূপে। তিনি কবি, গীত রচয়িতা গদ্য-(আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা ও পত্রসাহিত্য) লেখক, সেতারবাদক, সঙ্গীত তাত্ত্বিক, নৃত্যবিদ, নট, গায়ক, লক্ষ্ণৌ ঠুংরির অন্যতম প্রচারকর্তা। উপরন্তু তিনি এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি—অযোধ্যা নবাববংশের শেষ প্রতিনিধি। লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসিত হয়ে মেটেবুরুজ নিবাসী। তাঁর প্রথম জীবন নির্বাসন, ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দীত্ব, মেটেবুরুজে অবশিষ্ট পর্যায় যাপন ইত্যাদি বিষয়ে অতি প্রয়োজনীয় তাঁর স্বরচিত আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা। নবাবের কোন জীবনী না থাকায় এ কাজটিও হাতে নিই। সুবিধাও হল, কারণ তখন ফার্সী ভাষা চর্চা করতুম ফার্সী শিক্ষকের কাছে। পড়তে ও শ্রুতিলিখন করতে পারতুম। তাই নবাবের বই অনুবাদ শুরু করি। অবশ্য আমার সেই বিদ্যায় তা সম্ভব হত না—অভিজ্ঞ ফার্সী-উর্দুবিদের অকুণ্ঠ সাহায্য নিতে হয়।

নবাবের চারখানি মূল পুস্তকের অনুবাদ এই জীবনীতে দেওয়া হল—তারীখ-এ-পরীখানা (লক্ষ্ণৌতে নবাবের প্রথম জীবন ও হারেমের বৃত্তান্ত), রাধা কানহাইয়াকা এক কিস্সা (রাধাকৃষ্ণের এক প্রেমকাহিনী) হুজন-ই-আখতার (নির্বাসন, মেটেবুরুজে আগমন, গ্রেপ্তার, ফোর্ট উইলিয়মে বন্দী জীবন ইত্যাদি) ও তারীখ-এ-মুমতাজ (প্রিয় বেগমকে লেখা পত্রাবলী)।

অনুবাদগুলি সমেত নবাবের পূর্ণাঙ্গ জীবনী ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী'তে (১৯৬৮) প্রকাশ করতে থাকি। কিন্তু দশ সংখ্যার পর প্রাণসংশয় পীড়ার ফলে (করোনারি থ্রম্বসিস) তা বন্ধ হয়ে যায়, অসম্পূর্ণ অবস্থায়। বছর খানেক পরে কার্যক্ষম হই। তারপর সঙ্গীত বিষয়ে অন্যান্য বইগুলি বেরোয়—আসরের গল্প, দরবার নটী কলাবন্ত ('দেশ' পত্রিকায় আগে অনেকাংশে প্রকাশিত), বাঙালীর রাগসঙ্গীতচর্চা, ভারতীয় সঙ্গীতে ঘরানার ইতিহাস, ভারতের সঙ্গীতগুণী (তিন খণ্ড)। তারই মাঝে মাঝে নবাব জীবনীও নতুন বিন্যাসে আদ্যোপান্ত নতুন করে লেখা হয়। এ ব্যাপারে মুদ্রিত পুস্তক, নিবন্ধাদি থেকে উপকরণ উদ্ধার ভিন্ন নানা ব্যক্তির কাছে নবাবের মেটেবুরুজ জীবন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য মৌখিক বিবরণও কিছু কিছু পেয়েছি, যার মূল্যও কম নয়। নবাবের এক পৌত্র, একাধিক প্রপৌত্রের মুখে শুনেছি তাঁর মেটেবুরুজের বিভিন্ন গৃহের কথা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নবাবের ঠুংরি গান গাইবার প্রসঙ্গটি বলেছেন যা তাঁর সঙ্গীতজ্ঞ পিতার মুখে শোনা। রাধারমণ মিত্র মহাশয়ের কাছে মেটেবুরুজের আঞ্চলিক তথ্য কিছু জানতে পেরেছি। লক্ষ্ণৌ শরদী উমর খাঁ নবাব রচিত কয়েকটি

গান দিয়েছেন যা অন্য গ্রন্থে নেই। জাতীয় গ্রন্থাগারের দিলীপকুমার মিত্র নবাবের চিড়িয়াখানা আগমনের প্রসঙ্গটি জানিয়েছেন। নবাবের (প্রচ্ছদে মুদ্রিত) প্রতিকৃতিটি দিয়েছেন তাঁর এক প্রপৌত্র। তাঁদের সহযোগিতা স্মরণ করি এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বিশিষ্ট স্থপতি এবং সাহিত্যপ্রেমী দিব্যেন্দু সিংহ মহাশয় আমার এতদিনের পরিশ্রমের ফসলটি প্রকাশনের দায়িত্ব নেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। প্রকাশনার তত্ত্বাবধানে শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সযত্ন প্রয়াসে অতি দ্রুত মুদ্রণ সম্ভব হল। তাঁকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ।

নবাবের বৈচিত্র্যময় পূর্ণাঙ্গ জীবনী, তাঁর গীত বাদ্য নৃত্য কৃতি, তাঁর সঙ্গীত দরবার বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে তাঁর দরবারের প্রভাব, অযোধ্যার নবাব বংশের আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত অযোধ্যা রাজ্যের পূর্ব যুগের কিছু ইতিহাস, লক্ষ্ণৌর নবাবী ইমারৎগুলির পরিচায়িকা, মহাবিদ্রোহকালীন কিছু কিছু প্রসঙ্গ। নবাব রচিত চারটি পুস্তকের মূলানুগ অনুবাদ সমন্বিত এই গ্রন্থটি যদি জীবনী-সঙ্গীত-ইতিহাসপ্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের মনোরঞ্জন করে তাহলেই সব শ্রম সার্থক মনে করব। ইতি

১৫ বৈশাখ ১৩৯১ দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচী

পৃষ্ঠা

নবাবী লক্ষ্ণৌতে	৯
তারিখ্-এ-পরীখানা	২১
অযোধ্যার সিংহাসনে নবাবী ধারা	২৮
প্রাচীন ঐতিহ্যে লক্ষ্ণৌ তথা অযোধ্যা	৫৪
সাদৎ খাঁর পূর্ববৃত্তান্ত—ইরান থেকে হিন্দুস্থান	৬২
প্রথম থেকে দশম নবাব	৭৫
কানহাইয়া কা এক কিস্সা	৭৮
নবাবীর অন্তকালে	৮৭
যব্ ছোড় চলি লখনউ নগরী	৯২
এলিহ্ জানের বৃত্তান্ত বা এক প্রাচ্য রাণীর জীবন	৯৫
কলিকাতায় নির্বাসন	১০২
ফোর্ট উইলিয়মে বন্দী	১০৬
হুজ্ন্-ই-আখতার	১১১
(আখতারের বেদনা) নবাব রচিত আত্মকথা	১১৩
মেটিয়াবুরুজের নবাব	১৩৩
তারীখ্-এ-মুম্তাজ	১৩৮
নবাব রচিত গীতাবলী	১৭৪
শেষ জীবন	১৮৫

নবাবী লক্ষ্ণৌতে

নবাব তো নবাব লক্ষ্ণৌর ওয়াজিদ আলী শাহ্।
শুধু নবাব নাকি? এত বড় আউধ রাজ্যের স্বাধীন রাজা। হাজারো লস্কর
সিপাহী খিদমদগার তাঁর হুকুম তামিলের জন্যে মোতায়েন।
দেড় হাজার নবীশ্। দেড় হাজার চোপদার। আর প্রায় পাঁচ শ হেকিম
নবাবের তাঁবে। নবাবী খানদান্। তাই রাজা
না বলে নবাব বলেই নাম ডাক।
ওয়াজিদ আলীর রাজধানী লক্ষ্ণৌর ঝল্‌মল্ দরবার। কি তার
ঠাট ঠমক দৌলৎ আর জুলুসের বাহার।
দিল্লী শাহী দরবারের নিভন্ত রোশনি হাজার বাতিতে জ্বলে উঠেছে
অযোধ্যার হাল আমলের রাজধানীতে। কাইসর বাগের সারি
সারি প্রাসাদ থেকে। বড়, ছোট ছত্তর মঞ্জিলে।
সেই রোশ্‌নাইয়ে ঝকমক্ করে নবাবের মাথায় তাজের হীরে জহরৎ।

গলায় সাত লহরা সাঁচ্চা মোতির হার। বাজুবন্ধের চিকণ মণি মাণিক।

ভোগে বিলাসে আরামে আয়েসে নবাবগিরি। ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে, জাঁকজমকে।

নবাব তো অবধের নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্।

পরীখানা আর চিড়িয়াখানায়, বাগ বাগিচা আর মঞ্জিলে তাঁর নবাবিয়ানার জুড়ি মেলা ভার। লক্ষ্ণৌর নবাবী ঘরানায় মাৎ করা ওয়াজিদ আলী শাহ্।

বাপ দাদা পরদাদাদের আমল থেকে চলে আসা কেতা। আরো আগেকার কি সব নজির। নাসিরুদ্দিন কি আসফুদ্দৌলা। কিন্তু সবার ওপর টেক্কা দেওয়া ওয়াজিদ আলীর নবাবী।

দরবারে মঞ্জিলে বেগমে পরীতে হারেমে। নাচে গানে বাজনায় জলসায় মহফিলে। গজলে ঠুমরিতে সেতারে সারঙ্গে মোচঙ্গে। তানপুরা মঞ্জীরা ঝাঁঝ বাঁশরী তম্বুরিনে। তবলা বাঁয়া ঘুঙুরের তালে তালে লহরে লহরে। ওড়নি পেশোয়াজের ঘূর্ণিতে মাতোয়ারা আসরে।

কত বেগম নবাবের? সত্তর আশী, কি নব্বুই একশ? কি আরো বেশি? সে হিসাব রাখে হারেমের দারোগা। আর খুদ নবাবের জানা থাকতে পারে।

আর কত বাইজী ওয়াজিদ আলীর দরবারে? যাঁদের তাঁর সোহাগের দেওয়া নাম —পরী। নাচওয়ালী গানওয়ালী জওয়ানী সুন্দরীর ঝাঁক। লক্ষ্ণৌ আর আশপাশ অঞ্চলের নাচনী গাওয়াইয়া বাছাইকরা বাই জেনানা। সেই পরীদের নিয়ে নবাবের তাজ্জব পরীখানা। তাঁর নিজের পসন্দ মাফিক বানানো আরেক রকম হারেম। অবধের আর কোন নবাবী জমানায় এমন চাঁদের হাট আর কেউ দেখেনি।

নাচওয়ালী খুবসুরৎদের বড় কদর পরীখানায়। রাজ্যের সেরা নাচনী গানওয়ালীদের এখানে আনার বন্দোবস্ত ঢালাও আছে নবাবের। খাসা রূপসী হলে নাচ গান না জানা থাকলেও চলতে পারে। তাঁদের জন্যে মাস মাহিনার সব ওস্তাদ রেখেছেন নবাব। সেই দরবারী ওস্তাদদের দস্তুরমত তালিমে পরীদের তৈয়ারি হতে আর কি।

পরীখানায় নাচে গানে বাজনায় সেই সব পরীদের নিয়ে নবাবের হরদম আসর। এখানে তাঁর কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পরীদের তামিল চলে, মহলা বসে। তারপর ধুমধাম করে সাঁঝ বাতিতে জলসা। আগাগোড়া তসবির রাখেন নবাব। তাঁর ফরমায়েশ মাফিক গড়ে ওঠে একেক মহফিল্।

কত পরী ওয়াজিদ আলীর? তার ঠিক ঠিকানা নেই। পরীদের আনা হয় তো হামেশাই। আবার কেউ কেউ বেগম বনে যান তাঁদের মধ্যে থেকেই। নবাবী নেক্-নজর যদি পড়ে, নাচওয়ালী হয়ে নাও থাকতে পারেন বরাবর। বেগম হয়ে খাস মহলও মিলে যেতে পারে। সে নবাবের খেয়াল খুশি মর্জি। আর পরীদের নসীব। কিংবা নাচ গান আর রূপের বাহারের বখশিস। নবাবী পসন্দ হলেই পরী থেকে বেগম! পরীখানা থেকে খাস হারেমে। তখন পরীর নামও বদল হয়ে যায়। নতুন নামের বেগম তখন। যেমন মাহরোক পরী হলেন বেগম হজরৎ মহল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় যিনি যোগ দেন বিদ্রোহীদের সঙ্গে। যাঁর নাবালক ছেলেকে লক্ষ্ণৌর শাহী তখ্তে বসানো হয়েছিল। সেসব অনেক পরের কথা।

এমনি আরো পরী বেগম বনেছিলেন ওয়াজিদ আলীর হারেমে। এমনিভাবে

বেগম হওয়ার কথা নবাব নিজেই লিখে গেছেন আত্মজীবনীতে।

বাইরে থেকে, নাচ গানের দুনিয়া থেকে পরীখানায়। আবার পরীখানা থেকে খাস মহলে উঠে আসা বেগম। নাচ আর সুর আর রূপ যৌবনের নেশায় ভরপুর নবাব। এ ব্যাপারে আভিজাত্য নিয়ে কোন বাছ-বিচার নেই তাঁর। উদার সমদৃষ্টি রূপবিলাসীর।

নাচে গানে হাসির ছটায়, গোলাপী ঠোঁটের মুক্তাদানায়, সুর্মাটানা আঁখির টানে মশগুল্ ওয়াজিদ আলী শাহ্। জম্‌জমাট পরীখানায় কোথা দিয়ে যে তাঁর সময় ডানা মেলে উড়ে যায়!

কত পরীদের যে নিজেই নাম দিয়েছেন নবাব। কখনো দর্শনধারী। কখনো গুণবিচারী। সুলতান পরী। দিল্‌রুবা পরী। হুর পরী। মাহক পরী। শাহেন্‌শা পরী।

নবাব নাচ গানের আসর বসান পরীদের নিয়ে। আবার গীতিনাট্যও মঞ্চে হয় মাঝে মাঝে। তার জন্যে দিনের পর দিন মহলা চলতে থাকে। তারপর রকমারি জাঁকজমক আর সাজসজ্জায় তার অভিনয়। নবাবের নির্দেশনায় সে সব পালা তাঁর নিজেরই রচনা, গানের মালায় গাঁথা সুরের হার।

ওয়াজিদ আলীর লাখো তন্‌খা খরচা হয়ে যায় শুধু পরীখানায়। হাঁ। এমন বাইজী-বিলাস আর কোন নবাবের হালে কেউ দেখেনি। যদিও নবাবিয়ানার জন্যেই এই লক্ষ্ণৌয়ি খানদানের নাম ডাক সাতপুরুষে। পরীখানার নামও কেউ কখনো শোনেনি আগে, এতো পুরনো নবাব বংশের ইতিহাসে।

পরীদের সংখ্যাও কি কম? চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট থাকে একেকসময়। কখনো বা একশও পার হয়ে যায়। যখন যেমন মেলে। কিংবা যেমন দরকার হয় জলসার জন্যে। মাস মাহিনায় নিযুক্তা নন তাঁরা। পরীখানায় অষ্টপ্রহর বাসিন্দা বনে যান। তাঁদের জন্যে কোঠি-কামরা, ভরণ-পোষণ, দামী দামী পোশাক-আশাক। আবার মণি-মুক্তোর গহনা, নগদ সোনা-চাঁদি। যেমন মর্জি কিংবা নজর নবাবের। তাঁদের নাচে গানে দুরস্ত করে দেন দরবারী কলাবৎরা।

তালিম পাওয়া পরীদের মহ্‌ফিলের রোশনাই। কি ঘটা আর বাহার তার। রাতকে দিন, দিনকে রাত। হামে হাল পরীখানায় ওয়াজিদ আলী শাহ্। মহলা থেকে আসল জলসায়। তাঁর ফুরসৎ কোথায়?

নবাব দরবার আর পরীখানা নাচে গানে ঝংকারে উদ্দাম হয়ে ওঠে। এদিকে আরেক রকম রিপোর্ট লেখে ডবলিউ এইচ্ স্লীম্যান। তাঁর অন্য ধরনের খবর আর দৃষ্টি আর লক্ষ্য। আউধ্ রাজ্যে ভারত সরকার অর্থাৎ ইংরেজ সরকারের নিযুক্ত রেসিডেণ্ট্ স্যর উইলিয়ম স্লীম্যান। লক্ষ্ণৌতে তার দফ্‌তর।

রাজধানীতে বসে স্লীম্যান সরেজমিনে দেখেন নবাবী হাল্‌চাল। আর গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহাউসিকে ডেস্‌প্যাচ পাঠান—

লক্ষ্ণৌ, আগস্ট, ১৮৪৯

'আমার পরবর্তী সরকারী বিবরণে দেখাব যে নবাব প্রশাসনিক কাজকর্মের পক্ষে একেবারেই অযোগ্য। রাজ্যে কি ঘটছে বা সাধারণ মানুষ কতখানি কষ্ট পাচ্ছে,

সেসব বিষয়ে তিনি কোন আগ্রহ দেখান নি আর কিছুই করেন নি। আমার চিঠিপত্র-গুলি কিছুমাত্র ছাপ ফেলেনি তাঁর মনে। সব সময় তিনি গাইয়ে আর মেয়েমানুষ-দের নিয়ে কাটান। তারাই তাঁকে আমোদে রাখে এবং তিনি সাত-আট ঘণ্টা বড় ওস্তাদ রাজীবুদ্দৌলার সঙ্গে থাকেন তাঁর বাড়িতে। এই সব গানের লোক আর খোজারাই এখন রাজ্যের আসল মালিক, আর তা থাকবেও, যতদিন রাজার হাতে কিছু ক্ষমতা আছে। মন্ত্রীকে ওদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়।...'

ওই যে ওস্তাদ রাজীবুদ্দৌলার কথা জানিয়েছেন রেসিডেণ্ট সাহেব, নবাবের ওদিকটা বল্‌বার আছে আরেকভাবে। শুধু পরী বেগম জলসা বাগ বাগিচা আর খানাপিনার ভোগ বিলাসী নন ওয়াজিদ আলী শাহ্‌। সেসবের সঙ্গে তাঁর অন্য সত্তাও আছে। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন কেন স্লীম্যান সাহেব বা তাঁর বিদেশী কর্মচারীরা? নবাব নিজে কবি কি লেখক কি গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে, সেসব ব্যাপারে ইংরেজ রাজপুরুষদের কি দরকার?

তবে ওয়াজিদ আলীর জীবনে তা অনেকখানি বটে। বাইজী বেগম হারেম ছাড়াও বর্তমান তাঁর শিল্পীচিত্ত। তাঁর নানা নন্দন গুণ একাধারে।

নর্তক বাদক গায়ক সে ওয়াজিদ আলী শাহ্‌। আবার বিভিন্ন রীতির কাব্য-রচয়িতা তিনি। তা ছাড়া, গীতিনাট্যকার। সঙ্গীততত্ত্বের প্রবন্ধকার। আত্মজীবনী লেখক। সেই সঙ্গে ধ্রুপদ থেকে খেয়াল, ঠুমরি, গজলও রচনাকার। তার মধ্যে ঠুমরি গান রচনাই তার সব চেয়ে বেশি। রচিত গানের ক্ষেত্রে ঠুমরির জন্যেই তাঁর নাম।

লক্ষ্ণৌ চালের ঠুমরি রচয়িতা, তার প্রচারক এবং গায়কও তিনি। রীতিমত ঠুমরি গাওয়াইয়া নবাব। আবার সেতারী। অনেকদিন ওস্তাদের তালিম পেয়েছেন সেতারে। কম বয়স থেকেই শিখেছেন। তেমনি নৃত্যবিদ। নাচ শিক্ষা করেছেন দস্তুরমত, নৃত্যাচার্যের অধীনে। আবাল্য নাচে তাঁর অনুরাগ। যেমন ঠুমরির গানে, তেমনি নর্তনেও অফুরন্ত উৎসাহ তাঁর।

লক্ষ্ণৌ ঘরানার নৃত্যে আচার্যস্থানীয় ঠাকুরপ্রসাদ। সেই মহাগুণী নর্তকই নবাবের নৃত্যগুরু। দীর্ঘকাল নিয়ম মতন নাচ শিখেছেন ঠাকুরপ্রসাদের কাছে। লক্ষ্ণৌয়ি কত্থক নৃত্যধারা তাঁদের। এই কত্থক ঘরানার এক প্রবর্তক বলেই ঠাকুর-প্রসাদের সুনাম। লক্ষ্ণৌ কত্থক নাচের সূত্রপাত আর শ্রীবৃদ্ধি হয় এখানকার দরবারেই। ওয়াজিদ আলীর আগ্রহে আর আনুকূল্যে।

দুর্গাপ্রসাদ, ঠাকুরপ্রসাদের পিতা প্রকাশজীও আগেকার লক্ষ্ণৌ দরবারে কিছুদিন ছিলেন। কিন্তু প্রকাশজীকে নিয়ে কোন নৃত্যধারার পত্তন হয়নি নবাব দরবারে। তার কারণ, ওয়াজিদ আলীর মতন কোন ভূমিকা বা পোষকতা আগের নবাবের ছিল না। নৃত্যে লক্ষ্ণৌ ঘরানার পত্তন ও প্রচলন ঠাকুরপ্রসাদের নর্তক-জীবন থেকে ধর্তব্য। আর তা সম্ভব হয় ওয়াজিদ আলীর সহযোগিতায়। রসধারী সম্প্রদায়ের এই কত্থক নৃত্যবিদ বংশকে নবাব সসম্মানে দাক্ষিণ্য করেন। গুরু ঠাকুরপ্রসাদকে তিনি মর্যাদার আসন দেন দরবারে। রাজস্থান অথবা প্রয়াগ অঞ্চল থেকে এই মিশ্র বংশীয়রা লক্ষ্ণৌতে এসেছিলেন। নৃত্যের সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত তাঁরা। বিশেষ ঠাকুর-

প্রসাদ। ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীত পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। এই কথক বংশের নন্দন-জীবনেও তা সবিশেষ মূর্ত।

ঠাকুরপ্রসাদের তিন পুত্রও কৃতী নৃত্যশিল্পী। তাদেরও একেক সময় পৃষ্ঠ-পোষক হন ওয়াজিদ আলী। ঠাকুরপ্রসাদের পুত্রত্রয় হলেন বিন্দা দীন, কালকাপ্রসাদ ও ভৈরবপ্রসাদ। তাঁদের প্রথম দুজন তো স্বনামধন্য। 'কালকা-বিন্দা' নামে যুগ্মভাবে তাঁরা সুপরিচিত নৃত্য তথা সঙ্গীত-জগতে। ঠাকুরপ্রসাদের উত্তরসাধকরূপে বিন্দা দীন ও কালকা দীন লক্ষ্ণৌ কথক নৃত্য ঘরানার শুধু ধারক বাহক নন, প্রবর্ধকও। তাঁদের সাধনায় ও দানে আরো সমৃদ্ধ হয় এই নর্তন-ধারা। বিন্দা দীন বহু সংখ্যক ঠুমরি গানেরও গুণী রচনাকার। নবাবের প্রিয় কথক নৃত্যের শিল্পী কালকাপ্রসাদ ও বিন্দা দীন। তাঁর দরবারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুই সহোদরের নাম।

ঠাকুরপ্রসাদের পরে কালকা, বিন্দাকেও ওয়াজিদ আলী দরবারী অলংকার স্বরূপ রাখেন। লক্ষ্ণৌর ঘরানা নৃত্যে আরো শ্রীবৃদ্ধি আনেন ভ্রাতৃদ্বয়। নাচের সঙ্গে ঠুমরি দাদরা আর ভজন গানও যোগ করেন তাঁরা। এই নৃত্যধারার প্রসারে নবাবের নিজস্ব দানও আছে সহযোগী-রূপে। কথক নাচের জন্যে তিনি অনেক ঠুমরি গান রচনা করে দেন। কথক নৃত্য অনেকাংশে কৃষ্ণ রাধিকার কথিকা আশ্রয়ী। এই নৃত্যে রাধা কৃষ্ণের কাহিনী আর ঠুমরি গজল গান নবাবও কিছু যুক্ত করেন কালকা বিন্দার সঙ্গে একযোগে।

শুধু গান কিংবা নাচের বিষয় যোগ করা নয়। কথক নৃত্যের বৃহৎ আকারে অনুষ্ঠানও করতেন নবাব। পরীখানার সুন্দরীদের নিয়ে সেই সব নাচের মহোৎসব হত ছত্তর মঞ্জিলে। নবাব স্বয়ং তাতে যোগ দিতেন। নাচতেন নটীদের সঙ্গে।

এমন কি কোন কোন গানের সঙ্গে নবাব নর্তকী বেশে অবতীর্ণ হতেন। পরীদের সঙ্গে নৃত্য করতেন ওয়াজিদ আলী, রমণীর সাজ-সজ্জায়। শৃঙ্গার রসের গান ঠুমরি। তার নায়িকা সেজে সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তে নবাব ভাব প্রকাশ করতেন। কারণ তাঁর প্রিয় এই ঠুমরির চাল্ হল—'বোল্ ভাও কি।' গানের বোল বা ভাষা বা বক্তব্যকে ভাও অর্থাৎ ভাব প্রদর্শন করে ফোটানো। গানের সঙ্গে অভিনয়—চোখমুখের হাবভাব অঙ্গভঙ্গিমা দেখানো। তাই নবাবের নটীর সাজে ভাও বাৎলানো।

কিন্তু বাইরের চোখে সেসব কি অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক দেখাত। হাসাহাসির বিষয় হতো নবাবের এই মেয়েলী নাচের কাণ্ড। এজন্যে নবাবজননী পর্যন্ত কি মনস্তাপ ভোগ করেন আর কি ধিক্কারে দেন তাঁকে।

ওয়াজিদ আলীর মা বড়ি বেগম। প্রথম প্রথম খবর পেয়ে পুত্রকে এ সময় আড়াল থেকে লক্ষ্য করতেন। তাজ্জব বনতেন মরদের এই জেনানা নাচ দেখে। নবাব হলেও ছেলেকে ভ্রূকুটি করতেন, প্রতিবাদ জানাতেন। বন্ধ করতে বলতেন বাইজীদের সঙ্গে মিলে নাচ আর বাইজী সেজে নাচ। কিন্তু বিস্তর বকাবকি করেও নিবৃত্ত করতে পারেন নি। হাল ছেড়ে দেন শেষে।

নবাব যেমন-কে-তেমন নাচ গান জলসার স্ফূর্তিতে চলতে থাকেন। রূপ-লোকের আসমানে। কিন্তু অবস্থা ক্রমে গুরুতর দাঁড়ায় বাস্তব জীবনে।

মহা ব্যয়-বাহুল্যে পরিণত হয় তাঁর নৃত্য সঙ্গীত অভিনয়ের বড় বড় জলসা।

নবাবের দিবারাত্রির সময়ও অধিকাংশ অধিকার করে নেয়। অতি অপব্যয়ে স্ফীত হয়ে ওঠে তাঁর পরীখানা আর বেগম বিলাসিতা। বেগমদের জন্যে পৃথক পৃথক প্রাসাদ করতে থাকেন। বহু দাস দাসী পরিজন পরিবৃত বিপুল আড়ম্বরের জীবন সব। তার বন্দোবস্ত করতে অর্থনীতির কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন নবাব। অযোধ্যা রাজ্যের কোষাগারের হাল শোচনীয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু সেদিকে দৃকপাতহীন ওয়াজিদ আলী শাহ্। এসব সংবাদ পেঁছায় না হারেমের মধ্যে। তাঁর ধারণাই নেই, সোনার রাজ্যে কতখানি এগিয়ে এসেছে অরাজকতা। শিথিল শাসনে দস্যু তস্করদের কি উপদ্রব হচ্ছে। রাজধানী লক্ষ্ণৌতে পর্যন্ত প্রজাদের ধন প্রাণ সম্পদ কতদূর বিপন্ন। মফস্বলে গ্রামাঞ্চলে নিরাপত্তার কতখানি অভাব। সাধারণের দুর্দশার জন্যে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা কি পরিমাণে দায়ী। এসব দেখবার জানবার ভাববার ফুরসতই নেই নবাবের।

কিন্তু বৃটিশ রেসিডেন্টের দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায়নি। তাই স্যর উইলিয়ম স্লীম্যান রিপোর্ট পাঠান লর্ড ডালহাউসিকে—কলকাতায় সদর দফ্তরে—

লক্ষ্ণৌ, আগষ্ট, ১৮৪৯

'…আউধে এখন আসলে কোন গভর্নমেণ্ট নেই। মন্ত্রী রাজার সঙ্গে সপ্তায় কিংবা পনের দিনে একবার কয়েক মিনিটের জন্যে দেখা করেন আর সেও সাধারণত ওই ওস্তাদের বাড়িতে। গাইয়ে আর খোজারা ছাড়া রাজা আর কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। রাজ্যের বা সরকারী ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্যে তাঁর জ্ঞান পর্যন্ত নেই, এসব তিনি গ্রাহ্যই করেন না। তাঁর এই উদাসীনতার জন্যে এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে লোকে তাঁকে ঘৃণা করে আর যারা তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে ধনী হয়ে উঠছে তাদের ভিন্ন অন্য কারুর সহানুভূতি পাবেন না তিনি।'

পরীখানা ছাড়াও নবাবের বিরাট সঙ্গীত-দরবার। সারা উত্তর ভারতে এই দরবারের জন্যে ওয়াজিদ আলীর নাম বিখ্যাত হয়েছে সংগীত জগতে। সমকালীন কোন দরবারে এত ওস্তাদ কলাবৎ নিযুক্ত আছেন কিনা সন্দেহ। ধ্রুপদ খেয়াল ঠুমরি টপ্পা গজলের গাওয়াইয়া। শরদ সেতার সারঙ্গ শানাই তবলা পাখোয়াজ বাদক। সকলের নাম জানা যায় না, লেখাজোখাও নেই। কয়েকজনের উল্লেখ আছে কেবল নবাবের কোন কোন আত্মকথায়।

দরবারে নিযুক্ত সেই কলাবৎদের মধ্যে বিশিষ্ট হলেন—গোলাম আলী খাঁ ও তাঁর পুত্র গোলাম রেজা খাঁ। গোলাম নবী খাঁ। হায়দর খাঁ। ছোটে খাঁ। ঘসিটে খাঁ। সারঙ্গওয়ালা মহম্মদ আহ্সান। এলাহিয়া খাঁ। ছর্জু খাঁ (তানসেনের পুত্রবংশীয় ধ্রুপদী?)। হায়দর আলী ও নিসার আলী (কুতুব আলীর সুপারিসে তাঁর ভাই)। খাজা বখস্। এইসব নাম পাওয়া গেছে নবাবেরই লিখিত বিবরণী থেকে। তাঁরা ভিন্ন আরো নানা ওস্তাদ ছিলেন যাঁদের কথা জানা যায় পরোক্ষভাবে।

নর্তকদের কজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া আছেন সেতারের বিখ্যাত কলাকার কুতুব আলী। সেতার বাজনায় তাঁর শগীদ্ ওয়াজিদ আলী শাহ্।

নবাব একটি ছোট কিতাব লেখেন—'তারীখ্-এ-পরীখানা'। পরীখানার ইতিহাস

যা বৃত্তান্ত। এটি ওয়াজিদ আলীর প্রথম বয়সের আত্মকথাও। 'তারীখ্-এ-পরীখানা'য় নিজের সেতার শেখার কথায় নবাব জানিয়েছেন, 'এই শিল্প আমি এতখানি শিখি যে লোকে আমার ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যেত। আমি যখন সেতার বাজাতুম, হাস্যময় লোকদের কাঁদাতে আর যারা কাঁদছে তাদের হাসাতে পারতুম। তার কারণ আমি শিখেছিলুম দস্তুরমত। প্যারে খাঁ আমার তারিফ করতেন আর কুতুব আমার হাতে চুম্বন করতেন। আমরা একসঙ্গে কাটাতুম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল। কুতুব ছিলেন নাস্তিক এবং প্রেম ও অন্য সব কিছুতে তাঁর আগ্রহ ছিল বেশ ভাল রকম।...কুতুবের সঙ্গে থাকতুম বলে আমি নাচ গান জানা লোকদের বেশি পছন্দ করতুম। লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ গায়ক দিলওয়ার হায়দরিকেও নিযুক্ত রাখি তখন।...'

নিজের প্রথম জীবনের চরিত্র আর সংশ্লিষ্ট নানা কথাও নবাব সরল মনে প্রকাশ করেছেন 'তারিখ্-এ-পরীখানা'য়। শুধু সঙ্গীতচর্চা বা ওস্তাদদের কথা কিংবা পরীদের গান শেখাবার বা জলসার উল্লেখ নয়। নিজের সম্ভোগ ব্যসন লিপ্সা আর নীতিবর্জিত গ্লানিময় প্রাসাদ পরিবেশ অকপটে জানিয়েছেন পাঠকদের।

এই আত্মজীবনীর শেষ অংশে ওয়াজিদ আলীর লেখা থেকে জানা যায় যে, অপরিমিত দেহোপভোগের ফলে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। আর এরকম গুরুতর অসুস্থ হন একাধিকবার।

রেসিডেণ্ট স্লীম্যান সে সংবাদও রাখেন। আর তা জানিয়ে দেন ভারত সরকারের সেক্রেটারি এইচ্ এম্ এলিয়টকে লেখা চিঠিতে—

৩০ জানুয়ারি, ১৮৪৯, লক্ষ্ণৌ।

'রাজার গুরুতর ব্যাধি এখনো চলছে। কিন্তু তেমন কোন বিপদের সম্ভাবনা বোধহয় নেই। অসুখটার সঙ্গে এমন করে কটা অদ্ভুত লক্ষণ রয়েছে যা তাঁকে শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত করে দেবে আর প্রাণ যতদিন থাকবে ততদিন দুর্বিষহ মনে হবে। এই সমস্ত লক্ষণগুলি কতখানি তাঁর জন্মসূত্রে পাওয়া আর কতখানি নিজেরই মাত্রাধিক্যের জন্যে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।...'

তার তিনমাস পরেও এই ডেস্প্যাচ্ লেখেন স্যর স্লীম্যান—সেক্রেটারী এলিয়টকেই। সেই পত্রে দেখা যায় যে, রেসিডেণ্ট্ সাহেবের মনে নবাবের মৃত্যুর সম্ভাবনাও জেগেছিল—

লক্ষ্ণৌ, ২৩ মার্চ, ১৮৪৯

'একথা বোধহয় সরকারের কাছে জানানো দরকার যে, রাজার মৃত্যু ঘটলে...। তাঁর বর্তমান অবস্থা, আর সেই সঙ্গে দেহে মনে দুর্বল এক মন্ত্রী, বড়ই অসন্তোষজনক। ভাগ্যক্রমে ফসল এবার ভাল হয়েছে, যা সচরাচর দেখা যায় না।'

তার দেড় মাস পরে আরেকটি চিঠি পাঠান স্লীম্যান। এবার বড়লাট স্বয়ং লর্ড ডালহাউসিকে। এই প্রতিবেদনে নবাবকে খুব নিকট থেকে দেখা যায়—

লক্ষ্ণৌ, ৮ মে, ১৮৪৯

'গতকাল, প্রায় দুপুরবেলা, তাঁরা তিনজনেই প্রাসাদে গিয়েছিলেন এবং কিছুক্ষণ রাজার কাছে বসে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তাঁরা দেখেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা

আশাতীতভাবে ভাল আর কথোপকথনের সময় তাঁর কোন ভাবের গোলমালের চিহ্নও তাঁদের নজরে পড়েনি। তাঁদের মত এই যে, কোন সুদক্ষ ইউরোপীয় চিকিৎসকের হাতে থাকলে তিনি শীঘ্রই সেরে উঠবেন। রাজা বাহাদুর হলেন অলীক দুঃস্বপ্ন দেখা স্নায়ুরোগী (hypochrondiac) এবং প্রায়ই অদ্ভুত রকমের ঘোরের প্রভাবে থাকেন যা এরকম ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু দীর্ঘ বিরতির সময় তিনি রীতি-মত প্রকৃতিস্থ আর সমস্ত বিষয়ে এই ধরনের ঘোরের সঙ্গে জড়িত থাকেন।

শরীর সুস্থ থাকলে রাজা কাজকর্মে কখনো বিশেষ মনোযোগ দেন না আর সেইজন্যে তাঁর অসুখ হলে কাজের ব্যাপারে তা অল্পই বোঝা যায়।…'

নবাবের দেহ পটু থাকলে তাঁকে কত দিক সামাল দিতে হয় তার ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে আগে। তা ছাড়াও তাঁর আরো শখ, আরো বড় বড় ব্যাপার আছে। তার মধ্যে একটি হল তাঁর চিড়িয়াখানা। কত রকমের পাখী আর জন্তু সে বাগিচায় তিনি পুষেছেন, কত সেজন্যে খাবার আর লোকজনের খরচ তার হিসাব মেলেনি। তবে সে এক বিরাট অংক নিশ্চয়।

কিন্তু জানা গেছে নবাবের আরেক দুর্মূল্য বিলাসের কথা। তাঁর বৃহৎ বৃহৎ ইমারত তৈরির শখ। তার কিছু বিবরণ উল্লেখ্য।

প্রাসাদ নির্মাণ বাবদ ওয়াজিদ আলী খরচ করে ফেলেন প্রায় এক কোটি টাকা। আর তাও মাত্র আট বছরের নবাবী কালের মধ্যেই। এমন দরের অট্টালিকা-বিলাসীর কথা নবাবকুলেও কদাচিৎ শোনা যায়। শুধু অযোধ্যার নবাব বংশে নয়, অন্যত্রও দুর্লভ। তাঁরই এক পূর্বপুরুষ, চতুর্থ নবাব আসফুদ্দৌলার দৃষ্টান্ত ছিল বটে। কিন্তু তা অনেক বেশী বছরের ব্যাপার। আর তাও এক বিশেষ অবস্থার জন্যে। তা হল, দুর্ভিক্ষে প্রজাদের কাজ আর মজুরি দেবার তাগিদে। তখনই আসফুদ্দৌলা তৈরি করান লক্ষ্ণৌর ওই বিশালায়তন ইমামবাড়া।

কিন্তু ওয়াজিদ আলীর প্রাসাদ নির্মাণ নেহাত বিলাসিতা। কেবল জাঁকজমক আর ঐশ্বর্যের ঘটা। কাইসর বাগের সৌধগুলি করতেই আশী লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে যায়। তা ছাড়াও তৈরি করেন তাঁর কয়েক বেগমের জন্যে আলাদা আলাদা কোঠি। বাগিচা ঘেরা একেকটি ভবন। যেমন, বেগম সিকান্দার মহলের জন্যে সিকিন্দার বাগ। আরেক বেগমের জন্যে আলমবাগ, ইত্যাদি।

এইসব সদন কিংবা কাইসর বাগের অট্টালিকাগুলিও স্থাপত্য হিসাবে উচ্চ মানের নয়। খরচ যতই হোক না কেন। লক্ষ্ণৌর পূর্ববর্তী নবাবদের তুলনায় নিকৃষ্ট তো বটেই। সে সব আমলের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে লক্ষ্ণৌতে। ওয়াজিদ আলীর স্থাপত্য-কারুর সঙ্গে তুলনার সুযোগ পাওয়া যায় তাদের।

কাইসর বাগ প্রাসাদ-শ্রেণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অনেকাংশে। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন এসব সৌধে বেশি না লাগলেও। তবু লক্ষ্যণীয়, সুষম সামঞ্জস্যও নেই তাদের স্থাপত্যে। সুষ্ঠু সামগ্রিক পরিকল্পনারও অভাব। ওয়াজিদ আলী এ ব্যাপারে কেবল ঐশ্বর্যের আড়ম্বরই দেখিয়েছেন। এই সদনমালার উত্তর-পূর্ব কোণে প্রধান তোরণ থেকেই সেই অসমঞ্জস পরিবেশের শুরু। তারপর প্রাঙ্গণ পার হয়ে আরেক বিশাল ফটক জিলাউখানা। এখান থেকেই আরম্ভ হত ওয়াজিদ আলীর নবাবী শোভাযাত্রা।

তারপর তৃতীয় তোরণ থেকে চীনি বাগের প্রবেশ পথ। চীনা মাটির পাত্র দিয়ে আগাগোড়া এই বাগান সাজানো। তাই এমন নামকরণ। চীনি বাগের পরেও আরেকটি তোরণ। তার দুদিকে জলকন্যাদের চিত্র আর চতুর্দিকে উজীরের আবাস ভবন।

সেখান থেকে পেঁছিতে হয় হজরৎ বাগে। ডানদিকে চাঁদিওয়ালী বারাদারি। এই নামকরণের কারণ—তার মেঝে ঝকঝকে রুপোর পাতে মোড়া। তারও পরে খাস মুকাম। কাছেই বাদশা মঞ্জিল। সেখানেই নবাবের বাস। এই অট্টালিকাটি আসলে পঞ্চম নবাব সাদৎ আলী খাঁর। তাঁরই শখে তৈরি। পরে ওয়াজেদ আলী তাঁর নতুন প্রাসাদমালার মধ্যে জুড়ে নেন।

বাদশা মঞ্জিলের বাঁদিকে আরেক সারি কোঠি। তারই মধ্যে আছে বিরুনি। অর্থাৎ বেগমদের জন্যে নির্দিষ্ট মহলের পর মহল। আর হারেম। সে যেন রুপের হাট। তবে প্রকাশ্য নয়, গুপ্ত। এই প্রাসাদ চত্বরের নাম চৌলাখী—অর্থাৎ চার লাখের। এটি নবাবের প্রিয় নাপিত আজিমুল্লা খাঁর তৈরি। চার লক্ষ টাকায় সেই ক্ষৌরকার বিক্রয় করেন ওয়াজিদ আলী শাহকে। নাম তাই চৌলাখী।

সিপাহী বিদ্রোহের পর্বে এ নামটি লোকের মুখে মুখে ফিরত। কারণ এখানেই বিদ্রোহীরা প্রতিষ্ঠা করতে চায় স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্যের কেন্দ্র। রাজ-সিংহাসনে বসিয়েছিল নাবালক বির্জিস কাদ্‌রকে। নবাবের দশ বছর বয়সী পুত্র বির্জিস কাদ্‌র। আর তাঁর অভিভাবিকা হন জননী হজরৎ মহল। ওয়াজিদ আলীর বেগম হজরৎ মহল, মহা-বিদ্রোহের পর্যায়ে, চৌলাখীতেই দরবার বসাতেন।

চৌলাখীর নিকটে আরো কটি সৌধ। তারপর কাইসর বাগের অন্যতম দ্রষ্টব্য সেই কালোজামের গাছটি। এই অঞ্চলটিতে হত নবাবের বার্ষিক মেলা আর উৎসব। তখন নবাব হলুদ রঙা আল্‌খাল্লার সাজ পরতেন আর এই কালো জামগাছের তলায় বসতেন ফকির সেজে। নবাবী খেয়ালে শাওন মাসের সে এক মহোৎসব। শুধু নবাব নন। উৎসবে যোগ দিতে প্রত্যেককেই সেখানে ফকিরের বেশে প্রবেশ করতে হত, পূর্বদিকের একলাখী ফটক দিয়ে। সকলের সঙ্গে সেদিন একই রকম আল্‌খাল্লার সাজে নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্‌ দেখা দিতেন।

সেই জাম গাছের পশ্চিমে একলাখী তোরণ। তার বাঁদিকে কাইসর পসন্দ্‌ বা রৌসনুদ্দৌলা কোঠি। সপ্তম নবাব নাসিরুদ্দিনের আমলে এ প্রাসাদ ছিল তাঁর উজীরের আবাস। পরে ওয়াজিদ আলী সেটি বাজেয়াপ্ত করে নিজের এক প্রিয় বেগমকে উপহার দেন। এই ভবনেরও একটি ভূমিকা ছিল বিদ্রোহের সময়ে। তার একতলায় একদল ইংরেজকে বন্দী করে রাখা হয়। অবশেষে বিদ্রোহীরা তাদের বধ করে উত্তর-পূর্ব ফটকের কাছে। তা হল ১৮৫৭, সেপ্টেম্বর ২৪-এর কথা।

সে সব তো অনেক পরের ঘটনা। এখন নবাবের প্রসঙ্গ।

রেসিডেন্ট সাহেব নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন গভর্নর জেনারেলের দফ্‌তরে। এদিকে ওয়াজিদ আলীর নবাবীও পুরোদমে চলেছে। ওই কাইসর বাগের হারেমে আর পরীখানায়। ছত্তর মঞ্জিল আর হুজুর বাগের জলসায়। নাচে গানে বাজনায় বাইজী ওস্তাদরা মেজাজ খুশ্‌ রেখে দিয়েছেন নবাবকে।

সব এক মজার সুরে বাঁধা। নবাব জীবনে আর অন্য কাজ কি? ভোগ সুখের

জন্যেই তো নবাবী। পূর্বপুরুষদের আমল থেকে চলে আসা ধারা। তবে ওয়াজিদ আলী কেবল নিজস্ব সুর উঁচু পর্দায় বেঁধে নিয়েছেন। তাঁর কাছে এই মনোরম আরাম ছাড়া আর সবই বেসুরো। তাঁর চৌহদ্দি বড় সুরিলি। সারি সারি জওয়ানী নাচনী পরী। আবার নবাবের নিজেরও আছে নাচ গান বাজনা।

বেসুর কোথাও নেই। যদি থাকে, তা কি করে আসবে নবাবের কানে? রাজ্য দেখাশোনার ভার ছেড়ে দিয়েছেন উজীর দফতরের লোকজনের ওপর। তাঁরা কর্তব্য করেন কিনা, গলতি গাফিলতি হলে দায়িত্ব কার—সে ভাবনা থেকেও নবাব খালাস। তাঁর বিলকুল হুঁশ নেই যে ব্রিটিশ সিংহ ওৎ পেতে, থাবা মেলে বসে!

প্রশাসনের সর্ব বিভাগে আর রাজ্যের নানা ব্যাপারেই অরাজকতা। এ শুধু ইংরেজ সাম্রাজ্যবিস্তারীদের প্রচার নয়। আউধে নিতান্ত বাস্তব সত্য। তৎপর বৃটিশ শক্তি তার সুযোগ নেয় মাত্র। বেসুর তারাই লক্ষ্য করে আর উদ্যোগী হয়। তারা সৃষ্টি করেনি বিশৃঙ্খলা। তাদের শ্যেন-দৃষ্টিতে নবাবী হালচাল সবই তন্নতন্ন দেখা।

কলকাতায় লর্ড ডালহাউসি লক্ষ্ণৌ থেকে স্যর স্লীম্যানের চিঠি পেলেন, ৮ মে (১৮৪৯) তারিখে লেখা—

'সরকারের বার্ষিক ব্যয় প্রায় এক কোটি টাকা। আর এ বছর তাঁর (রাজার) রোগ ও শরৎকালের ফসল খারাপ হওয়ায় আদায় হয়েছে ষাট লক্ষ টাকারও কম। তাই রাজার পিতা আলাদা যে তহবিল মজুত রেখে যান, তাতে তাঁর বেশ হাত পড়েছে। যে অপদার্থের দল নিয়ে তিনি নিজের চারদিক ঘিরে রেখেছেন, তারা, শোনা যায়, তাঁর অসুখের সময় তাতে দস্তুরমত ভাগ বসিয়েছে, শীঘ্রই সব উড়ে যাবে ভেবে।...

সেই সাঙ্গপাঙ্গদের স্বরূপ নবাবেরই হয়ত অজানা। তিনি প্রমোদ তরণী ভাসিয়ে চলেছেন ঐশ্বর্যের তরঙ্গে। পূর্বগামীদের বিলাস ব্যসনে মত্ত নবাবিয়ানা তাঁর আবাল্য দেখা। তা-ই তাঁর ছিল লক্ষ্য আর আদর্শ। সেই সঙ্গে আপন সহজাত প্রবৃত্তি মিলেমিশে গেছে। তাঁরও এই ধারণা—নবাবী হল চূড়ান্ত ভোগ-সুখের জন্যে খোদার দান। নবাবের এই বিলাস উপকরণের প্রাচুর্য, আড়ম্বর-প্রিয়তা আর সেই সঙ্গে কামবৃত্তির এমন বিকৃতি না ঘটলে এত বড় বিপর্যয় দেখা দিত কি? শুধু সঙ্গীত নৃত্য কাব্য গীতিনাট্য চর্চার জন্যে হত কি এমন অভাবিত সংকট? চেষ্টা করলে ওয়াজিদ আলী শিরপীসত্তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে রাজ্যের কাঠামো বজায় রাখতে পারতেন হয়ত।

PATHAGAR

তখন রেসিডেন্ট আরেকটি ডেসপ্যাচ পাঠালেন ভারত সরকারের সেক্রেটারি এইচ. এম. এলিয়টকে— লক্ষ্ণৌ, ১৯ জুন, ১৮৪৯

'ঘটনা সব দ্রুত সংকটের দিকে ঘনিয়ে আসছে। এ অবস্থায় আমার পরামর্শ দেওয়া এবং কিছু কাজের কাজ করা উচিত। জুয়াচোর ও খোজারা তাতে ভয় পায়।

...অনেক দরকারী কাজ টাকার অভাবে হেলাফেলা হচ্ছে।...

উজীর, গাইয়ের দল আর খোজারা সব এককাট্টা হয়েছে। কিন্তু এটা বেশিদিন টিঁকতে পারে না। মাহিন্নার জন্যে চেঁচামেচির ব্যাপারে 'বাইরেকার চাপ' শীঘ্রই মন্ত্রীকে কাৎ করে ফেলবে; কিন্তু এই চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ঘাটতি আর শ'পাঁচেক জুয়াচোর আর খোজার ভার সামলাবার মতন আরেকজনকে পাওয়া তাদের

পক্ষে বড়ই শক্ত হবে। এই হতভাগাগুলোকে একেবারে দূর করে দেবার জন্যে একটা কিছু করা দরকার। না হলে ক্রমে অবস্থা আরো খারাপ দাঁড়াবে। আমার কাছে সবচেয়ে ভাল উপায় এই মনে হয় —এমন এক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় যার কৈফিয়ত চাইতে ওরা সাহস করবে না এবং রাজাও কিছু করতে পারবেন না ; এবং যদি রাজা আপত্তি করেন তাঁকে বলে দিতে হবে যে তিনি তাঁর পুত্রের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করুন। এই সব চেয়ে ভাল পন্থা আর কোন গোলমালও হবে না ; বিয়ের ঘণ্টার মতন তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে, গভর্নর জেনারেল এবং আপনার সেক্রেটারীর দফতরের কোন অশান্তি ঘটবে না।...'

শোনা যায়, ওয়াজিদ আলী এমন ছিলেন না প্রথম দিকে। অর্থাৎ মসনদ পাবার ঠিক পরেই। সে সময় রাজকীয় কাজকর্ম খানিকটা দেখতেন। উদ্যোগীও ছিলেন কিছু। রাজমাতা যে বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী এবং নির্ভরযোগ্যা একথাও বুঝতেন। তাই নিয়মিত পরামর্শ করতেন তাঁর সঙ্গে। রাজ্যের পরিচালন ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে তাঁর কাছে যেতেন, পুরনো দৌলৎখানা প্রাসাদে। তখন মনে হ'ত, আগেকার নবাবদের মতন ওয়াজিদ আলীর রাজ-জমানাও একরকম চলে যাবে শেষ পর্যন্ত।

তাঁর শাহী জীবনের একমাত্র ঘটনাও তখনকার। আমিনুদ্দৌলা ছিলেন তাঁর পিতার আমল থেকে উজীর। তাঁকে ওয়াজিদ আলী বরখাস্ত করে দিলেন। দিল্লীর মোগল বংশীয় আলী নকী খাঁকে নিযুক্ত করলেন উজীর পদে। আলী নকী খাঁ নবাবের অনেক শ্বশুরের অন্যতমও বটেন।

এটি ভিন্ন অন্য কোন রাজনৈতিক কাজে তৎপর হননি ওয়াজিদ আলী শাহ্।

ওই ঘটনার পরেই আবার তাঁর আগেকার অকর্মক জীবন। প্রশাসনের কোন দিকে তাঁর নজর নেই, দায়িত্ব নেই, সম্পর্ক নেই। তখ্‌ৎ পাবার আগে যেমন দিন কাট্‌ত পরীখানায় আর জলসায়, ঠিক তেমনি। রাজকার্যে তৎপরতা দূরের কথা, নিয়ম-বাঁধা কর্তব্য পালনেও নবাবের কোন আগ্রহ দেখা গেল না।

আর সেই প্রথম ও একমাত্র কাজ থেকেই ইংরেজ শক্তির সঙ্গে, রেসিডেণ্টের সঙ্গে তাঁর অবনিবনার শুরু। কারণ বরখাস্ত উজীর আমিনুদ্দৌলাকে আউধের বৃটিশ প্রতিনিধিরা সম্মানের চোখে দেখতেন। আগেকার নবাব আমজাদ আলীর এবং ইংরেজদেরও বিশ্বস্ত মন্ত্রী আমিনুদ্দৌলা। তাঁকে বিতাড়িত করায় একেবারেই সায় ছিল না স্যর স্লীম্যানের। নবাবকে আপত্তিও জানান রেসিডেণ্ট্। কিন্তু ওয়াজিদ আলী সাহেবের কোন ওজর গ্রাহ্য করেন নি। উজীর বানালেন এক শ্বশুরকে।

নবাব যে বিরুদ্ধাচারী হলেন, এটি মনে রাখলেন ইংরেজ পক্ষ। রেসিডেণ্টের বিরোধিতা করে তিনি স্বয়ং-ও তা বুঝলেন। কিন্তু আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে কোন উদ্যোগও দেখালেন না তারপর। রাজনীতিক ক্ষমতা যতটুকু হাতে ছিল, তার সদ্‌ব্যবহার করতে পারতেন রাজনীতিতে নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখতে। কিন্তু নতুন নবাব সেসব কিছুই করলেন না। এমন জবরদস্ত সাম্রাজ্য-শিকারীদের থাবার সামনেই ডুব দিলেন নিশ্ছিদ্র আরাম আয়েসে।

ইংরেজদের ক্ষমতা অবধ রাজ্যের সব দিকেই বৃদ্ধি পেতে লাগল।...

হীরা মোতি গাঁথা তাজ মাথায় ওয়াজিদ আলী শাহ্ মসনদে বসলেন ১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারিতে। বয়স তখন তাঁর পাঁচিশ বছর চলছে। ভারতের গভর্নর জেনারেল সে সময় লর্ড হার্ডিঞ্জ। তার এক বছরের মধ্যেই তিনি অবসর নিলেন (৩ জানুয়ারী, ১৮৪৮)। নতুন বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড ডালহাউসি।

নতুন গভর্নর জেনারেলের নতুন কর্মপন্থা। আরো বড় কূটনৈতিক লক্ষ্য। দুর্দান্ত সাম্রাজ্যবিস্তারী। হিন্দুস্থানে তড়িঘড়ি, ছলে বলে কৌশলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সার্বভৌম করতে প্রথম থেকেই উদ্যোগী লর্ড ডালহাউসি।

লর্ড হার্ডিঞ্জ তখনো কলকাতায় ছিলেন। তিনি অযোধ্যার পরিস্থিতি সবিস্তারে বিবৃত করেন লর্ড ডালহাউসিকে।

এমন কথাও নাকি তাঁকে হার্ডিঞ্জ বলেন, 'আউধের রাজাকে জানিয়ে দেয়া যায়, রাজ্যের উন্নতি ও সংস্কার করা একান্ত জরুরি দরকার।'

শোনা যায়, লর্ড হার্ডিঞ্জের পক্ষে রেসিডেন্ট একটি পত্রও দেন নবাবকে, ওই মর্মে। কিন্তু ওয়াজিদ আলী এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান নি। সে ফুরসত তাঁর ছিল না। রেসিডেন্টের চিঠি আর গভর্নর জেনারেলের মতামতে অবধের রাজার কি?

তখন যদি মাথা স্থির রেখে বিবেচনা করতেন, হালটা বুঝতেন, তাহলে গভর্নর জেনারেল আর রেসিডেন্টের এখ্তিয়ার সমঝে যেতেন!

কিন্তু তখন নবাবের সময় কোথায়? প্রমোদ তরঙ্গে ময়ূরপঙ্খী ভাসমান।

নবাব নিজেই সেসব দিন রাতের বর্ণনা অনেকাংশেই করেছেন। ছেলেবেলা থেকে প্রথম যৌবনের হারেম বৃত্তান্ত। তাঁর লেখা 'তারীখ-এ-পরীখানা'য় পাওয়া যায় বিশ্বাসযোগ্য ভাবে। সেই পঙ্কিলতার মধ্যে অন্য নবাবও কাটাতে পারেন। কিন্তু ওয়াজিদ আলীর তুল্য এমন অসঙ্কোচে কে প্রকাশ করেছেন সেসব বৃত্তান্ত।

সেই 'তারীখ-এ-পরীখানা' অনুবাদের আগে নবাবের জন্ম ও শৈশবের দু-একটি কথা।

১৮২২ সালের ১৩ জুলাই তাঁর জন্ম হয় লক্ষ্ণৌতে। এ বংশের ষষ্ঠ নবাব গাজীউদ্দিন হায়দরের আমল তখন। তাঁকেই প্রথম 'অযোধ্যার রাজা' খেতাব দেন লর্ড হেস্টিংস। বৃটিশ সরকারের সহায়তারই পুরস্কার এই বংশগত উপাধি। আসলে স্বাধীন রাজার বিশেষ কোন ক্ষমতাই গাজীউদ্দিন পান নি।

তারপর ওয়াজিদ আলীর যখন চার বছর বয়স তখন মৃত্যু হল গাজীউদ্দিনের। তার তখ্তে বসলেন তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দিন হায়দর।

সেই সপ্তম নবাব নাসিরুদ্দিনের আমলে (১৮২৭-১৮৩৭, ওয়াজিদের পনের বছর পর্যন্ত অতিবাহিত। নাসিরুদ্দিনের যে অদ্ভুত ভোগী চরিত্র, নবাব কুলে তার তুলনা বিরল। ওয়াজিদ আলীর প্রথম তারুণ্যকালে তার কি প্রভাব পড়ে কিছু?

খুবই সম্ভব। কারণ নিজের আট বছর বয়স থেকেই তো তিনি প্রাসাদ পরিবেশের পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছেন 'তারীখ-এ-পরীখানা'য়। তখন থেকে আরো সাত-আট বছর নাসিরুদ্দিনের নবাবী জোর কদমে চলেছিল। প্রাথমিক প্রবৃত্তি নিয়ে ওয়াজিদও তো দেখতেন শুনতেন সেসব!

নাসিরুদ্দিনের হালচালের কথা পরে আসবে।

এখন ওয়াজিদ আলীর প্রথম পর্বের আত্মকাহিনী।

'আমার যখন আট বছর বয়স তখন আমি একটি রমণীর সংস্পর্শে আসি। সে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী একজন ধাত্রী। অনেক সময়ে সে আমার কাছেই থাকত। তার নাম রহিমন। এক রাতে আমি অঘোরে ঘুমিয়েছিলুম, এমন সময় সে আমায় জ্বালাতন করতে আরম্ভ করলে। আমি জেগে উঠে পালিয়ে যেতে চাইলে সে আমাকে ছাড়লে না, বকুনি দিয়ে আটকে রেখে দিলে। সেদিন থেকে সে প্রত্যহ জ্বালাতন করত আমায়। আমার যখন দশ বছর বয়স, তখনো পর্যন্ত এমনি চলেছিল। গোড়া থেকেই আমার স্বভাবের ঝোঁক ছিল মহব্বতের দিকে। আমার ওপর প্রেমের আধিপত্য ছিল।'

'আমীরণ আমীরণ, আমার জননীর পরিচারিকা। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর

বয়স। গমের মতন তার গায়ের রঙ, একহারা চেহারা। ডান চোখের ওপর একটা সাদা দাগ। সব সময়েই সে রঙীন পোশাক পরে থাকত। চরিত্র খারাপ ছিল তার। লোকদের শিকার করে বেড়াত। তার তলব ছিল মাসে চার টাকা, কিন্তু সে বাস করত আড়ম্বরের সঙ্গে। সকলে নাসিরুদ্দিনের মঞ্জিলে চলে গেলে আমীরণ আমার ঘরে চড়াও হত। আমি ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকতুম, তাই অসুবিধা হত না তার। প্রায় এক বছর আমি তার প্যার ভোগ করি, আমার এগারো বছর বয়স পর্যন্ত।'

তারপর ওয়াজিদ আলী বইটিতে একটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন—'আমি বান্নুর প্রেমে পড়লুম, কিন্তু সে আমায় প্রত্যাখ্যান করলে।'

এই পরিচ্ছেদে নবাব লিখেছেন—'এগারো বছর বয়স থেকে আমি সুন্দরী নারীদের উপভোগ করতে থাকি। বান্নু সাহাব, তার বাবা নিগ্রো (শোদি সুলতান) আর মা ভারতীয়, আমার জননীর কাছে নিযুক্ত ছিল। পরিচারিকাদের মধ্যে প্রধানা সে। তার বিয়ে হয়েছিল। স্বামীর নাম মীর্জা জান্। আমি তার প্রেমে পড়ি আর তাকে পেতে চাই। সে বুদ্ধিমতী ও খাঁটি ছিল তাই আমায় এড়িয়ে চলত। বয়স তার তেইশ বছর। রঙ্ ফর্সা নয়, মাথায় মাঝারি মাপের। কিন্তু খুবসুরত। সে তার ছোট বোন হাজি খানান-কে কাজে এনেছিল। তাকে দেখেও আমার মহব্বত জাগে। শাওন মাস, বর্ষাকাল। খানানের বয়স বাইশ বছর। অতি সুন্দরী লম্বা গড়ন। তাকে প্রথম দেখেই আমি নিজের ওপর সব সংযম হারিয়ে ফেলি। খোদার কাছে প্রার্থনা করতে থাকি যেন তাকে দেন আমায়। কিন্তু সুযোগ হচ্ছিল না।'

'ওদেরই সম্পর্কে এক বোন ছিল ইমামি খানা নামে। তার বয়স চল্লিশ বছর। কালো, কুৎসিত চেহারা। তাকে আমি মধ্যস্থা করে পাঠালুম হাজি খানানের কাছে। তারপর থেকে হাজি আমার উপর প্যার করতে আরম্ভ করলে। আমার সঙ্গে হাজি খানানের মিলন ঘটালে ইমামি খানা। হাজি খানানও বিবাহিতা ছিল।'

তারপর আরো এক পরিচারিকার কথা ওয়াজিদ আলী লিখেছেন। তার নাম এলাহি খানান। হাজির ভাই শেদী আমানের হারেমে নিযুক্তা ছিল সে। এলাহি খানান-ও ওয়াজিদের প্রেমে পড়ে। তাঁর তেরো-চোদ্দ বছর পর্যন্ত এলাহি খানানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। তারপর সে চলে যায় ফৈজাবাদ। বিদায়ের সময় তিনি তাকে উপহার দেন একটি আংটি আর তিনটি গজদন্তের চিরুনী।

এই বই থেকেই জানা যায়, ওয়াজিদ আলীর পনরো বছর বয়সে পিতামাতা তাঁর বিবাহের আয়োজন করেন। প্রথমে বিবাহের কথা হয় মোমিন উদ্দৌলার কন্যার সঙ্গে। কিন্তু তাতে অসম্মত হন ওয়াজিদ আলী। তারপর সৈফুদ্দৌলার কন্যার সঙ্গে বিবাহের কথা হয়, কিন্তু এখানেও বিবাহ হয় নি। তারপর ওয়াজিরনের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবও কার্যকর হল না, মেয়েটির গায়ে সাদা দাগের জন্যে। তখন লক্ষ্ণৌর বিশেষ সম্মানিত পরিবারের আলী নকী খাঁর কন্যার সঙ্গে ওয়াজিদ আলীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহের প্রাথমিক উৎসব হবার পর এবারও বাধা পড়ে, দুপক্ষেরই এক এক আত্মীয় বিয়োগের ফলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দু'মাস পরে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। ওয়াজিদ আলী জানিয়েছেন যে, তিনি পাঁচ মাস সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করেছিলেন মধুচন্দ্রিমা।

তার পরেই নাসিরুদ্দিন হায়দারের মৃত্যু হয় এবং অযোধ্যার মসনদ লাভ করেন ওয়াজিদের পিতামহ মহম্মদ আলী শাহ্। রাজ্যের পরবর্তী উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হন তাঁর পুত্র আমজাদ আলী, ওয়াজিদ আলীর পিতা। এই সব পদপ্রাপ্তির জন্যে পরিবারের সকলেই বৃত্তি পেলেন—ওয়াজিদ আলী ভিন্ন, কারণ তিনি পরে নবাবী পাবেন। বৃত্তি না পাওয়ার বিষয়ে এইরকমই মনে হয়েছিল ওয়াজিদ আলীর। তিনি একথা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখও করেছেন।

তাঁর পিতা অর্থাৎ শাহ্জাদা তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে তাঁকে (ওয়াজিদ) পাঁচশ ও তাঁর পত্নীকে চারশ টাকা মাসিক দিতেন।

তখনকার নিজের মতিগতির পরিচয় দিয়ে ওয়াজিদ আলী লিখেছেন যে, প্রাসাদে গোপনে পরিচারিকাদের উত্যক্ত করে বেড়াতেন। তাঁর পত্নী জানতে পেরে গুরুতর-ভাবে ব্যাপারটাকে নেন এবং সেই মেয়েদের কাজ থেকে সরিয়ে স্বামীর ওপর পাহারা বসিয়ে দেন। কিন্তু ওয়াজিদ নিজেকে সংযত করতে পারেন নি। সব সময় কেবল খুঁজে বেড়াতেন মেয়েমানুষ।

পিতা শাহ্জাদা হবার এক বছর পরে ওয়াজিদ আলী ও তাঁর পত্নী নবাব আজম বহুসাহেবার পুত্র জন্মাল। পিতামহ খুশী হলেন। ওয়াজিদকে পোশাক দিলেন আর খেতাব—নাজিম উদ্দৌলা ফখরুল্ মুলক্ মহম্মদ ওয়াজিদ আলী খাঁ বাহাদুর শৌকৎ জঙ্গ। তখন তাঁর বয়স প্রায় ষোল বছর। তার দুমাস পরে খেতাব বদলে করা হল—মীর্জা খুরশিদ হাশ্মৎ মহম্মদ ওয়াজিদ আলী। কারণ তাঁর পুত্রের খেতাব হয়েছিল মীর্জা নওশের্ওয়া কাদ্র বাহাদুর।

তার এক বছর পরে ওয়াজিদের দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হল। পিতামহ তার খেতাব দিলেন—মীর্জা ফালেক কাদ্র বাহাদুর।

ওয়াজিদ আলীর বয়স তখন সতের বছর। এ সময়ের কথা নিজেই তিনি লিখেছেন—'তখন আমার যৌবন বলে আমি ভাবতুম কি করে সুন্দরী রমণীদের ভোগ করা যায়। ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্ত করলুম যে, মেয়েমানুষদের আমার কাজে নিযুক্ত করলে ভোগ করবার বেশ সুবিধা।

এইরকম বুদ্ধি যোগাতে আমি আরাম বোধ করে, মোতি খানাম নামে এক সুন্দরীকে নিযুক্ত করলুম। তার ফর্সা ছিপছিপে গড়ন। আগে সে আমার পরদাদার নাচওয়ালী ছিল। আমার স্ত্রী সুনজরে ব্যাপারটা দেখলেন না। চেঁচামেচি করে একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুললেন আর বরখাস্ত করলেন মোতি খানামকে। বাবাও ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে নজরবন্দী করে রাখলেন।'

'এই ঘটনার পর আমি আমার মনকে ফেরালুম কবিতার দিকে। বাবা রেগে আছেন, আমার মনে সুখ নেই। এইভাবে কিছুদিন চলার পর বাবা হুকুম দিলেন যে মোতি খানামকে আমায় দেয়া হবে। তবে এই শর্তে যে, সে থাকবে আলাদা বাড়িতে। বাবার চোখের সামনে সে যেন আসতে না পারে।...'

আমার তখন আঠারো বছর বয়স। এই সময় থেকে আমি কবিতা রচনা আরম্ভ করি আর মোতির মহব্বতের ফলে দুটি দিওয়ান ও তিনটি মসনবী লিখি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তখন সদ্ভাব ছিল না। তবে তিনি খুব বুদ্ধিমতী। একদিন জিজ্ঞেস

করলেন, আমার ক্ষোভের কারণ কি! আমি চুপ করে রইলুম।

তিনি বুঝে নিয়ে বললেন --তুমি যদি আর কারুর সঙ্গে প্রেম করো, আমার কোন আপত্তি নেই।

আমি বললুম— যদি তুমি এতে রাজি থাকো, যদি তুমি একথা বলো তাহলে আর আমার কিছু বলবার নেই।'

এই সময়ের কিছু পরেই ওয়াজিদ আলীর তৃতীয় পুত্র জন্মাবার কথা তিনি লিখেছেন। তার নাম মীর্জা কিচন কাদ্‌র।

তারপর উল্লিখিত আছে সাহাব খানামের কথা। সাহাব খানামের বত্রিশ বছর বয়স। সে গানওয়ালী। ওয়াজিদ-পিতার কাজে নিযুক্ত ছিল। সাহাব খানামের সঙ্গেও প্রেমের সম্পর্কের কথা নিজেই বলেছেন ওয়াজিদ আলী।

তাঁর এই উনিশ বছর বয়সে প্রথম সেতার বাজনার কথা জানা যায়। সেতারের চর্চা তিনি এসময় করেন এক বছর যাবৎ। তাঁর চতুর্থ সন্তান, একটি মেয়ের জন্মও হয় এই সময়ে। তখন অযোধ্যার তখ্‌তে তাঁর পিতা সুরাইয়া জাহ্‌ আমজাদ আলী শাহ্‌ বসেছেন।

উম্‌দা বেগম হলেন ওয়াজিদ আলীর আর এক নর্মসঙ্গিনী। তিনি নিজেই সেকথা জানিয়েছেন এই আত্মকাহিনীতে।

এই মহিলার বয়স তখন আন্দাজ সাতাশ বছর। উম্‌দা বেগমের আগে নিযুক্ত থাকার কথা জানা যায় নবাব নাসির্‌দ্দিন হায়দরের আমলে। সাহাব খানামের পর্ব যখন চলছিল তখনই ওয়াজিদের সম্পর্কে আসে উম্‌দা বেগম। সাহাব খানাম উম্‌দা বেগমের ওপর ঈর্ষান্বিতা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগে দুজনের মধ্যে। তখন ওয়াজিদ আলী সাহাব খানামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বন্ধ করে দেন। কারণ তার স্বামী ছিল।

ওয়াজিদ আলী এখন শাহ্‌জাদা। সরফরাজ বেগম আর নান্নি বেগম নামে তাঁর আরো দুজন প্রণয়িনীর কথাও এসময়ে তিনি বলেছেন। নান্নি বেগম এক সম্মানিত পরিবারের মহিলা। তাঁর স্বামীর মৃত্যুকালে তাঁদের তিন বছরের এক কন্যা বর্তমান ছিল। তাঁর জন্যে একটি পৃথক প্রাসাদের বন্দোবস্ত হল, সেই সঙ্গে রূপার বাসনপত্র ইত্যাদি।

শাহ্‌জাদা হবার একমাস পরে ওয়াজিদ আলী উম্‌দা বেগমকে শাদি করলেন। তাঁর নাম দিলেন নবাব উম্‌দা বেগম সাহেবা। তাঁকে নিয়ে দেড় মাস বিবাহিত জীবন ভোগ করলেন। তারপর ঝুঁকলেন নান্নি বেগমের দিকে। তাঁর সঙ্গে বিবাহ হল।

ওয়াজিদ আলীর এই তৃতীয় বিবাহ। নতুন বেগমের খেতাব দিলেন নিশাদ মহল নবাব নান্নি বেগম সাহেবা। ইতিমধ্যে নান্নি বেগমের সেই মেয়েটির মৃত্যু হয়েছিল। ওয়াজিদ আলী লিখেছেন যে, নান্নি বেগমকে নিয়ে বিবাহের পর তিনি সুখী ছিলেন পনরো দিন মাত্র।

তারপর তিনি ওয়াজিরান নামে এক বাইজীর সঙ্গে পরিচিত হলেন। কসাইয়াপুল নিবাসিনী এই নাচওয়ালীর বয়স আঠারো বছর। তার নাচ আর গানে ওয়াজিদ আলী মুগ্ধ হলেন। এ সময়ে তাঁর প্রাসাদের দারোগা নাজ মুন্নিসা বেগম তাঁর জন্যে নিযুক্ত করেন আঠারোটি সুন্দরী মেয়ে।

ওয়াজিদ আলী লিখেছেন—'দারোগা খুব চতুরা। সে আমার চোখ দেখে আমার মনের ভাব বুঝতে পারত। ওয়াজিরানের জন্যে আমার কামনা দেখে চেষ্টা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে।'

তা ছাড়া আম্মন ও এমামন নামে আরো দুটি গানওয়ালী বোনের কথা নবাবের লেখা থেকে জানা যায়। তাদের দুজনেরই সঙ্গে তাঁর প্রণয় ছিল।

এই সময় ওয়াজিদ আলী ঠুংরি গান রচনা করতে অভ্যস্ত হন। তাঁর একটি ঠুংরির স্থায়ী কলি হল—'শুনু ও গুঁইয়া সেঁইয়া রহে ওয়াহুদেশ' (ও বঁধু, আমার প্রিয়া রয় বিদেশে)। বয়স তাঁর তখন প্রায় বিশ বছর।

তখন অনেক সময় তিনি বিষণ্ণ হয়ে থাকতেন। হাতে সেতার নিয়ে প্রাসাদে সময় কাটাতেন। সেই ওয়াজিরান বাঈজীর জন্যে তাঁর এত মন খারাপ হত যে, আত্মহত্যা করতে পর্যন্ত চেয়েছিলেন। তাইতে দারোগা তাঁর সঙ্গে ওয়াজিরানের মিলনের বন্দোবস্ত করেন মোজাইন্ আমিনোদ্দোলাতে। সেখানে ওয়াজিদ আলী ওয়াজিরান-কে উপহারাদি দেন। তারপর পুরো এক বছর সুখে কাটান তাকে নিয়ে।

সে সময় তাঁর বাইশ বছর বয়স। যে আঠারোটি নতুন মেয়েকে তাঁর প্রাসাদে নিযুক্ত করা হয় তাদের বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন—'দু বছর ধরে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি দুষ্টুমি করতুম। কারণ তারা সকলেই ছিল দুশ্চরিত্রা।...কিছুদিন পরে তাদের সবাইকে আমি ভুলে যাই।

"কুতুব আলী খাঁ সেতারবাদককে আমি নিযুক্ত করেছিলুম। তিনি ছিলেন এক বিখ্যাত সেতার-বাদক। আগে তিনি মোক্তারুদ্দৌলা ইরাণে নাসিরুদ্দিনের দরবারে ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা আসেন বেরিলি শহর থেকে। তাঁরা রাজপুত ছিলেন, রাজা জগৎদেবের বংশীয়।...কুতুবের বয়স প্রায় ত্রিশ বছর। মুখে গুম্ফ, ঘন কেশ, গৌরবর্ণ। পঠন ও লিখনে পটু। ভাল কবি এবং সঙ্গীত-জগতে অতি উৎকৃষ্ট শিল্পী বলে তাঁর সময়ের নায়ক বৈজু, নায়ক গোপাল ও তানসেন ছিলেন। আমি তাঁকে নিযুক্ত করি আমার সেতার শিক্ষক।...প্যারে খাঁ আমায় তারিফ করতেন আর কুতুব আমার হাতে চুম্বন করতেন। আমরা একসঙ্গে কাটাতুম ঘণ্টার পর ঘণ্টা।...'

তারপর আবার নারী-প্রসঙ্গের উল্লেখ করে ওয়াজিদ আলী লিখেছেন যে, তাঁর হারেমবাসিনীদের জন্যে সঙ্গীতশিক্ষার তিনি বন্দোবস্ত করতেন।

'আম্মন আর এমামন জানায় যে তাদের আত্মীয়দের মধ্যে কজন আছেন যন্ত্র-সঙ্গীতের ওস্তাদ! তাই তাঁদের আনিয়ে একদিন জল্‌সা করি। তাদের বাবা নাথু খাঁ, কাকা গোলাম নবী, ভগ্নীপতি খাম্মন খাঁ আর মামা গোলাম হায়দর এসে সে আসরে শরদ বাজালেন।'

এই জলসার পর থেকে ওয়াজিদ আলীর সঙ্গীতের দরবার আরো জমে উঠল। ওই নাথু খাঁ ও খাম্মান খাঁকে তিনি নিযুক্ত করলেন দরবারের দুটি গায়িকা হুরু পরী ও সুলতানকে তালিম দেবার জন্যে। আরো কজন ভাল ওস্তাদকে অন্যান্য মেয়েদের শেখাবার জন্যে নিয়োগ করা হল। তাঁদের নাম সাবেৎ আলী, ছজ্জু খাঁ (সহোদর ভাই) প্রভৃতি।

প্রাসাদে দস্তুরমত সঙ্গীতের পাঠ দেওয়া হতে লাগল। ওয়াজিদ আলী নিজে

সেখানে নাথু খাঁর কাছে শিখতে লাগলেন। আর ক্রমে এ বিদ্যায় এমন তৈরী হয়ে উঠলেন যে ওস্তাদকেও নাকি ছাড়িয়ে গেলেন। এসময় ওস্তাদ গোলাম রেজাও নিযুক্ত হলেন তাঁর দরবারে। গোলাম রেজার সঙ্গে তিনি দিন-রাতের অনেকটা সময় কাটাতেন।

গান বাজনা রীতিমত শেখবার জন্যে একটি আলাদা বাড়ির বন্দোবস্ত হল— তার নাম পাঙ্খানা। সেখানে নবাব ভিন্ন শুধু ওস্তাদ, দারোগা আর পরীদের প্রবেশের অধিকার ছিল। প্রত্যহ ছটা থেকে নটা পর্যন্ত গোলাম রেজা, খাম্মান খাঁ, ছজ্জু খাঁ ও সাবেৎ আলী শেখাতেন পরীদের অর্থাৎ তাঁর নিযুক্ত গায়িকা নটীদের।

ওয়াজিদ আলী নিজেও গান-বাজনা শিখতেন ওস্তাদের কাছে। আবার সেই সঙ্গে নটী সংগ্রহের চেষ্টা চলত। লক্ষ্ণৌর নাচওয়ালী গানওয়ালীদের আনতে তৎপর হতেন নিজের প্রাসাদে। ওরাজিরানের সুন্দরী বোনঝি মুন্নার কথাও তাদের মধ্যে আছে।

একটি জলসার কথাও ওয়াজিদ আলী জানান এসময়। সেদিন তবলিয়া ছোটে খাঁ অসাধারণ বাজিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌ দরবারে আসেন সাহারানপুর থেকে। গোলাম আলীর সুপারিশে ছোটে খাঁ জীবিকার আশায় এখানে এসেছিলেন। তাঁর বাদনশক্তি দেখে ওয়াজিদ আলী নিযুক্ত করলেন তাঁকে।

সেই ছোটে খাঁর পঁয়ত্রিশ বছর বয়স। হাসিখুশি স্বভাব। বলিষ্ঠ চেহারা। ওয়াজিদ আলী তাঁকে খেতাব দিলেন বাহারে মহ্‌ফিল। আর গোলাম রেজার সঙ্গে সমান মর্যাদায় রেখে দিলেন।

ওদিকে পরীদের সংখ্যাও তখন কম নয় হারেমে। তাদের জন্যে কোঠি, ভরণ-পোষণ, সাজসজ্জা আর নাচগানের বাবদ বছরে লক্ষাধিক টাকা খরচ। এসব লেখকের বিবৃতিতেই প্রকাশ।

তারপর সুলেমান পরীর সঙ্গে নিজের বিবাহের কথাও তিনি জানিয়েছেন। এই নিয়ে তাঁর চতুর্থ পরিণয়। এসময় তাঁর তৃতীয় পুত্র মীর্জা বদর বখ্‌তের জন্ম। আবার কিছুদিনের মধ্যেই তার মৃত্যুরও উল্লেখ করেছেন ওয়াজিদ আলী। আর বেগম ফরমুণ্ডা খানমের গর্ভে এক কন্যা জন্মাবার কথাও পাওয়া যায়। আবার একই সঙ্গে তিনি লিখেছেন, শাহেনশা পরী ও তিনটি মেয়েকে রাখা হয়েছে সঙ্গীত দরবারে।

তারপর ওয়াজিদ আলী তাঁর বারো জন নিযুক্ত ওস্তাদদের নাম করেছেন। গোলাম আলী খাঁ প্রমুখ সেই গুণীদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে 'সূচনা'য়।

এই সব কলাবৎরা শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত হন এবং তাদের খেতাব দেয়া হয় আলাদা ভাবে। একথাও লেখক জানিয়েছেন। আর উল্লেখ করেছেন পরীদের নাচ-গানের কথা। তারা এমন নিপুণা হয়েছে যে ইন্দ্রলোকেরও ঈর্ষা করবার মতন।

এসময় পঞ্চম পুত্র বির্জিস কাদরের জন্মাবার কথাও তিনি বলেছেন। বির্জিস জননী বেগম হজরৎ মহল আগে ছিলেন মাহক পরী।

বির্জিস কাদরের সঙ্গে নবাবের আরেকটি কন্যারও জন্ম হয়। অবশ্যই অন্য বেগমের গর্ভে।

তারপর পাওয়া যায় গোহর আলী নামে এক প্রসিদ্ধ ধ্রুপদীর কথা। তাঁকে ওয়াজিদ আলী দরবারে নিযুক্ত করেন। আবার কিছুদিনের মধ্যেই বরখাস্ত করে দেন প্রতারণার জন্যে।

নিজের হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হবার উল্লেখও এখানে তিনি করেছেন।

এসময়ই তিনি প্রথম 'রহস' দেখেন একটি জলসায়। তা হল, রাধা-কৃষ্ণের রাসলীলা কাহিনী। কিন্তু সে অনুষ্ঠানের উচ্চারণও যেমন বিকৃত, তার ভাবও তেমনি স্থূলভাবে ধারণ করা। বিধর্মী বিদেশীর পৃথক মানসিকতায় রাধা-কৃষ্ণ-লীলা কি উদ্ভট রূপ নেয়, তার পরিচয় পাওয়া যাবে নবাব রচিত 'রাধা কিষণ কা কিস্‌সা' (রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনী) গীতিনাটিকায়।

এই প্রথম 'রহস' দেখে মুগ্ধ হন নবাব। তারপর পরীদের নিয়ে রাসলীলা গীতিনাট্যের অভিনয়ও করলেন। নটীদের গানে তালীম দেন ওস্তাদরা। রাধার ভূমিকায় সুলতান পরী। বংশীধারী কৃষ্ণ—মাহ্‌রোক পরী। আর গোপীদের রূপে —ইজ্জৎ পরী, আসমান পরী, দিল্‌রুবা পরী ও হুর পরী।

নাট্যানুষ্ঠানটির জন্যে তাঁর নাকি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়ে যায়।

তারপরই লেখক জানিয়েছেন পিতা আম্‌জাদ আলীর মৃত্যু এবং নিজের সিংহাসন প্রাপ্তির সংবাদ।

নতুন নবাব দরবারে প্রথম খেতাব পেলেন ওস্তাদেরা। ছোটে খাঁ—আনিস্‌-উদ্‌-দৌলা। গোলাম রেজা—রাজিব-উদ্‌-দৌলা। ছজ্জু খাঁ—দেহাজ-উদ্‌-দৌলা। কুতুব আলী—কুতুব-উদ্‌-দৌলা।

আর, অনেক পরীকে পত্নীর মর্যাদা দেয়া হল। ওয়াজিদ আলী নিজে লিখেছেন 'একজন রাজার পক্ষে এত রানী থাকা মন্দ নয়।'

পরীখানা'র শেষ পরিচ্ছেদটির তিনি নাম দিয়েছেন—'এক শ' বেগম আর পরী-দের স্ত্রীর আসন দেওয়া হল।'

মসনদে বসে ওয়াজিদ আলী শাহ্‌ আরো নাচনী নিয়োগ করলেন দরবারে। তারপর আরো কটি পারিবারিক ঘটনা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন—মাহরোক বেগমের মৃত্যু। আরেক বেগমের আত্মহত্যা। মীর্জা সুলতান কাদ্‌র নামে পুত্রের জন্ম। শাহ্‌ মঞ্জিল প্রাসাদে এক কন্যার বিবাহ। আর সিকন্দার মহলকে নবাবের নিজের নিকা করার সংবাদ!

ইত্যাদি বিবরণ দিয়ে 'তারীখ-এ-পরীখানা' সমাপ্ত করেছেন এই বলে, 'খোদা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। বস্তুর সঙ্গে প্রেমের ছাই মিশিয়ে তিনি গড়েছেন মানুষের শরীর। সেজন্যে আমার দেহও গড়ে উঠেছে জল, কাদা আর প্রেম দিয়ে।'

ওয়াজিদ আলীর ছাব্বিশ বছর বয়সে লেখা এই আত্মজীবনী। তার আগেই পান (১৮৪৭) অযোধ্যার মসনদ। আর তারপরই বেশির ভাগ পরীদের বেগম করে নেন। শূন্য হয়ে পড়ে তাঁর পরীখানা।

রাজত্ব পেয়ে মাত্র কিছুদিন ওয়াজিদ আলী রাজকার্যে মন দেন। তারপরই সেইসব পুরনো অভ্যাসের দাস। নবাবের সুরিলি দুনিয়ায় প্রথম বেসুর বাজল তিন বছর পরে। রেসিডেন্ট সাহেব একটি ঝাঁকানি দিলেন। তখন ১৮৫০ সালের মে মাসের কথা। নবাব দরবারের তিনটি পয়লা সারির সভাসদ্ হলেন রাজিবুদ্দৌলা, কুতুবুদ্দৌলা আর ওয়াহাজুদ্দৌলা। আসলে তাঁরা তিনজনই গান বাজনার ওস্তাদ। ওয়াজিদ আলীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর দরবার তো রাজনীতিক দরবার নয়, নাচ গান বাজনার আসর। তার তিন প্রধান তাঁরা। স্যার স্লীম্যান গ্রেপ্তার করলেন রাজিবুদ্দৌলা, কুতুবুদ্দৌলা আর ওয়াহাজুদ্দৌলাকে। তাঁদের প্রথমে অন্তরীণ রাখা হল শিখরাওয়ালা আস্তাবলে। (অনেক বছর পরে, পুরোপুরি বৃটিশ আমলে, লক্ষ্ণৌর মুন্সেফ কোর্ট এখানেই হয়)।

তারপর তিনজনকেই লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসন দেওয়া হল।

নবাবের উচ্ছৃঙ্খল বিলাস-জীবনের সহচর তাঁরা। সেইভাবেই রেসিডেণ্ট তাদের দেখতেন। এই বিতাড়নের উদ্দেশ্য ছিল, নবাবের অবাধ প্রমোদ-জীবন নিয়ন্ত্রণ করা।

আউধের রাজা উচ্চবাচ্চ্য করলেন না। হজম করে নিলেন ব্যাপারটা। রাজ্যে বৃটিশের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার এই পরিচয় পেয়েও সতর্ক হলেন না।

এই ধাক্কায় একবার টলে উঠ্‌ল নবাবী ময়ূরপংখী। আবার যথারীতি ভেসে চল্‌ল।

এমনিভাবে গেল আরো দেড় বছর।

তারপরের খবরটি বাইরে থেকে তেমন নাটকীয় নয়। অন্তত নবাব তার কোন গুরুত্ব দিলেন না। সাবধান হওয়া ত দূরের কথা। কিন্তু অবধের রাজনীতিক দিক থেকে ঘটনাটি গুরুতর।

তখন ১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাস। গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহাউসি যুক্ত-প্রদেশের এই অঞ্চলে হাজির হলেন। কদিন রইলেন নিকটবর্তী রামপুর রাজ্যে। তারপর কানপুরে এলেন, লক্ষ্ণৌর কাছেই। সেখান থেকে এলাহাবাদ সফর শেষে কলকাতায় ফিরলেন।

এত কাছাকাছি এসেও লক্ষ্ণৌতে পদার্পণ করলেন না ডালহাউসী। ওয়াজেদ আলীর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছাও জানালেন না।

কিন্তু তাঁর কার্যসূচীর এক প্রধান বিষয়ই ছিল—অযোধ্যার পরিস্থিতি। তাও বোঝা গেল।

কারণ স্লীম্যান দেখা করলেন গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে। কানপুরে। রেসিডেণ্ট সাহেব বেশ প্রস্তুত হয়ে যান। সঙ্গে বিস্তর দলিল দস্তাবেজ আর ইংরেজ, ফার্সী কর্মচারীর দল। যতটা সম্ভব রিপোর্ট দিলেন লর্ড ডালহাউসিকে। অর্থাৎ আউধ রাজ্যের আর নবাবের হালচাল জানালেন।

ওয়াজিদ আলী তারপর গভর্নর জেনারেলের একটি পত্র পেলেন। তার বিষয় ছিল লর্ড হার্ডিঞ্জের সেই পত্রটির মতন। লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় থেকে রাজ্যশাসন কার্যে যে-সব সংস্কার করবার কথা ছিল, সে অনুসারে কিছুই হচ্ছে না, ইত্যাদি অভিযোগ চিঠিতে।

গভর্নর জেনারেলের বেসুরো বেতালা মাতব্বরি। নবাবের ভাল লাগে না একেবারে। নবাবীর সঙ্গে এসব আবার কি? অবধের রাজা হয়েছেন কি এসব ঝামেলা পোহাবার জন্যে?

এবার রেসিডেণ্টের সঙ্গে ওয়াজেদ আলীর মন কষাকষি চলতে লাগল। ছোট খাটো ব্যাপারেও দুদিকে দুমত। কিন্তু নবাবের মত খাটে না আজকাল। দেখা যায় নবাব দরবার হয়ে পড়েছে শক্তিহীন। দিন দিন তার মেরুদণ্ড বেঁকে যাচ্ছে।

প্রবর্ধমান তখন বৃটিশ দাপট। সারা ভারতের মতো আউধ রাজ্যেও তার প্রতাপ নবাব উপযুক্ত হলে কি হত বলা কঠিন। কিন্তু তাঁর অযোগ্যতায় ইংরেজদের কাজ হাসিল হতে লাগল। আর কতদিন আগে থেকে উদযোগী ছিল বৃটিশ কূটনীতি ওয়াজেদ আলীর ক পুরুষ আগে থেকেই সেই অবস্থা। নবাবদের দখল থেকে

ইংরেজরা ক্রমেই ক্ষমতা হস্তগত করেছে। নবাবদের দখল থেকে বেরিয়ে গেছে শাসনকার্য। নবাবের সৈন্য পর্যন্ত নেই। সেনাদল সব বৃটিশের।

দেড়শ বছর আগে থেকেই আউধ রাজ্যে সেই প্রক্রিয়া। নবাবরা ভোগ-বিলাসে মত্ত। আর তৎপর, দূরদর্শী, ইংরেজরা।

অযোধ্যায় বৃটিশশক্তির ভিত্তি গড়া হয় চতুর্থ নবাব আসফুদ্দৌলার আমলে। কিংবা তার সূচনা, তাঁর পিতার সময়। তৃতীয় নবাব শুজাউদ্দৌলা যখন মীরকাসিমের পক্ষে থেকে বকসারের যুদ্ধে হারলেন, তারপরই। বক্সারের যুদ্ধ জিতে ইংরেজদের আউধ দরবারেও কর্তৃত্ব শুরু হয়ে গেল। এ রাজ্যের সৈন্যদল যাতে আর শক্তিশালী না হয় ইংরেজদের লক্ষ্য রইল সেদিকে।

তবু শুজাউদ্দৌলা যতদিন বেঁচে ছিলেন, সৈন্যদলের উন্নতিই তাঁর একমাত্র চেষ্টা ছিল।

কিন্তু সব ওলটপালট হয়ে গেল আসফুদ্দৌলার আমলে। তাঁকে আরামপ্রিয়, আয়েসী দেখে বৃটিশ কূটনীতি সক্রিয় হল। নিজেদের অধিকার বৃদ্ধি করতে লাগল অতি সতর্ক হয়ে।

নতুন নবাবকে ইংরেজরা বোঝাতে লাগলেন, 'আপনি সৈন্যদলের সংস্কার নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে অন্যদিকে মন দিন। আপনার রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব তো আমরা নিয়েছি।'

তাই বুঝলেন আসফুদ্দৌলা। বৃটিশের রক্ষাকবচ তিনিই প্রথম নিলেন। আর তার জন্যে মূল্য দিলেন প্রচুর। জৌনপুর আর বারাণসী জেলা খয়রাৎ। সেইসঙ্গে বার্ষিক প্রায় ৫০ লক্ষ টাকাও আগ্রাসী ইংরেজ পক্ষ আদায় করে নেয়।

আরো বেশি দিতে হল আসফুদ্দৌলাকে। আউধের স্বাধীনতা লোপের সেই সূচনা। বৃটিশ কর্তৃত্ব এরাজ্যে পাকাপোক্ত হয়ে বসল।

'আসফউদ্দৌলার নিজেরও ফৌজের খুব একটা শখ ছিল না। টাকা ওড়ানো, মজা ওড়ানোর জন্যে তাঁর অর্থের প্রয়োজন ছিল; এবং সৈন্যবাহিনী উঠিয়ে না দিলে এই প্রয়োজন মেটানো অসম্ভব। অতএব, কিছু খাস সৈন্য রেখে বাকি সবাইকে তিনি পত্রপাঠ বিদায় দিলেন। তারপর আকণ্ঠ ডুবে গেলেন আয়েশে-বিলাসে। যারা তাঁকে অপদস্থ করল, তারাই হল তাঁর আজ্ঞাকারী মিত্র; তাদেরই ইশারায় তিনি চলতেন; তাদের পরামর্শ ছাড়া আর কারও কথায় কর্ণপাত করতেন না।...

'...এত কাণ্ডকারখানার পরেও, নবাব বা লখনউয়ের প্রজাবর্গ, কেউই উপলব্ধি পর্যন্ত করতে পারল না যে দেশের শাসনকার্যে বাইরের শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তার বড়ো কারণঃ আসফউদ্দৌলার সীমাহীন উদারতা ও বিলাসিতা প্রজাসাধারণকেও সমান বিলাসী করে তুলেছিল। এর শেষ পরিণাম কি হবে—ভোগবিলাসের মধ্যে ডুবে থেকে একথা ভেবে দেখার প্রয়োজনই কেউ বোধ করল না!

'এই বিলাসিতার ফলঃ লখনউয়ের বহিরঙ্গ সমৃদ্ধি। দরবারের জাঁকজমক এত বেড়ে গেল, অন্যত্র, অন্য দরবারে তা দুর্লভ-দর্শন। বিলাস ও ভোগের এত সামগ্রী জড়ো হল, আর কোথাও সেরকম দেখা যায় না।.....যে অর্থ শুজাউদ্দৌলা খরচ করতেন সৈন্য ও যুদ্ধ প্রস্তুতি বাবদ, সেই অর্থ আসফউদ্দৌলা ব্যয় করতে লাগলেন

বিলাসিতায়, শহর সাজানোয় ও ত্বর উন্নতি বিধানে।.....শাসক ও আমলাবর্গ, সবাই যখন লখনউয়ে স্থায়ী বাসা বাঁধল, সাধারণ মানুষেরও মুখ ফিরে গেল লখনউয়ের দিকে। শুজাউদ্দৌলার সময়ে যারা ফয়জাবাদে থাকত, তারা এখন ফয়জাবাদের বাস উঠিয়ে লখনউয়ে চলে এল।' (পুরনো লখনউ, পৃঃ ২৭-৩১)।

আসফুদ্দৌলার বংশধররাও একই পথের যাত্রী। বৃটিশ শক্তির প্রশ্রয় দেওয়া। আর নিজেদের ভোগ কামনা চরিতার্থ করা। রাজ্যের একেক অংশ ইংরেজদের হাতে সমর্পণ। শুধু নিরাপত্তার আশায় নয়, উচ্ছৃংখল সম্ভোগের লালচে। তাঁদের আর একটি শখ ছিল ইমারৎ গড়া। তাও বিলাসিতা আর অপব্যয়ের অন্য দিক।

সর্বসমেত সেই একই অধোগামী ধারা। তার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ওয়াজিদ আলী শাহ্। এ বংশের দশম নবাব।

তবে একমাত্র তাঁরই শিল্পীসত্তা আছে। এত প্রজন্মের মধ্যে তিনিই কলাকার ও সাহিত্যিক। একাধারে গায়ক-বাদক-গীত-রচনাকার-সঙ্গীত-তাত্ত্বিক এবং কবি-লেখক। এই দুশ বছরেরও বেশি কালে, বংশের অন্য সকলে কেবল নবাব। আর কোন পরিচয় তাঁরা রেখে যেতে পারেন নি ওয়াজিদের মতন।

ওয়াজিদ আলীর পিতা আমজাদ আলী কি? তাঁর তো পাঁচ বছরের নবাবী জীবন। তার বেশীর ভাগই কেটে যায় হারেমে। বেগমদের সঙ্গলাভে। আর, তিনি একটি মকবারা তৈরি করেছিলেন। অবশ্য নিজেরই সমাধির জন্যে। সে কবরখানার বহিরঙ্গে কারুকার্য কিছু নেই বটে। কিন্তু তার অভাব পূরণ হয়েছে অভ্যন্তরে। প্রচুর খরচে খচিত সেসব অলংকরণ। কবরস্থানে সে কি ধনরত্নের আড়ম্বর আমজাদ আলী করেছিলেন! তার সমস্ত দামী জিনিস বিদ্রোহীদের হাতে পড়েছিল '৫৭ সালে। বিদ্রোহের প্রথম দিকে মকবারা বিদ্রোহীদের দখলে ছিল। তারপর চলে যায় ইংরেজদের অধিকারে। তখন মকবাবার ব্যবহার হত খৃষ্টানদের গীর্জা হিসেবে।

আমজাদ আলী আরেকটি ইমারৎ বানিয়েছিলেন। তার নাম বেগম কোঠি। বেগম মালিকা তাহাদের জন্যে ১৮৪৪ সালে তৈরি। এখানেই ছিল পঞ্চম নবাব সাদৎ আলী খাঁর প্রাসাদ, ৪০ বছর আগে।

আমজাদ আলীর এই বিলাস-ভবনও মহাবিদ্রোহের আগুনে ঝলসে উঠেছিল। বিদ্রোহীদের একটি শক্ত ঘাঁটি তখন বেগম কোঠি। প্রায় পাঁচ হাজার সেপাই এর চত্বরে আশ্রয় নিয়েছিল। আর ইংরেজ সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে পড়ে বেগম কোঠি। বিদ্রোহীরাও তেমনি অনর্গল অগ্নিবৃষ্টি করেছিল। কোঠির দরজা জানলায় লুকানো সব ছিদ্র থেকে গর্জে উঠেছিল তাদের বন্দুক। বৃটিশ বাহিনী শেষ পর্যন্ত দখল করে নেয় বটে। কিন্তু তার আগে দারুণ লড়াই হয়ে যায় তার বারান্দায় বারান্দায়, ঘরে ঘরে। মালিকা আহাদ বেগমও তখন বেঁচে। আর সেই কোঠিতেই ছিলেন। এত দ্রুত ইংরেজ সৈন্যরা তাঁর কামরায় ঢুকে পড়ে যে, অল্পের জন্যে তিনি এড়িয়ে যান বন্দীত্ব। কোন রকমে বেগম পালাতে পেরেছিলেন। কিন্তু ধরা পড়ে যায় তাঁর পরিচারিকারা।

পরে ইংরেজ আমলে সেই বেগম কোঠিতেই হয় জেনারেল পোস্ট অফিস।

আমজাদ আলীর মাত্র পাঁচ বছরের রাজত্ব। তারই মধ্যে এত বিশৃঙ্খলা আর অব্যবস্থা দেখা দেয় যে, তাঁকে সাবধান করে দেন বৃটিশ রেসিডেণ্ট। এমন কি, নবাবকে ভয়ও দেখানো হয়। প্রশাসনিক উন্নতি না করতে পারলে হারাতে হবে অযোধ্যার মসনদ! কিন্তু হঠাৎ জীবন হারিয়ে আমজাদ আলী শাহ্ সব দায়-দায়িত্ব চুকিয়ে গেলেন। ১৮৪৭ সালে, ৪৮ বছর বয়সে।

তাঁর পিতা মহম্মদ আলী শাহ্ অষ্টম নবাব। তাঁর কিছু যোগ্যতা ছিল বটে। কিন্তু সিংহাসন পান বৃদ্ধ বয়সে, ৬৩ বছরে। রাজ্য শাসনে শৃঙ্খলার অভাব আর নিম্নগতি তাঁর আগের আমল থেকেই চলে আসছিল। মহম্মদ আলীর সাধ ছিল সে পতন রোধ করবার। কিন্তু সেই বয়সে আর পাঁচ বছর আয়ুতে তা সাধ্য ছিল না। তবে অন্তিম কাল বিবেচনায় নির্মাণ করলেন নিজের সমাধি ভবনটি। প্রভূত অর্থব্যয়ে তৈরি সেই হুসেনাবাদ ইমামবাড়া। প্রকাণ্ড তোরণ পার হয়ে তার কবরস্থান। সেখানেও দৌলতের জাঁকজমক। শবদেহ কি বহুমূল্য আচ্ছাদনে ভূষিত থাকবে তারও বন্দোবস্ত নবাবের নিজেরই করা। ইমামবাড়া যেমন সুরম্য, তেমনি তার মধ্যে জেলেখানা। এই অলংকৃত স্থানটিতেও মহম্মদ আলী প্রচুর খরচ করেছেন। তাঁর ও জননীর সমাধি ভারি, সাচ্চা কপোর রেলিং ঘেরা। কাছেই নবাবের রৌপ্য সিংহাসন। দামী দামী ক'টি তাজিয়া। আর দু খণ্ড কুরআন।

ইমামবাড়া রক্ষণের জন্যে মহম্মদ আলী কয়েক লক্ষ টাকা রেখে যান। তা গচ্ছিত থাকে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কম্প্যানীতে, তাদেরই অছিগিরিতে।

মহম্মদ আলীর আগেকার নবাব নাসিরুদ্দীন হায়দার। এই নবাব কুলে আর সবাইকে হার মানিয়েছেন। এমন একটি বিকৃত-চরিত্র আর বিলাস-ব্যসন-মত্ততা দুর্লভ দর্শন। ডবলিউ নাইটেনের Private Life of an Eastern king বইয়ে নাসিরুদ্দীনের পরিচয় খানিকটা প্রকাশ পেয়েছে।

তাঁর পিতা গাজীউদ্দিন দশ কোটি টাকা মজুত রেখে যান রাজকোষে। তার ন' কোটি ত্রিশ লক্ষ নাসিরুদ্দীন নিঃশেষ করে দেন। তাও মাত্র দশটি বছরের নবাবীতে। অর্থাৎ বার্ষিক কোটি খানেক তন্খা উড্ডীয়মান। তাঁর মৃত্যু ঘটে আকস্মিক আর অস্বাভাবিক ভাবে। যদি আরও ক' বছর নবাব বাঁচতেন, রাজকোষ দেউলে হয়ে প্রজাদের কি দুর্গতি ঘটত, খোদারই মালুম।

একমুখে কহন না যায় এই সপ্তম নবাবের বহুমুখী গুণাবলী। তাঁর হালচালের একটু বিবরণ ওয়াকিবহাল মহল দিয়েছেন। তজ্জব বনে যেতে হয় তা শুনে—'নারী সংসর্গে থেকে নাসিরুদ্দিন হায়দরের মধ্যে 'জেনানাপন' (মেয়েলীপনা) দেখা দিল; মেয়েদের পোশাক পরতেন, মেয়েদের মতো কথা বলতেন। জেনানা স্বভাবের সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস মিলিত হল, জাত হল এক আশ্চর্য ফলশ্রুতি। মাতৃদেবী-প্রচলিত বারো ইমামের সেই নকল বিবি ('অদ্ভুতিয়া') ও ইমামদের জন্মোৎসব অধিকতর প্রশ্রয় পেল। এমন কি ইমামদের জন্ম-সমারোহে নাসিরুদ্দিন হায়দর স্বয়ং গর্ভবতী নারী সেজে প্রসূতি গৃহে গিয়ে বসতেন। চেহারায়, হাবে-ভাবে প্রসব পীড়া ফুটিয়ে তুলতেন এবং অবশেষে একটি কাল্পনিক শিশুর জন্মও দিতেন! অপিচ বাস্তবে

যেমন, ঠিক সেইভাবেই কাল্পনিক শিশুর 'জন্ম ছঠী-স্নান আদি অনুষ্ঠিত হত। ক্রমে এই উৎসব এত বড় হয়ে গেল, বাদশাহ আর কোন কাযে ফুরসৎই পেতেন না। রাজ্যের দিকে কে দৃষ্টি দেয়।'

(পুরনো লখনউ, পৃঃ ৪৯)।

যেমন অদ্ভুত রাজা, তেমনি অপদার্থ মন্ত্রীরা। তাঁদের যোগ্যতা আর সততারও বালাই নেই। কেবল নিজের নিজের কাজ হাসিল করার দিকেই নজর। রাজ্যশাসন কিংবা দেখাশোনার দায়িত্ব আর কার! আউধের অবস্থা শোচনীয় দাঁড়াল।

অনেক চেষ্টা করলেন বৃটিশ রেসিডেণ্ট। কিন্তু নবাবকে শোধরাতে পারলেন না। স্বভাব বদলানো যায় কি? তাঁকে রাজার কর্তব্য করাতে অপারগ হলেন ইংরেজরা।

নবাব আবার সাহেবদের সঙ্গ বেশি পছন্দ করতেন। অনেক সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত করে দিতেন তাঁদের জন্যে। ইউরোপীয় রূপোপজীবিনীদেরও দস্তুর মত কদর করতে জানতেন। মেমসাহেবদের জন্যে খাস জায়গা ছিল তাঁর হারেমে। বিলিতি যৌবনী পণ্যাদের জন্যেই তৈরি তাঁর 'বিলাইতি বাগ।'

এই সঙ্গে তাঁর হারেমের কথাটাও বলে রাখা যায়। নবাব থাকতেন মেয়েলী সাজে। জেনানার মতন হাব ভাব করতেন। বারো ইমামের সেই নকল বিবির ব্যাপার, 'জন্মছঠী স্নান' ইত্যাদিও হত বটে। তবে হ্যাঁ, নবাবোচিত পৌরুষও নাসিরুদ্দীনের ছিল বৈকি। শুধু ওই বিলাইতি বাগের বিদেশিনী জওয়ানীরা নয়। নবাবের অন্য বেগমরা ছিলেন বিশ জনেরও বেশি। তাঁদের জন্যে তাঁর বাদশাবাগের হারেম। সেইসব চাঁদমুখদের আড়ালে রাখবার জন্যে তার চারদিক উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। মাঝখানে চমৎকার কারুকার্যের স্তম্ভ। তার উপর বিরাট 'হল'-ঘরের ছাদ। আর নীচে সাজানো বাগিচার মধ্যে সুগন্ধী গোলাপ জলের হ্রদ। তার ধারে ধারে নানা রঙের ফুলের কেয়ারি।

বাদশাবাগের এই হারেমেই বাদশার দিনরাতের অনেকখানি কাটত।

নাসিরুদ্দীনের এই প্রমোদ ভবনও জড়িয়ে পড়ে সিপাহী বিদ্রোহে। বাদশাবাগ বিদ্রোহীরা আগে দখল করে। বাগের পিছন দিক থেকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ চালায় তারা। সে আক্রমণে নদী পারাপারের ইংরেজ সৈন্যরা বিস্তর ঘায়েল হয়। শেষে কিন্তু ইংরেজদের হাতে আসে বাদশাবাগ। তখন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তৈরি হয় তাদের গোলন্দাজ ঘাঁটি। সেসব নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর ২০ বছর পরের কথা।

'জেনানাপন' নবাবের আরেক অদ্ভুত মতিগতি। দেশী বিলাতী নারী সংসর্গেই দিন কাটাতেন বটে। অথচ, এমন স্ত্রৈণ স্বভাব সত্ত্বেও জেনানাদের প্রতিই হতেন নৃশংস। সামান্য দোষে নারীদের ভয়ংকর শাস্তির হুকুম দিতেন। একই পাপে পুরুষের তুলনায় সাংঘাতিক সাজা পেত জেনানারা। দেওয়ালের মধ্যে জীবন্ত গোর। কিংবা স্তন কর্তন করে দেওয়া হত।

কত রকমেই যে বিকৃত চরিত্র নাসিরুদ্দীন। দিল্লীর বাদশার রূপগুণবতী কন্যা তাঁর বেগম ছিলেন। কিন্তু নবাব প্রধানা বেগম করলেন এক ধাত্রীকে। তাঁর উপাধি হল মালিক জমানী।

প্রশাসনের কাজ নবাব বিশেষ কিছুই দেখতেন না। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি করেন নানা রকম। ইউরোপীয়দের অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দিতেন। এজন্যে বিরক্ত, উত্যক্ত হয়ে ওঠেন তাঁর মন্ত্রী আর পরামর্শদাতারাও।

এমনি সমস্ত ব্যাপার মিলে অবস্থা জটিল হয়ে উঠল। নানারকম স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত। ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত চলতে লাগল দরবারে, প্রাসাদে। শেষপর্যন্ত চরম মূল্য আদায় হয়ে গেল!

বিখ্যাত ছত্তর মঞ্জিল তৈরি শুরু হয়েছিল আগের আমলে। নাসিরুদ্দীনের সময় শেষ হয়। বেগমদের জন্যে সুরম্য, বহুমূল্য ছোট আর বড় ছত্তর মঞ্জিল। তাদের শীর্ষে সোনালী ছত্রের শোভা। তাই এই নাম।

বড় ছত্তর মঞ্জিল ত্রিতল। তার গর্ভগৃহে বিরাট তয়খানা। তার প্রাকারের বাইরেই গোমতী নদীর সিঞ্চন। ভূতলের কক্ষগুলি তাই শীতল, বেগমদের গ্রীষ্মকালীন আরামের জন্যে। তয়খানা তৈরি সেই উদ্দেশ্যে।

ছোট ছত্তর মঞ্জিলের দুদিকে দুটি সুদৃশ্য ভবন। গুলিস্তাঁ-ই-আরাম আর দর্শন বিলাস।

তার একটিতেই নাসিরুদ্দীনের নবাবী জীবননাট্যে চির যবনিকা পড়েছিল। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শোচনীয় পরিণতি।

সেদিন গ্রীষ্মের এক দুপুরবেলা।

গুলিস্তাঁ-ই-আরামে আয়েশ করছিলেন নাসিরুদ্দীন। হাস্য পরিহাস, সঙ্গ, পানীয়ের সঙ্গে রূপের খাস লাট বসেছে। নিরালা এক কামরায় তখন খুবসুরত জেনানারা নবাবকে ঘিরে।

এক সুন্দরী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। চাঁপার কলি আঙুলগুলিতে ধরা একপাত্র শরবত। মধুর কটাক্ষে সেটি এগিয়ে দিলেন নবাবের দিকে।

নাসিরুদ্দীন মিষ্টি হাতের মিষ্টি পানীয় হাসিমুখে গলায় ঢাললেন। তারপরেই ঢলে পড়লেন মেঝের কার্পেটে।

গুলিস্তাঁ-ই-আরামে নাসিরুদ্দীনের নিষ্প্রাণ দেহ ভূলুণ্ঠিত হল বটে। কিন্তু নাটকের কালো পট তখনো পড়ে নি।

তাই আর একটি নবাবী দৃশ্য শুরু হল লাল বারাদরিতে। তার প্রধান ভূমিকা নিলেন বাদশা বেগম। নাসিরের বিমাতা তিনি।

আপন পুত্র মুন্না জানের নামে বাদশা বেগম তখনই মসনদ দাবি করলেন। শুধু মৌখিক দাবি নয়। তিনি 'তাজপোষী' অর্থাৎ মুকুট ধারণের দরবার বসালেন লাল বারাদরিতে। এখানেই বংশের অভিষেক অনুষ্ঠানের প্রথা। সিংহাসনও এখানে।

বাদশা বেগমকে কোন উজীর এবিষয়ে মন্ত্রণা দেন। সাহায্যও করেন আড়াল থেকে। তাজ মাথায় দেবার উপযুক্ত করে দরবার সাজানো হল। এলেন বাদশা বেগমের দরবারীরা। নাচিয়ে বাজিয়ের দলও হাজির।

বাদশা বেগম সকলের সামনে মুন্নাজানকে মসনদে বসিয়ে দিলেন। নাচগান শুরু হয়ে গেল লাল বারাদরিতে।

মুন্নাজান কিন্তু অবৈধ সন্তান। গাজীউদ্দীন কিংবা নাসিরুদ্দীন কেউই তাকে

মানতেন না নবাব বংশের বলে। কারণ বাদশা বেগম গাজীউদ্দীনকে নিকা করবার আগে মুন্নাজানের জন্ম।

এখন নাসিরুদ্দীনের হত্যার সুযোগে বাদশা বেগম তাকেই নবাব করেতে চাইলেন। দরবারের কজন প্রভাবশালী মন্ত্রী অবশ্য ছিলেন তাঁর সঙ্গে।

কিন্তু রেসিডেণ্ট আপত্তি করলেন। বোঝাতে চাইলেন বাদশা বেগমকে। কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

কিন্তু গ্রাহ্য করলেন না বাদশা বেগম আর তাঁর দলবল।

তখন রেসিডেণ্ট কর্নেল লো তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নিলেন। সারবন্দী কামান দাঁড় করিয়ে দিলেন দরবার কক্ষের সামনেই।

'…হাতে ঘড়ি নিয়ে তিনি বসলেনঃ 'দশ মিনিট সময় দিচ্ছি; এর মধ্যে মুন্নাজান যদি সিংহাসন থেকে না নামে, তাহলে জোর খাটাতেই হবে।' তবু কেউ পরোয়া করল না। রেসিডেণ্ট বলে বসলেনঃ আর পাঁচ মিনিট বাকি আছে… আর এক মিনিটও নেই, ভেবে দেখুন…।'

এই সাবধান বাণীতেও কেউ কান দিল না। হঠাৎ গুড়ু গুড়ু শব্দে কামান আক্রমণ শুরু হল। মুহূর্তের মধ্যে পড়ে গেল ত্রিশ চল্লিশ জন। দরবারের সভাসদরা ঘাবড়ে গিয়ে পড়ি-কি-মরি করে পালাল। একটা নাচিয়ে-দল মুজরা করছিল, তাদেরও কয়েকজন জখম হল। কাঁচের জিনিসপত্র ভেঙে পড়ল ঝন্‌ঝন্‌ করে। কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুগত বীর যোদ্ধা মাটি কামড়ে লড়াই করছিল। একে একে তারাও নিহত হল। তখন মুন্নাজানও সিংহাসন থেকে নেমে প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল। কিন্তু পারল না, ধরা পড়ে গেল। মুন্নাজান ও বেগম সাহেবা দুজনকেই গ্রেফতার করল ইংরেজরা; সেই সঙ্গে সিংহাসনে বসিয়ে দিলে নাসীরউদ্দৌলাকে।'

(পুরনো লখনউ, পৃঃ ৫১)।

নাসিরুদ্দৌলা হলেন আগেকার নবাব সাদৎ আলী খাঁর পুত্র। মহম্মদ আলী শাহ্‌ নাম নিয়ে নাসীরুদ্দৌলা অওধের রাজা হলেন। তিনিই আমজাদ আলীর পিতা আর ওয়াজেদের পিতামহ। আগেই বলা হয়েছে সেই মহম্মদ আলীর কথা।

নাসিরুদ্দীনকে যে গুলিস্তা-ই-আরামে হত্যা করা হয় সেই ছোট ছত্তর মঞ্জিলের আরো অধ্যায় আছে। আরো প্রায় বিশ বছর সে মঞ্জিল মুখর ছিল গোলাপী ঠোঁটের হাসি আর কলধ্বনিতে। মহম্মদ আলী শাহ্‌ থেকে ওয়াজিদ আলীর আমল পর্যন্ত। তারপর মহা-বিদ্রোহের কামান গর্জনে সেসব স্তব্ধ হয়ে যায়। স্বর্ণবর্ণ ছত্রের ছত্তর মঞ্জিল তখন বিদ্রোহীদের এক জোরালো ঘাঁটি।

আরো পরে, বৃটিশ পর্বের ছত্তর মঞ্জিলে দেখা গেল—ইউনাইটেড সার্ভিসেস ক্লাব!

নাসিরুদ্দীনের পিতা গাজীউদ্দীন হায়দর ১৮১৪ সালে মসনদ পান। ষষ্ঠ নবাব তিনি। তাঁর সময়ে লক্ষ্ণৌ দরবার বিখ্যাত হয়ে ওঠে ঐশ্বর্য আড়ম্বরের জন্যে। ইংরেজদের আরো সুবিধা দিয়ে গাজীউদ্দীন 'আউধের রাজা' খেতাব পেয়েছিলেন। অবধের নবাব-উজীর বংশে তিনিই প্রথম 'রাজা'। কিন্তু নামে মাত্র। রাজ্যে বৃটিশ ক্ষমতা এত বাড়তে থাকে যে, তাঁর রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রায় শূন্য দাঁড়ায়।

সেদিকে লক্ষ্যও ছিল না গাজীউদ্দীনের। তিনি 'বাদশাহ্ হয়েই ডুবে গিয়েছিলেন আয়েশে-বিলাসে।'

('পুরনো লখনউ, পৃঃ ৪৬)।

বৃটিশের অমতে কোন বড় সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারেন না। রাজ্যের নানা জায়গায় ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন। নবাবের এক্তিয়ারে শুধু বিলাস ব্যসন আর ইমারৎ তৈরিতে।

গাজীউদ্দীনের প্রধান কীর্তি 'শাহনজফ্'। নিজেরই 'শেষের সেদিন ভয়'করে'র জন্যে তৈরি করা সুরম্য দুর্মূল্য সমাধি ভবন। আরব দেশের নজফ্ পাহাড়ে আছে হজরৎ মহম্মদ জামাতা আলীর সমাধি। সেই অনুসারে লক্ষ্ণৌর এই বিরাট, শুভ্র গম্বুজ-শীর্ষ ভবনের নাম। অওধের নবাব বংশ শিয়া এবং সৈয়দ। মহম্মদের পরে আলী তাঁদের সর্বমান্য। সেজন্যে নজফ্ পাহাড়ের সমাধির মতন গাজীউদ্দীনের শাহ্ নজফ্ গোমতীর ধারে। কি অজস্র খরচ যে এজন্যে তিনি করেছিলেন তার হিসাব জানা যায় নি। কিন্তু এ মকবারার ব্যয় বরাদ্দ বাবদ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে নবাব জমা রাখেন এক কোটি টাকা। পুত্র নাসিরুদ্দীনকে ভরসা করে এই টাকা তিনি দিতে পারেন নি।

এই চমৎকার বাগিচায় সাজানো তাঁর শাহ্ নজফ্কেও ছুঁয়েছিল মহা বিদ্রোহের আগুন। প্রথমে বিদ্রোহীদের দখলে থাকে। এক প্রচণ্ড যুদ্ধে ক্যাপ্টেন উল্স্লীর সেনাদের হাতে চলে যায় শাহ্ নজফ্।

চৌকোনা কেকরওয়ালী কোঠিও গাজীউদ্দীনের তৈরি। ছত্তর মঞ্জিলের প্রাসাদ দুটিও শুরু করেন তিনি। কিন্তু শেষ হয় নি।

তাঁর বাস ছিল ফরহাৎ বখ্সে। মৃত্যুও এই প্রাসাদে (১৮২৭)। শাহ্ মজফের প্রধান প্রকোষ্ঠে নবাবের কবরস্থান। একপাশে তাঁর প্রিয় বেগম মুবারক মহল। অন্যদিকে আরেক বেগমের সমাধি। এই হল নবাবী এলাকার চৌহদ্দি।

গাজীউদ্দীনকে নিয়ে মজার গল্প আছে। তাঁকে আর ওস্তাদ হায়দর খাঁকে নিয়ে। নবাবের মাথায় তো ছিট ছিল একটুখানি। কিন্তু হায়দর খাঁ দস্তুরমত ছিট-ওয়ালা। লক্ষ্ণৌর মস্ত বড় নামী ওস্তাদ তিনি। কিন্তু নিজের সুরের জগতেই হরদম মশগুল থাকতেন। দুনিয়ার আর সব ব্যাপারেই একেবারে বেহুঁশ। পরোয়া খাতির করতেন না দুনিয়ার কাউকে। নবাবকে পর্যন্ত চিনতেন না হায়দর খাঁ। আর স্বভাবও তেমনি খামখেয়ালী। তাই তাঁর নাম হয়ে যায় 'সিড়ে হয়দরী খাঁ' অর্থাৎ ছিটিয়াল, বা ছিটগ্রস্ত।

নবাব গাজীউদ্দীনকে নিয়ে তাঁর গল্পটা একেবারে বানানো নয়। লক্ষ্ণৌর পরের যুগের বিখ্যাত শরদী ছিলেন কোকব খাঁ। আবদুল হালীম 'শরর'কে তিনি এটি জানান। হালীম 'শরর' লিখিত বই থেকে তার এইরকম বিবরণ পাওয়া যায়।

নবাব গাজীউদ্দীনের সময় লক্ষ্ণৌর এক বড় গাওয়াইয়া ছিলেন হায়দরী খাঁ। গোলাগঞ্জে তিনি বাস করতেন। থাকতেন আপন খেয়ালে। আর নিজের মেজাজ মর্জি না হলে গান শোনাতেন না।

নবাব তাঁর নাম শুনেছিলেন বটে। কিন্তু গান শোনেন নি। খুব ইচ্ছে থাকলেও

সে সুযোগ হয়নি গাজীউদ্দীনের।

একদিন নবাব বেড়াতে বেরিয়েছেন। পাল্‌কীতে চলেছেন গোমতীর ধার দিয়ে। হঠাৎ তাঁর লোকেরা দেখে, রুমী দরওয়াজার নীচে দিয়ে হায়দরী খাঁ যাচ্ছেন। নবাবকে তাঁরা জানালে, 'হুজুর, উনিই হায়দরী খাঁ!'

তখনি গাজীউদ্দীন তাঁকে আনবার জন্যে ফরমায়েশ করলেন। তারপর ওস্তাদজী সামনে আসতে, বললেন, 'আরে মিঞা, হায়দরী খাঁ; আমায় আপনার গান শোনাবেন না?'

তিনি জবাব দিলেন, 'কেন শোনাবো না? কিন্তু আপনার বাড়ি কোথায়? আমি চিনি না তো?'

নবাব হেসে উঠে বললেন, 'আচ্ছা, আমার সঙ্গে চলো। আমি নিজেই তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাব।'

'বহুৎ খুব' বলে তাঁর সঙ্গ নিলেন ওস্তাদজী। আর কোন সম্ভাষণ কিংবা শিষ্টাচার জানালেন না।

তারপর ছত্তর মঞ্জিলে ঢোকবার সময় বলে উঠলেন, 'আমি তো যাচ্ছি। কিন্তু পুরী আর মালাই যদি আমায় খাওয়ান, তবেই গান গাইব।'

গাজীউদ্দীন কথা দিলেন। তখন মহলে এসে গান শুরু করলেন হায়দরী খাঁ।

তাঁর গান শুনে নবাবের ভারী ভাল লাগল। তিনি তন্ময় হয়ে গান শুনতে লাগলেন, আল্‌বোলার নল মুখে রেখে। কস্তুরি তামাকের খসবু ভুরভুর করে ছড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ গান থামিয়ে দিলেন হায়দরী খাঁ।

নবাব জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল? গান বন্ধ কেন?'

ওস্তাদজী বললেন, 'হুজুর আপনার নলে যে তামাক ভরা রয়েছে, তা বেশ সরেস্ মনে হচ্ছে। আপনি কোন্ দোকান থেকে তামাক কেনেন?'

নবাব এতক্ষণ হায়দরীকে বরদাস্ত করেছিলেন। কিন্তু নারাজ হলেন এবার।

তাঁর মোসাহেবরাও বললে, 'কিবলা-এ-আলম, এটা একেবারে পাগলা। আহম্মক। তখনো বুঝতেই পারেনি যে, কার সঙ্গে কথা কথা কইছে"

নবাব বললেন, 'ওকে অন্য কামরায় নিয়ে যাও। পুরী, মালাই, তামাক যেমন চায় খাইয়ে দাও।'

তখন হায়দরী খাঁকে ভাল করে পুরী আর মালাই খাওয়ানো হল। সেই তামাকও বেশ তারিয়ে তারিয়ে ওস্তাদনী টান দিলেন আল্‌বোলায়।

তারপর বললেন,'এক পো পুরী, আধ পো মালাই আর এক পয়সার চিনি আনিয়ে দাও। আমার বিবির কাছে পাঠাতে হবে।'

তাঁর কথা মাফিক পুরী, মালাই আর চিনি পাঠিয়ে দেওয়া হল তাঁর বিবিকে।

এ কামরায় যতক্ষণ এসব হচ্ছিল, নবাব পেয়ালা ভরে শরাব পান করছিলেন। খানিক পরেই জমে উঠল নেশা। তখন হায়দরী খাঁকে মনে পড়ল।

হুকুম দিলেন, 'ওস্তাদকো বুলাও।'

তাঁকে আনা হতেই বললেন, 'গান শুনাও।'

তারপর যেই ওস্তাদজী গান শুরু করেছেন, থামিয়ে দিয়ে হুঁশিয়ারি জানালেন, 'হায়দারী খাঁ, এবার শুনে রাখো আমার কথা। তুমি যদি গানে কেবল আমাকে খুশিই করতে থাকো, আর কাঁদাতে না পারো, তাহলে তোমায় গোমতীর জলে ডুবিয়ে দেব। মনে রেখো।'

এতক্ষণে হায়দরী খাঁর আক্কেল হল। ইনিই তাহলে বাদশাহ্। তোবা তোবা।

বললেন, 'হুজুর আল্লাহ্ মালিক। আপনার হুকুম মাফিকই গানা হবে।'

তারপর মন প্রাণ ঢেলে দিয়েই গাইলেন হায়দরী খাঁ। গানও তেমনি উৎরে গেল। আর ইন্দ্রজালের মতন তার কাজ হল গাজীউদ্দীনের ওপর। শরাবের পেয়ালা হাতে তিনি নিথর হয়ে শুনছিলেন। আর কাঁদছিলেন সুরের টানে টানে, মোচড়ে মোচড়ে।

গান শেষ হতে বাদশাহ্ খুশি হয়ে ফরমায়েশ করলেন, 'হায়দরী খাঁ, বলো তুমি কি চাও?'

ওস্তাদজী বললেন, 'হুজুর, মালিক, আমি যা চাইব, দেবেন তো?'

গাজীউদ্দীন বললেন, 'আলবৎ।'

হায়দরী খাঁ এখন বড় হুঁশিয়ার। তিন সত্যি করিয়ে নিলেন নবাবকে।

তারপর নিবেদন করলেন, 'হুজুর আল্লাহ্, আমি এই চাই যে আমাকে আপনি কখনও ডাকবেন না।'

শুনে নবাবের এত পেয়ালার শরাবী নেশা ছুটে যায় আর কি! তিনি তাজ্জব বনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন? কেন?'

ওস্তাদজী সাফ জবাব দিলেন, 'আপনার আর কি! আপনি মরলে আরেকজন হায়দর তখন বাদশাহ্ বনে যাবেন। কিন্তু আমাকে মেরে ফেললে আর একজন হায়দরী খাঁ আর জন্মাবে না!'

এমন জবাব পেয়ে বেজায় ব্যাজার হলেন গাজীউদ্দীন। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

আর হায়দরী খাঁও জান নিয়ে পালালেন সেই সুযোগে। সোজা নিজের বাড়িতে হাজির হয়ে গেলেন।

(পুরনো লখনউ, পৃঃ ১৮৪-৮৫)

সেই গাজীউদ্দীনের বাবা সাদৎ আলী এ বংশের পঞ্চম নবাব। তিনি সিংহাসন পান ১৭৯৮ সালে। কিন্তু নবাবী তাঁর বরাতে প্রথমেই জোটেনি। তখ্‌ৎ দখল করেছিলেন উজির আলী। চতুর্থ নবাব সেই আসফুদ্দৌলা, বড় ইমামবাড়া যাঁর তৈরি। উজির আলী তাঁর পুত্র পরিচয়ে মসনদে বসেছিলেন। আর আসফুদ্দৌলার বৈমাত্র ভাই সাদৎ আলী তখন থাকতেন কাশীতে। আগেও তিনি রাজ্যের বাইরে বাইরেই কাটাতেন। কখনো কলকাতায়। বেশির ভাগই বারাণসীতে।

ওদিকে উজির আলীর লক্ষ্ণৌতে নবাবী চলেছে মাস চারেক। এমন সময় রটে গেল, উজির আলী তো আসফুদ্দৌলার ছেলেই নন। 'কারণ, অনেকের ধারণা, আসফ-উদ্দৌলা জন্ম থেকেই নপুংসক!'

(পুরনো লখনউ, পৃঃ ৩৩)

ইংরেজ পক্ষ তখন কাশী থেকে সাদৎ আলীকে নিয়ে এলেন। বিবিয়াপুর প্রাসাদে দরবার করলেন গভর্নর জেনারেল। একই আসরে দুটি নবাবী দৃশ্য। উজির আলীকে সিংহাসন থেকে নামানো আর সাদৎ আলীকে সেখানে বসানো হল। দুয়েরই কর্তা বৃটিশরা। তার জের চলল আরেকটু। উজীর আলীকে গ্রেপ্তার করে চালান করা হল বেনারসে। সেখান থেকে চুনার দুর্গে। উজীর আলী সেখানেই আমৃত্যু বন্দী রইলেন।

এদিকে সাদৎ আলী হলেন আউধের নবাব। তাঁর রাজত্ব পাওয়া তো বৃটিশ দাক্ষিণ্যে। তাই ভালভাবেই কৃতজ্ঞতা জানালেন। ইংরেজদের চাপে ছেড়ে দিলেন প্রায় অর্ধেক রাজ্য। তাদের ক্রমাগত দাবির হাত থেকে বাঁচলেন। নবাবী ভোগ করতে লাগলেন নিশ্চিন্ত আরামে। কিন্তু এত করেও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ভাল হয় নি ইস্টইণ্ডিয়া কম্পানীর!

তবে সাদৎ আলীর কৃপণ স্বভাব। এ নবাব বংশে এমন কঞ্জুষ আর কাউকে দেখা যায়নি। ব্যয়ের চেয়ে তাঁর সঞ্চয়েরই নেশা। এত কোটি টাকা তিনি রাজকোষে রেখে যান যে পরের নবাব গাজীউদ্দীন বিস্তর উড়িয়েও অত থেকে যায় নাসিরুদ্দীনের বরাতে।

কৃপণ হলেও বাস্তু গঠনের শখ সাদৎ আলীর ছিল। লক্ষ্ণৌর আকার তাঁর আমলেই অনেকটা স্থির হয়ে যায়।

লাল বারাদরিও তাঁর তৈরি। লাল রঙের বারো দরজাওয়ালা এই ভবন। রাজ-সংবর্ধনা ইত্যাদির জন্যেই তিনি করেন। কিন্তু ব্যবহার হয়ে থাকে নবাবদের অভিষেকের জন্যেও।

ক্লড মার্টিন চমৎকার একটি বাড়ি করেছিলেন। সেটি সাদৎ আলী কিনে নেন ৫০ হাজার টাকায়। নাম দেন তার ফরহৎ বখ্‌স্ বা আনন্দ মহল। তার আশপাশে আরো সৌধ গড়ে নবাব ওখানেই বাস করতে থাকেন। পরে নবাবদের রাজকীয় আবাস দাঁড়ায় ফরহৎ বখ্‌স্। চারদিকে বেগমদের, সন্তানদের আর রাজপুরুষদের জন্যে বাড়ি করা হয়।

ঐতিহাসিক পালা বদলের পর ফরহৎ বখ্‌সে হল ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবের লাইব্রেরি।

গোমতী নদীর ওপরে যে লোহার পুল, ওটিও সাদৎ আলীর ইংলণ্ড থেকে অনেক দামে কেনা। কিন্তু সেতুটি ব্যবহারযোগ্য হল ৪০ বছর পরে। নবাব আমজাদ আলীর আমলে।

মহা বিদ্রোহের সময় লক্ষ্ণৌর এক ঐতিহাসিক ঘাঁটি রেসিডেন্সী। আউধ রাজ্যে বৃটিশ রেসিডেণ্টের সরকারী আবাস। সেটিও সাদৎ খাঁর তৈরি (১৮০০ সাল)। এই ভবনের একতলের তয়খানাও বিখ্যাত। '৫৭র গ্রীষ্মে সেই যুদ্ধ বিগ্রহে রেসিডেন্সী অবরোধ করে রাখে বিদ্রোহীরা। তখন তয়খানার শীতল আশ্রয়ে অনেক ইংরেজ নারী আর শিশুদের প্রাণ বাঁচে।

রমণীয় মোতি মহল প্রাসাদও সাদাৎ আলীর গড়া। তার গম্বুজটির বিশাল মুক্তার আকার। তাই এই নামকরণ। দক্ষিণ দিক থেকে মোতি মহলের প্রবেশ

পথ। তার তিন-তলা তোরণ। সেখানে নবাব বংশের প্রতীক চিহ্ন তিনটি মাছ। যেমন তাঁদের পুরনো মচ্ছি ভবনে।

মোতি মহল এলাকায় বিদ্রোহের চূড়ান্ত পর্যায় ঘনিয়ে এসেছিল। ইংরেজদের ভাগ্যচক্র তখন ঘুরতে থাকে দক্ষিণে বামে। এখানেই বৃটিশ সেনাদল বিদ্রোহীদের আক্রমণে বিপন্ন হয়ে ওঠে। তারপর সাহায্য করতে আসে নতুন বাহিনী। যুদ্ধের গতি বদলে যায়। তারই স্মারকলিপি আছে এখানে। নীল প্রাকারের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটি মর্মর ফলকের খোদাই ঃ এইস্থানের প্রায় বিশ গজ দূরে, মোতি মহলের পাশ দেয়াল বরাবর এগিয়ে, স্যর জেম্‌স্‌ আউটরাম এবং সার হেন্‌রি হ্যাভেলক ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭ তারিখে স্যর কলিন ক্যাম্বেলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

সেকালের লক্ষ্মৌর আরেকটি দ্রষ্টব্য প্রাসাদ দিল্‌খুশা। এটিও সাদাৎ আলীর তৈরি। মধ্যযুগীয় দুর্গ ধরনের এই চৌকোনা সৌধ। প্রথমে শিকারের আস্তানা হিসাবে নবাব করেন। পরে হয় বেগমদের একটি প্রিয় গ্রীষ্মাবাস। আবার বিদ্রোহের সময় দিল্‌ খুশাকে বিদ্রোহীদের দুর্গ-রূপে দেখা যায়। ইংরেজ সেনাপতি স্যর কলিন ক্যাম্বেল তা দখল করে নেন প্রচণ্ড যুদ্ধে। তাঁদের আরেক সেনানায়ক স্যর হ্যাভেলক এই বাগের শিবিরেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন (২৪ নভেম্বর, ১৮৫৭)।

সাদৎ আলীর আরেকটি প্রাসাদ হায়াৎ বখ্‌স্‌। তার দখল নিয়েও বিদ্রোহী আর ইংরেজ পক্ষে খণ্ডযুদ্ধ বেধেছিল। এখানেই আনা হয় আহত মেজর হডসনকে। সেই একতলায় কক্ষে তিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন। পরের ইংরেজ আমলে হায়াৎ বখ্‌স্‌ হল গভর্নমেন্ট্‌ হাউস!

খুরসাদ মঞ্জিল অর্থাৎ সূর্যের আলয়। এটিরও তৈরি শুরু সাদৎ আলীর আমলে। তবে গাজীউদ্দীনের সময় সম্পূর্ণ হয়েছিল। বিদ্রোহের রক্ত-রাঙা অধ্যায়ে একেবারে যুদ্ধক্ষেত্র দাঁড়ায় খুরসাদ মঞ্জিল। ইংরেজদের জয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। ফটকের বাঁদিকে ছোট স্তম্ভটিতে তারই স্মারকলিপি ঃ ১৭ই নভেম্বর, ১৮৫৭ এখানেই হ্যাভেলক, আউটরাম আর কলিন ক্যাম্বেল মিলিত হয়েছিলেন।

ইংরেজ আমলে একেবারেই পাল্টে যায় খুরসাদ মঞ্জিলের ভোল। লা মার্টিনীয়ার ট্রাস্ট্‌কে সরকার এ প্রাসাদ দান করে দেয়। তখন মঞ্জিলের নাম আর রূপ হয় লা মার্টিনীয়ার গার্লস্‌ স্কুল।

এত সব ইমারতে খরচ করেও সাদৎ আলী এক কোটি চল্লিশ লাখ টাকা নগদ রেখে যান।

তাঁর পুত্র গাজীউদ্দীনের তৈরি শাহ্‌ নজফ্‌ মক্‌বারা। সেখানেই কবরস্থ আছে সাদৎ আলীর মরদেহ। কাইসর বাগের উত্তর-পূর্ব দিকে।

সাদৎ আলীর আগেকার নবাব হলেন আসফুদ্দৌলা। তাঁরই বৈমাত্র ভাই।

আউধের চতুর্থ নবাব আসফুদ্দৌলা। লক্ষ্মৌর জাঁকজমক ঐশ্বর্য বিলাস সবই তাঁর সময় থেকে। ১৭৭৫ সালে তিনি মসনদ পান। তার পরই লক্ষ্মৌর বাড়-বাড়ন্ত। লক্ষ্মৌ দরবার আর নবাবী আমলের লক্ষ্মৌ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা আসফুদ্দৌলা। তার ইমারৎ গড়া, গঞ্জ মহল্লা স্থাপন এই সব বহিরঙ্গে তাঁর দানই সব চেয়ে বেশি। তখন থেকেই শাহী দিল্লীর ওপর টেক্কা দিতে থাকে লক্ষ্মৌ।

যেমন বিশাল তেমনি আশ্চর্য স্থাপত্য কারুর নিদর্শন তাঁর তৈরি বড় ইমামবাড়া, হুসেনাবাদ, ইমামবাড়া, রুমী দরওয়াজা। অলংকৃত, সাড়ম্বর নির্মাণ-শৈলীর তিনি ধারা পত্তন করেন লক্ষ্ণৌতে। আর নামকরণেরও রেওয়াজ। বড় বড় ইমারৎ নিয়ে দওলৎখানা প্রাসাদ চৌহদ্দি, বিবাইয়াপুর বা বিবিয়াপুর কোঠি মুসাবাগের সঙ্গে চৌক বা চক, সেতু, বাজার, কুয়া ইত্যাদি লক্ষ্ণৌর অনেক কিছুই আসফুদ্দৌলার আমলে তৈরি।

তাঁর আগেকার তিন নবাবের লক্ষ্ণৌতে নিজস্ব কোন কোঠিই ছিল না। তাঁদের ভাড়া বাড়ি ছিল মচ্ছিভবনে। সেসব তাঁদের কথা পরে আসবে।

আসফুদ্দৌলাই সদর দফতর প্রথম নিয়ে আসেন লক্ষ্ণৌতে। নতুন রাজধানীকে সুন্দর করে তোলাই তাঁর জীবনের প্রধান কাজ হয়ে ওঠে। সুবার রাজস্ব অনেকখানি খরচ হয়ে যায় সেই খাতে। কিন্তু লক্ষ্ণৌ দরবারে ধুমধাম যত বাড়ে, উত্তর ভারতের রাজনীতিতেও তত লোপ পায় আউধের ভূমিকা। রাজ্যের আয়তনও ছোট হতে থাকে।

আউধ সুবার আগেকার রাজধানী ছিল ফয়জাবাদ। নবাব হবার কিছুদিনের মধ্যেই সেখান থেকে আসফুদ্দৌলা লক্ষ্ণৌ চলে আসেন।

তাঁর ফয়জাবাদ ত্যাগের প্রধান কারণ, জননীর সঙ্গে কলহ।

শুজাউদ্দৌলা ও বেগম আম্মাৎ উজ্জহরার পুত্র তিনি। তাঁর জননী বহু বেগম নামেই ইতিহাস খ্যাতা। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের জন্যে বহু বেগমের আরো নাম থেকে যায় ইতিহাসে। লুণ্ঠন লিপ্সা ইত্যাদি দুষ্কৃতির জন্যে ওয়ারেন হেস্টিংসকে পরে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। বিলাতে চলে সেই ঐতিহাসিক বিচার পর্ব। তার মধ্যে অযোধ্যার বেগমের ধনরত্ন আত্মসাৎ করার অভিযোগও ছিল। সেই অযোধ্যার বেগমই শুজাউদ্দৌলার বিধবা পত্নী বহু বেগম। ওয়ারেন হেস্টিংসের চাপে অর্থসংগ্রহের উপলক্ষ্য হন আসফুদ্দৌলা। মাতা পুত্রের বিবাদ সেই সংক্রান্ত। (তার প্রায় দেড়শ বছর পরের কথা। বাংলার নাট্যমঞ্চে 'অযোধ্যার বেগম' নাটকটি বিখ্যাত হয়েছিল। অযোধ্যার তখনকার ঘটনা নিয়েই তার বিষয়। অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের সেই নাটকে স্টার থিয়েটারে বহু বেগমের ভূমিকায় দেখা দিতেন তারাসুন্দরী।)

নবাব শুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন বহু বেগম।

ফয়জাবাদেই তিনি বাস করতেন। চৌকের উত্তর পূর্বে প্রাচীর ঘেরা মোতি মহল প্রাসাদে। (সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ১৮১৬তে) তার কাছেই মসজিদ। সেটি পার হয়ে দক্ষিণেই ইমামবাড়া। আর সেনাবারিকের উত্তরে বেগমের পরামর্শ-দাতা দবার আলী খাঁর বিরাট বাগানবাড়ি। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় এ প্রাসাদেরও কথা উঠেছিল।...

শুজাউদ্দৌলা বেশি থাকতেন ফয়জাবাদে। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল শক্তি বৃদ্ধি, সৈন্যদলের উন্নতি।

কিন্তু আসফুদ্দৌলার স্বভাব ঠিক বিপরীত। তাঁর ওসব চিন্তার বালাই ছিল না। আর ইংরেজদের তখন ক্ষমতা আর অধিকার বাড়াবার দিকেই নজর। যেমন অন্যান্য রাজ্যে, তেমনি আউধেও।

নবাবের বিলাসিতার দিকে ঝোঁক কূট-বুদ্ধি বৃটিশের দৃষ্টি এড়াল না। ইংরেজরা নবাবকে পরামর্শ দিতে লাগলেন। আর তাতে কান দিতে লাগলেন আসফুদ্দৌলা।

'নবাব সাব, আপনি সৈন্যদের ব্যাপারে আর দুশ্চিন্তা করবেন না। ও ভার আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। আপনার যেসব নবাবী শখসাধ আছে তাই নিয়ে থাকুন।'

আসফুদ্দৌলা সেইসব নিয়েই রইলেন। দরবারী জাঁকজমক আর লক্ষ্ণৌর আড়ম্বর বাড়ানো আর নিজের বিলাস আরাম। সেজন্যে অর্থসংগ্রহ হল সৈন্যবাহিনী এক-রকম উঠিয়ে দিয়ে।

'কিছু সৈন্য খাস রেখে বাকি সবাইকে তিনি পত্রপাঠ বিদায় দিলেন। তারপর আকণ্ঠ ডুবে গেলেন আয়েশে বিলাসে। যারা তাঁকে অপদস্থ করল, তারাই হল তাঁর আজ্ঞাকারী মিত্র, তাদেরই ইশারায় তিনি চলতেন; তাদের পরামর্শ ছাড়া আর কারও কথায় তিনি কর্ণপাত করতেন না।...তারপর যখন মা 'বহু বেগম সাহিবা'কে উত্যক্ত করা ও তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্যে সাহায্য চাইলেন, ইংরেজ খুব উদার হয়েই তাঁকে দিল নৈতিক সহায়তা, সমর্থন জানাল।'

(পুরানো লখনউ, পৃঃ ২৮)

আসফুদ্দৌলার উপসংহার করতে হয় তাঁর মুসাবাগের কথায়। হুসেনাবাদের এক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে সুরম্য বাগান হিসেবে এটি তার পরিকল্পনা। পরের নবাব সাদৎ আলীর এখানে পল্লীভবন হল জেনারেল ক্লড মার্টিনের নক্শায়। সাদৎ আলী মুসাবাগে পশুদের লড়াই দেখতেন। আর তার পঞ্চাশ বছর পরে লক্ষ্ণৌর সব চেয়ে বড় লড়াই হয়ে যায় এখানেই। মহাবিদ্রোহের সে এক আশ্চর্য যোগাযোগ। মুসাবাগেই তার প্রথম যুদ্ধ আর শেষও।

আসফুদ্দৌলার মৃত্যু সন ১৭৯৭। জননী বহু বেগমের মৃত্যুর উনিশ বছর আগে। মচ্ছি ভবনের পাশে দওলৎখানা প্রাসাদেই তিনি বেশি থাকতেন। আর গোমতী নদীর ওপারে তাঁর বিবাইয়াপুর বা বিরিয়াপুর কোঠি। জন-কোলাহল থেকে দূরে, নির্বিঘ্ন আরাম বিলাসের জন্যে।

লক্ষ্ণৌকে তিনি রাজধানী করে সাজানো থেকেই ফয়জাবাদ ছেড়ে দলে দলে লোক বাস করতে এল এখানে। পড়তির দশা দিল্লী থেকেও অনেকে লক্ষ্ণৌতে বসতি শুরু করে দিল। দেখতে দেখতে গড়ে উঠল নানা মহল্লা। আমানীগঞ্জ, দলতগঞ্জ, তরমনীগঞ্জ, ফতেহ্গঞ্জ, বেগমগঞ্জ, দরওয়াস, ভবানীগঞ্জ, কাশ্মীরী মহল্লা, টিকেটগঞ্জ ইত্যাদি।

তাঁর পিতা তৃতীয় নবাব শুজাউদ্দৌলা। যেমন সাহসী তেমনি যোদ্ধা তিনি। ১৭৫৩-তে মসনদ পাবার পর শুজাউদ্দৌলার সারাজীবনই যুদ্ধ-বিগ্রহে কাটে। ভারতে তখন চলেছে বড় দরের রাজনৈতিক পালাবদল। বণিক থেকে ইংরেজদের রাজা সাজার পর্ব। মীরকাসিমের সঙ্গে বকসার যুদ্ধে তাদের শেষ শত্রু নিপাত হয়। সেসব হানাহানিতেও জড়িয়ে ছিলেন শুজাউদ্দৌলা। মীরকাশিমের দলে থেকে তিনি অনেক দুর্বিপাকে পড়েন। কাটিয়েও ওঠেন সেসব থেকে। কিন্তু তাঁর বিবেক ছিল না। মীরকাসিমকে তিনি আশ্রয় দেন মিত্র হিসাবে। তারপর পাঁচ পাহাড়ির যুদ্ধে মীরকাসিমের ভরাডুবি ঘটল। শুজাউদ্দৌলা অমনি তাঁকে ভাগিয়ে দিলেন,

তাঁর ধনরত্ন হস্তগত করে।

ইংরেজদের হাতে শুজাউদ্দৌলাও বিধ্বস্ত হয়েছিলেন। ইচ্ছা করলে তারা তাঁকে খতম করতে পারত মীরকাসিমের মতন। রাজ্যহারা শুজাউদ্দৌলা তখন ব্রিটিশ শক্তির কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কিন্তু কূটবুদ্ধি ইংরেজ তাঁকে ফিরিয়ে দিল আউধ রাজ্য। দয়ার দান নয়। স্বার্থের প্রয়োজনে, রাজনৈতিক কারণে। মারাঠাদের তখন বাড়ন্ত অবস্থা। তাদের শাসনে আউধকে কাজে লাগাতে হবে। অযোধ্যাকে দরকার buffer state হিসাবে। তাই ব্রিটিশ সরকার শুজাউদ্দৌল্লাকে কৃপা দেখায়। তবে তাঁর রাজ্য থেকে এলাহাবাদ আর কারা জেলা দুটিকে রেখে দেয় দিল্লীর পুতুল বাদশাহ্ শাহ আলমের খাসে। আর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ নগদ ভালই আদায় করে নেয় নবাবের কাছে।

শুজাউদ্দৌল্লা আউধ সুবার কর্তৃত্ব ফিরে পেলেন বটে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান বৃটিশ শক্তির আওতায় এ রাজ্য পড়ল।

তিনি শুধু বকসার যুদ্ধের আগে ছিলেন লক্ষ্ণৌতে। কিন্তু বেশির ভাগই তাঁর ফয়জাবাদে কাটে। মৃত্যুও হয় সেখানে, ১৭৭৫ সালে। তিনিই প্রথম কবরস্থ হন ফয়জাবাদে। আগেকার দুই নবাবই দিল্লীতে। ফয়জাবাদের গুলাব বাড়ি নামে বিরাট সমাধি ভবনটি শুজার নিজেরই তৈরি। অযোধ্যার পথে সেটি আজো দেখা যায়।

তাঁর সময়ে সমৃদ্ধ ছিল ফয়জাবাদ। যেমন শহর হিসেবে, তেমনি সওদাগরিতেও। আর তাঁর মৃত্যু থেকেই তার ক্ষয়, আর লক্ষ্ণৌর শ্রীবৃদ্ধি।

শুজাউদ্দৌলার বাইশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে দিল্লীর নাম-কা-ওয়াস্তে বাদশা ছিলেন তিনজন। মসনদ পাবার পরের বছরেই (১৭৫৪) মোগল বাদশাহ আহম্মদ শাহ্ পরলোকে গেলেন। দিল্লীর শাহী তখ্‌তে বসলেন দ্বিতীয় আলমগীর। আর পাঁচ বছর পরেই খুন হলেন ষড়যন্ত্রে (১৭৫৯)। পরের বাদশাহ্ হয়ে শাহ্ আলম্ দেখা দিলেন। আগের দুজনের চেয়ে শাহ্ আলমের অবস্থা হল আরো শোচনীয়। তাঁর জন্যে মোগল সাম্রাজ্যের আর বাকি কিছু ছিল না। বাদশাহ্ কথাটা তাঁর সঙ্গে জুড়ে থাকত নিয়মমাফিক। মসনদ পেয়ে প্রথম বারো বছর তিনি রাজ্যহারা হয়ে যাযাবরের মতন ঘুরে বেড়িয়েছেন। তারপর মারাঠারা তাকে হাতের পুতুল করে দিল্লীর তখ্‌তে বসিয়ে দেয় ১৭৭১ সালে। শাহ্ আলম ঠায় সতের বছর সেইভাবে কাটান। তারপর নড়েচড়ে কাটাতে চাইলেন মারাঠা কর্তৃত্ব। ফলে লালকেল্লা প্রাসাদেই বন্দী হয়ে রইলেন। মারাঠা সৈন্যদল কেল্লা দখল করে রাখে সেই ১৭৮৮ থেকে। তার পনর বছর পরে মারাঠাশক্তি বৃটিশের হাতে পরাস্ত হল (বেসিনের যুদ্ধ, ১৮০৩)। তারপর আরো তিন বছর বেঁচেছিলেন শাহ্ আলম। সেই শেষ জীবন ইংরেজদের বৃত্তিভোগী হয়ে থাকেন! মোগল সাম্রাজ্যের চতুঃসীমা তার অনেক আগে থেকেই লালকেল্লা প্রাসাদে।

নবাবদের কথায় দিল্লীর শাহী কাহিনী এসে গেল। কারণ মোগল বাদশাহ্‌র নবাব উজীর ছিলেন আউধের এই বংশ। বাদশাহ্ মহম্মদ শাহ্ তাঁদের অযোধ্যার

সুবাদার করেছিলেন। তারপর উজীরও।

শুজাউদ্দৌলার পিতা সফদরজঙ্গ আউধের দ্বিতীয় নবাব। তিনিই উজীরি পান। আবার উজীরের পদ খোয়াও যায় তাঁরই সময়ে। সফ্‌দরজঙ্গেরই পিতা সাদৎ খাঁ অযোধ্যার প্রথম নবাব। তাঁকেও সুবাদারী দেন মোঘল বাদশাহ্‌ মহম্মদ শাহ্‌। সেসব কথা পরে।

আগে সাদৎ খাঁর পুত্র সফ্‌দরজঙ্গের ব্যাপার বলে নেওয়া যায়।

সফ্‌দরজঙ্গের নবাবী ১৭৩৯ থেকে চোদ্দ বছর। তার মধ্যে প্রথম দশ বছর স্বাধীনতা-খোয়ানো মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ্‌র আমল। ১৭৪৮-এ বাদশাহ্‌র মৃত্যু পর্যন্ত।

নাদির শাহ্‌র দিল্লী আক্রমণ আর 'কতল্‌-ই-আম্‌' (গণহত্যা) তার ক'বছর আগেই হয়ে গেছে। তাঁর লুণ্ঠনে আর তাণ্ডবে দিল্লী শাহীর তখন মুমূর্ষু দশা। দিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় মোগল সাম্রাজ্যকে লুটিয়ে দিয়ে গেছেন নাদির শাহ্‌। এখন বাদশার শুধু অতীতের কঙ্কাল-কেতা। আর স্বার্থান্বেষী মহলে তা ভাঙিয়ে কাজ হাসিলের চেষ্টা।

এই অবস্থায় আউধের সুবাদার সফ্‌দরজঙ্গ বাদশাহী নেকনজর ভালভাবেই পেলেন। মনোনীত হলেন মহম্মদ শাহ্‌র উজীর অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী। আউধের প্রথম নবাব সাদৎ খাঁর অতি লোভের ছিল এই পদ। কিন্তু ভাগ্যে জোটেনি। সফ্‌দরজঙ্গকে মহম্মদ শাহ্‌ সেই উজীরি দিলেন ১৭৪৭ সালে। মোগল দরবারে ক্ষমতার চেয়ে তখন উজীরের নাম-গৌরবই বেশি।

পরের বছরেই মহম্মদ শাহ্‌র হত-গৌরব বাদশাগিরিতে চরম ছেদ পড়ল। মৃত্যু হল ছেচল্লিশ বছর বয়সে।

তাঁর আমলে মোগল সাম্রাজ্য আরো ছোট হয়ে যায়। শুধু অযোধ্যা নয়। সুবে বাংলা বিহার উড়িষ্যাও তখন কার্যত স্বাধীন। মারাঠাদের অধিকারে এসেছে মালব, বুন্দেলখণ্ড, গুজরাট। রাজপুতানা স্বাধীনতা পেয়ে গেছে।

এই অবস্থায় দিল্লীর তখত-এ-তাউস পেলেন আহম্মদ শাহ্‌। আহম্মদ শাহ্‌ আর কুদসিয়া বেগমের পুত্র।

নতুন বাদশাহ্‌র ধরন-ধারণের কথা এক ইতিহাস পুস্তক থেকে জানা যায়। শুধু আহম্মদ শাহ্‌র নয়। তাঁর জননী কুদসিয়া বেগম, বেগম সাহেবার কৃপাপুষ্ট জাবেদ খাঁ আর আউধের সফ্‌দরজঙ্গের কথাও আছে সেই সঙ্গে। ফার্সী বই 'তারিখ্‌-ই-আহমদি' অনুসরণে ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো জানিয়েছেন—

'...বারবিলাসিনী, কুদসিয়া বেগম খেতাব পাইলেও, পদমর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইঁহার গর্ভে (মহম্মদ শাহ্‌র) উত্তরাধিকারী আহম্মদ শাহের জন্ম হয়। শাহী তক্তে বসিবার পূর্বে একুশ বৎসর পর্যন্ত তিনি অন্তঃপুরের বাহিরে আসেন নাই, কোন পুরুষ মানুষের মুখও দেখেন নাই, সর্বপ্রথম যাহার মুখ দেখিয়াছিলেন,—সেই ব্যক্তি—তাঁহার মাতার অনুগৃহীত ক্রীতদাস খোজা জাবেদ। আহমদ শাহের নামে বাদশাহী চালাইতেন কুদসিয়া বেগম এবং খাঁ উপাধিধারী জাবেদ। তাঁহার দরবারে 'ইরানী' ও 'তুরানী' আমীরগণের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। অযোধ্যার

নবাব সফ্‌দরজঙ্গ প্রধান উজীর, কিন্তু খোজার উজীরি করিতে তিনি নারাজ। আহম্মদ শাহ্‌ দিল্লীর উপকণ্ঠে চারি বর্গমাইলব্যাপী প্রাচীর বেষ্টিত, লতাকুঞ্জ শোভিত পরীর শহর আবাদ করিয়াছিলেন। দিল্লীর কোলাহল এবং পুরুষের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য মাসের পর মাস এই পরীস্থানে কুঞ্জবিহার করিতেন।'

(ইতিহাসের ইন্দ্রপ্রস্থ, রাজস্থান কাহিনী, পৃঃ ২৮০-১)

বাদশাহ্‌র বেগমকে কেন তিনি 'বারবিলাসিনী' বলেছেন, মহম্মদ শাহ্‌র কথায় সে বৃত্তান্ত পাওয়া যাবে।

এখন সফ্‌দরজঙ্গের দিল্লী প্রসঙ্গ। তারও আগে আছে লক্ষ্ণৌর ক'টি কথা।

প্রথম নবাব সাদৎ খাঁর মতন সফ্‌দরজঙ্গও থাকতেন ফয়জাবাদে। লক্ষ্ণৌর সঙ্গে সম্পর্ক সামান্যই ছিল। কেবল লিখ্‌না কিলার মধ্যে সাদৎ খাঁ ভাড়া নিয়ে রাখেন দুটি বাড়ি। তার মালিক ছিলেন শেখ্‌রা। সফ্‌দরজঙ্গের সময়েও তেমনি বাসা ভাড়া করাই ছিল।

তবে লিখ্‌না কিলার তখন আর ওই নাম ছিল না। সাদাৎ খাঁ তা বদলে দিয়ে নতুন নামকরণ করেন মচ্ছিভবন। তাঁদের বংশের প্রতীক মৎস্য। তাই এই নাম। কেল্লার মধ্যে তাঁদের আবাস সৌধ। তার তোরণ প্রাকারে উৎকীর্ণ বৃহৎ আকারের মৎস্য। পরেও বংশের নবাবরা যত ইমারৎ গড়েন তার অনেকগুলিতে থাকে মাছের প্রতিকৃতি।

মচ্ছি ভবনে পিতার আমলে ভাড়া করা সেই প্রাসাদ দুটি সফ্‌দরজঙ্গ দখল করে নেন। শেখ্‌দের সঙ্গে ছিল তাঁদের লিখিত চুক্তি। তবু কখনো ভাড়া বাবদ সফ্‌দরজঙ্গ শেখ্‌দের কিছু দেননি। তবে তাঁদের বাড়ির বদলি জমি দিয়েছিলেন দুগাঁওতে।

মচ্ছিভবনকে সফ্‌দরজঙ্গ ঘাঁটি হিসাবে গড়ে নেন। শহরের দক্ষিণে তৈরি করেন জলালাবাদ কেল্লা। এইভাবে লক্ষ্ণৌতে রাজধানীর ভিত্তি স্থাপিত হয় বংশধরদের জন্যে। লক্ষ্ণৌর সঙ্গে সফ্‌দরজঙ্গের সম্পর্ক এই পর্যন্ত।

উজীর হবার তিন বছর পরে (১৭৫০) তিনি দারুণ বিপাকে পড়লেন। দুই শত্রুর আক্রমণে আউধ তখন বিপন্ন। নবাবের সৈন্যদলেরও অবস্থা সঙ্গীন। রাজকোষ প্রায় শূন্য। গঙ্গা যমুনার মাঝে দোয়াব অঞ্চল বেহাত হয়ে গেছে। ফররু খাবাদের আহ্‌মদ খাঁ বঙ্গশ্‌ আর রোহিলা আফগানরা একযোগে অবরোধ করেছে লক্ষ্ণৌ আর এলাহাবাদ দুর্গ। দিল্লীও আক্রান্ত হবার আশঙ্কা।

তাঁর এমনি সময়ের অন্তরঙ্গ বিবরণ আগেকার বইটিতে পাওয়া যায়। কিভাবে সফ্‌দরজঙ্গ নিস্তার পেলেন এবং তার ফলাফল আবার দিল্লীর রাজনীতিতে কি ভয়ঙ্কর দাঁড়াল, তার কথাও আছে সেই সঙ্গে—

'১৭৫০ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি একদিন সকালবেলা নবাব উজীর সফ্‌দরজঙ্গ অনেক বেলা পর্যন্ত বিছানায় শুইয়াছিলেন—চক্ষু মুদ্রিত, অথচ ঘুম নাই। বেগম সাহেবার আওয়াজ পাইয়া তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছায় উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু চোখ খুলিলেন না। শ্বশুরের দৌলতে নবাবী পাইয়াছেন, কাজেই তিনি বেগম সাহেবাকে বিলক্ষণ সমীহ করিয়া চলিতেন।

বেগম সাহেবা নিতান্ত জেদ করাতে নবাব দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, চোখ মেলিয়া হইবে কি? আলো কই? চতুর্দিকে অন্ধকার! দোয়াব হস্তচ্যুত,

অযোধ্যা যায় যায়, ফরাক্কাবাদের আহমদ খাঁ বঙ্গশ্ ও আফ্রিদি-রোহিলা-পাঠানে মিলিয়া লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ দুর্গ অবরোধ করিয়া আছে, শীঘ্রই হয়ত দিল্লী আক্রমণ করিবে। ফৌজ নাই, তহবিল খালি, হিম্মৎ টুটিয়া গিয়াছে।

ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বেগম সাহেবা বলিয়া উঠিলেন, "সাবাস উজীর-ই-আলা! চোখ বুজিয়া তসবী জপিলেই বুঝি তামাম দুনিয়া হাতের মুঠায় আসিবে? আমার তহবিলের নগদ পাঁচ লাখ, হীরা জহরতে দশ লাখ টাকা, নবাব সাহেবের খেদমতে হাজির। আজই চিঠি লিখিয়া মালবের মারাঠা ফৌজ ও সুরজমলের জাঠ ফৌজ তলব করিতে হইবে; মরদের হিম্মৎ, খোদার বরকত।"

নবাব উজীর সফ্দরজঙ্গের সহধর্মিণী ছিলেন বুরহান-উল্-মুল্ক্ নবাব সাদৎ খাঁর কন্যা। পিতার ন্যায় তাঁহার তীক্ষ্ন মেজাজ ও অটুট সাহস। হুকুম খাটাইবার সহজাত ক্ষমতা; বিপদে ধৈর্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কূটনীতিজ্ঞানে পিতা এবং স্বামী হইতে চতুর্গুণ শ্রেষ্ঠ। বেগম সাহেবার পরামর্শ অনুসারে কাজ করিয়া, নবাব উজীর কয়েক মাসের মধ্যেই মারাঠা এবং জাঠ সেনার সাহায্যে বঙ্গশ্ এবং রোহিলাগণকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া নেপাল-তরাই অঞ্চলে তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু জাবেদ খাঁর ষড়যন্ত্রে মারাঠাগণ উজীরের পক্ষ ত্যাগ করাতে, তিনি রোহিলাশক্তিকে চূর্ণ করিতে পারিলেন না। রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া সফ্দরজঙ্গ সর্বপ্রথম জাবেদ খাঁকে বধ করিলেন। ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। সফ্দরজঙ্গ পদচ্যুত এবং রাজধানী হইতে বিতাড়িত হইলেন। দিল্লীর বাহিরে শিবির স্থাপন করিয়া সফ্দরজঙ্গ সুরজমলকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। ভরতপুর হইতে পঞ্চদশ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া কুমার সুরজমল নবাব শিবিরে উপস্থিত হইলেন। এই বাহিনীর পশ্চাতে ছিল আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেণীর সর্বগোষ্ঠীর যুদ্ধক্ষম হিন্দু। সুরজমলের এই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী 'রামদল' নামে পরিচিত ছিল। স্তাবকেরা বীরশ্রেষ্ঠ সুরজমলকে, ভূভার হরণের জন্য যদুবংশে অবতীর্ণ পার্থসারথি বলিয়া মনে করিলেও, তিনি স্বয়ং রাম নামেই সমস্ত কার্য করিতেন। পাঠান সাবিত খাঁর সাবিতগড় দুর্গ জয় করিয়া তিনি উহার নাম রাখিয়াছিলেন রামগড়। মারাঠা আমল পর্যন্ত উহা রামগড় নামেই পরিচিত ছিল, বর্তমানে ঐ দুর্গই সুপ্রসিদ্ধ আলীগড়। যাহা হউক, সুরজমলের 'রামদল' শাহ্ জাহানাবাদ দিল্লী হইতে মক্ষিকা-নির্গম পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল। চারিদিকে লুঠতরাজ, রাজধানীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। আহমদ শাহের নূতন উজীর ইমাদ-উল্-মুল্ক, সাহারাণপুরের জমিদার নাজির খাঁ রোহিলা, এবং মালব হইতে মলহর রাও হোল্কর-কে রাজধানী রক্ষার জন্য মোটা টাকার লোভ দেখাইয়া স্বপক্ষে আনয়ন করিয়াছে শুনিয়া, নবাব সফ্দরজঙ্গ সুরজমলকে দিল্লী শহর লুঠ করিবার হুকুম দিলেন।

সুরজমল কয়দিন ধরিয়া পুরানা দিল্লী লুঠ করিয়াছিলেন জানা যায় না। দিল্লী এবং আওরঙ্গজেবের বংশধরগণের প্রতি জাঠ জাতির পুরুষানুক্রমিক শত্রুতা ছিল। প্রতিহিংসার যে আগুন এতদিন উৎপীড়িত জাঠের হৃদয়ে ধিকিধিকি জ্বলিতেছিল উহার জ্বালাময়ী শিখা এইবার ইন্দ্রপ্রস্থকে গ্রাস করিয়া পরিতৃপ্ত হইল।'

(রাজস্থান কাহিনী, পৃ ২৮১—২৮৩)

আগেকার মোগল শাহীতে জাঠদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার হয়েছিল। তার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেন সুরজমল। কিন্তু তারা কোন নারী নির্যাতন করেনি, গ্রামেও আগুন লাগায়নি, যা ছিল অন্যদের হামলার বৈশিষ্ট্য।

মুসলমানরা লুটের খেয়াল করিত না; প্রায়ই তাহারা স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সকলের মাথা কাটিয়া আনিত, স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিত। নাদির-শাহী 'কত্‌ল্‌-ই-আম' বা পাইকারী মুণ্ডচ্ছেদ,—এবং জাঠ দমন ব্যাপারে আহমদ শাহ্‌ দুরানীর সেনাপতি জাহান খাঁর মথুরা-বৃন্দাবনে রক্তের বীভৎস তাণ্ডব হোলি খেলা ইহার প্রমাণ।'

(ঐ পুস্তক, পৃঃ ২৮৩)

আলমগীরী বর্বরতার প্রতিক্রিয়া ঘটল এইভাবে। সুরজমল আওরঙ্গজেবের বংশধরদের আর শাহী দিল্লীকে শায়েস্তা করলেন। আর তার উপলক্ষ্য হলেন আউধের নবাব সফ্‌দরজঙ্গ।

কিন্তু এই ডামাডোলে সফ্‌দরজঙ্গ উজীরি খোয়ালেন। জাবেদ খাঁকে নিপাত করতে গিয়ে হারালেন দিল্লী শাহীর নেক-নজর। নামে মাত্র বাদশাহ্‌ আহমদ শাহ্‌কে কুদসিয়া বেগমই তো চালাতেন! জাবেদ খাঁকে বধ করার বদলা কুদসিয়া নিলেন এইভাবে।

তার তিন বছর পরে (১৭৫৩) প্রাণও হারলেন সফ্‌দরজঙ্গ। দিল্লীতে তাঁর সমাধি-সৌধের নামও হয় সফ্‌দরজঙ্গ।

সাদৎ খাঁ শুধু তার শ্বশুর নন, মামাও। আউধের সুবাদারী আর বুরহান্‌-উল-মুল্‌ক্‌ খেতাব দু-ই সাদৎ খাঁ পান বাদশাহ্‌ মহম্মদ শাহ্‌র কাছে।

তিনিই অযোধ্যার প্রথম নবাব সাদৎ খাঁ। আউধের এই নবাব বংশের পত্তন তাঁর থেকে, যার দশম নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ।

নানা ঘটনায় আর দুর্ঘটনায় ভরা সাদৎ খাঁর জীবন। বংশধরদের নবাবীর তিনি পাকা বন্দোবস্ত করে যান। কিন্তু সেজন্যে কি ঝুঁকি যে তাঁকে নিতে হয় আর কি প্রাণপাত মেহনত!

দিল্লী শাহীর কত ওলটপালট তাঁর চোখের সামনেই হয়ে যায়। তার সঙ্গে জড়িয়েছিল তাঁর নিজের জীবনও। মোগল বাদশাহ্‌দের সেই বড় দরের পালা-বদলে সাদৎ খাঁও এক হিস্যাদার। শুধু মোগল শাহীর নয়, নাদীরশাহী পর্বেরও একজন অংশীদার তিনি।

অথচ সাদৎ খাঁ দিল্লীর লোক নন। অন্য কোন নবাব বংশ থেকেও আসেননি রাজধানীতে। এমন কি ভারতেরও তিনি কেউ নন।

কে তিনি, কিভাবে এতবড় ভূমিকা পেলেন দিল্লীর রাজনীতিতে, বাদশাহ্‌র এত কাছাকাছি এলেন, সেসব অনেক ব্যাপার। পরে বিশেষ করে বলবার। সেই সঙ্গে অযোধ্যার আরো পট-পরিবর্তনের বৃত্তান্তও আছে।

তার আগে, এখন একবার লক্ষ্ণৌর কথায় ফিরতে হবে। শুরু হয়েছিল নবাব ওয়াজেদ আলীর দরবার আর আউধ রাজ্য নিয়ে। তারপর তাঁর পূর্বপুরুষদের কথায় কথায় প্রথম নবাব পর্যন্ত আসা হয়েছিল। এবার পরিক্রমা করতে হবে ওপর দিব

PATHAGAR

থেকে নীচে। প্রথম থেকে শেষ পর্বে।

প্রথম লক্ষ্ণৌর সংস্কৃতি প্রসঙ্গ।

এখানেও নবাব বংশের কথা আছে। কারণ লক্ষ্ণৌর এই শ'দুয়েক বছরের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে নবাবী প্রভাবেই। তার লালন-পালন অনেকখানি লক্ষ্ণৌ দরবারের জন্যে। ইমারৎ গড়া থেকে খুশ্‌নবীশী (বইয়ের অলংকৃত লিপিকরণ) পর্যন্ত হরেক রকম জিনিস সেই লক্ষ্ণৌ তমদ্দুনের অঙ্গ।

শুজাউদ্দৌলার ফয়জাবাদের জমাটি আসর আর দিল্লীর ভাঙা আসর থেকে সব কিছু লক্ষ্ণৌতে এসে জমেছিল নবাব আসফুদ্দৌলার আমলে, লক্ষ্ণৌয় জাঁকজমক আর রোশনির টানে। নাচওয়ালী, গানওয়ালী, কলাবিদ, ওস্তাদ, কবি, লেখক, খুশ্‌নবীশ, হাজারো রকম কারিগর বাওর্চি থেকে শিল্পী আর বনিয়াদী পরিবার পর্যন্ত লক্ষ্ণৌতে এসে হাজির। তারা সবাই এখানকার খাস বাসিন্দা হয়ে গেল। আর দেখতে দেখতে গড়ে উঠল এক দরবারী নাগরী সংস্কৃতি। চটকদার বড় বড় মকান। নাচ গান বাজনা। ফার্সী আর উর্দু সাহিত্য। মসনবী মার্সিয়া আর শাইরী। ইলাহী খানাপিনা। পোশাক-পরিচ্ছদ সাজসজ্জা। গণিকা বিলাস। শিষ্টাচার, আদব-কায়দা, বাকচাতুর্য, হাস্য-পরিহাস। আতর আর নানা সুগন্ধী। মজলিশ মহ্‌ফিল্‌ সোহ্‌বত্‌। জন্তু-জানোয়ার পাখির লড়াই। এমন ফানুষ ঘুড়ি পর্যন্ত নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক ধারা লক্ষ্ণৌতে।

ফার্সী-ভাষী ইরানী দরবার আর নবাবদের জন্যেই এই সংস্কৃতির পোষণ আর লালন-পালন। কত্থক ঘরানা নৃত্য আর ঠুংরি গান ছাড়া লক্ষ্ণৌ দরবারের অনেকটাই ইরানী প্রভাবের ফলন। আর লক্ষ্ণৌয়ি সংস্কৃতিতে নবাবী ভোগবিলাসের ছাপ।

কেবল কত্থক নৃত্যধারা লক্ষ্ণৌ দরবারে আসে কত্থক গুণীদের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তে। আর দরবারে সেই কত্থক নাচের ঘরানা পত্তন হয় ওয়াজিদ আলীর আনুকূল্যে। সেই সঙ্গে ঠুংরি গানেরও এক বড় প্রচারক বলা যায় নবাবকে।

লক্ষ্ণৌ নবাবদের বাস্তু স্থাপত্যও সে সংস্কৃতির একটি বৃহৎ অঙ্গ। আসফুদ্দৌলার বিশ লাখ টাকায় বানানো বড় ইমামবাড়া থেকে ওয়াজিদ আলীর আশী লাখ টাকায় গড়া কাইসর ইমারতের নবাবী ধারা।

এই তমদ্দুনের আর একটি বিশেষ অঙ্গ বাইজীদের নাচ গান বাজনা। তারও সূচনা তৃতীয় নবাব শুজাউদ্দৌলার আমলে।

নাচনী গানওয়ালী পেশাদারদের রেওয়াজ শুজাউদ্দৌল্লা প্রথম করেন এ বংশে। তখনো লক্ষ্ণৌ দরবার গড়ে ওঠেনি। কিন্তু শুজাউদ্দৌলা রাস্তা দেখিয়েছিলেন ফয়জাবাদে। তাঁর জীবন অনেকখানিই লড়াইয়ের ময়দানে কাটে বটে। কিন্তু ফুরসৎ পেলেই তাঁরও ছিল এই নবাবী মৌজ।

'তারীখ্‌-এ-ফয়জাবাদ'-এর লেখক বলছেন—'শুজাউদ্দৌলার নাচ গানের খুব শখ ছিল। দিল্লী ও অন্যান্য দূর দূর অঞ্চল থেকে হাজারে হাজারে গায়িকা বেশ্যা এখানে এসে জড়ো হতে লাগল। ক্রমে, রেওয়াজই দাঁড়িয়ে গেল প্রধান মন্ত্রী ছাড়া আর সমস্ত আমীর ও ফৌজী সরদাররা কোন দিকে যাত্রা করলে সঙ্গে-সাথে যেত নাচিয়ে গাইয়ের দল, বারবনিতার শিবির।' (পুরনো লখনউ, পৃঃ ১৮২)

বাইজীদের সংখ্যা সম্পর্কে গ্রন্থলেখকের অতিশয়োক্তি থাকতে পারে। কিন্তু বাইজী শ্রেণীর প্রতি এই নবাবী পৃষ্ঠপোষকতা বাস্তব সত্য।

সাধারণ রূপোপজীবিনীদের রেওয়াজও শুজাউদ্দৌলার আমল থেকে।

এই পুস্তকেই তার অন্তরঙ্গ চিত্র প্রকাশিত—

'শুজাউদ্দৌলার লখনউয়ে গণিকাদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, দিন দিন তা বেড়ে গেছে। স্বকীয় শখের পরিপূর্তি ও বৈভব প্রদর্শনের জন্যে রক্ষিতা রাখতেই হবে—এটা একটা আমীরী আচরণই হয়ে গিয়েছিল। হকীম মেহেদীর মতো যোগ্য, হুঁশিয়ার ও শিধা ব্যক্তি, যিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ পেয়েছিলেন, তাঁরও উন্নতির মূলে ছিল পিরাজু নামে এক বারবনিতা—যে নিজের কাছে অন্যের জমা টাকা দিয়ে তাঁকে একটি সুবার নিজামতী পাইয়ে দিয়েছিল। এই উচ্ছৃংখলতার একটি ছোট ও সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত লখনউয়ের একটি খ্যাত প্রবচন—'যব তক্ ইন্সান্ কো রণ্ডিয়োঁ কি সোহবত ন নসীব হো, আদমী নহী বন্তা'—বেশ্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অদৃষ্টে যতদিন না হচ্ছে, ততদিন কোন ব্যক্তিই পুরোপুরি মানুষ হতে পারে না। এর ফলে লোকদের নৈতিক অধঃপতন ঘটল। আমাদের সময়ের লখনউতে এমন কয়েকজন গণিকা ছিল, যাদের ঘরে প্রকাশ্যে ও নিঃসংকোচে যাওয়া এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করা খারাপ মনে করা হত না।'

(পুরনো লখনউ, পৃঃ ৩০৬)

নবাব বংশ অধিকাংশ ইরানীদের মতন শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান। তাই 'সোজখোয়ানি' বা সোজখানি (মহরমের সময় গাইবার) গানও চলন হল দরবারের দাক্ষিণ্যে। তাও শুজাউদ্দৌলার সময় থেকে।

আবার অন্য গায়ক কলাকাররাও তাঁর জন্যে আউধে বসতি করতে লাগলেন। কারণ সঙ্গীতের কদর করতেন নবাব। অযোধ্যা আর বারাণসীর পুরানো ঘরানা এখানে আগে থেকেই ছিল। তারপর এসে যোগ দিলেন দিল্লীর বড় বড় গাওয়াইয়া আর ইয়াসিন খাঁ ঘরানার ওস্তাদরা।

শুজাউদ্দৌলার মাতুল, নবাব সালায় জঙ্গও একজন বড়দরের গুণী। সব মিলিয়ে এ অঞ্চলে সঙ্গীতচর্চায় একটা নতুন সাড়া জাগল বলা যায়।

টপ্পার বিখ্যাত কলাবৎ শোরী মিঞাও শুজাউদ্দৌলার সমকালীন। তবে শোরী মিঞা আগে থেকেই লক্ষ্ণৌনিবাসী। তখন তো লক্ষ্ণৌতে নবাব দরবারের পত্তন হয়নি। শোরী মিঞা যেমন টপ্পা গানে, তেমনি তাঁর বাবা গোলাম রসুল খেয়ালের নামী কলাকার। তবে শুজাউদ্দৌলার ফয়জাবাদ দরবারে তাঁদের যাতায়াতের কথা জানা যায় না।

পরের নবাব আসফুদ্দৌলার আমলে একটি বই লেখা হয় ফার্সীতে। পুস্তকটি নবাবকে উৎসর্গ করা। নাম—'উসুল্-উল্-নাগমৎ-উল্-আস্ফিয়া।' তার বিষয়বস্তু হল, ভারতীয় সঙ্গীত। তা থেকে আন্দাজ করা যায় আরেকটি ব্যাপার। এই শিয়া নবাব দরবারে বাইরে থেকে ফার্সী কলাবিদরাও যোগ দিতে আসতেন। তাঁরা আকৃষ্ট হচ্ছিলেন এবং চর্চা করছিলেন ভারতীয় সঙ্গীতে।

আসফুদ্দৌলার পর গাজীউদ্দিনকে সঙ্গীতপ্রিয় বলে জানা যায়। তাঁর সঙ্গে

ওস্তাদ গাওয়াইয়া হায়দরী খাঁর প্রসঙ্গ বলা হয়েছে আগে।

তেমনি, ওয়াজিদ-পিতা আমজাদ আলীও সঙ্গীতামোদী। অনুমান হয়, তাঁরও ভারতীয় সঙ্গীতে প্রীতি ছিল। কারণ তাঁর আমলে লক্ষ্ণৌ দরবারে নিযুক্ত কলাকার ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সেজীয়া কলাবৎ ওমরাও খাঁ। তানসেনের কন্যাবংশীয় মহাগুণী বীণ্‌কার-ধ্রুপদী তিনি। রামপুর ঘরানার অন্যতম প্রবর্তক আমীর খাঁ (বীণাবাদক-ধ্রুপদ গায়ক) হলেন ওমরাও খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

আমজাদ আলীর পরে ওয়াজিদ আলীর সঙ্গীত দরবারও ঐতিহাসিক।

কাশীর কত্থক সম্প্রদায়ের নর্তকদের এই নবাব দরবারে যোগও শুজাউদ্দৌলার আমল থেকে। সে দরবারে দেখা গেছে নৃত্যাচার্য খুশী মহারাজকে। তাঁর আমল থেকে আসফুদ্দৌলার দরবারেও খুশী মহারাজ থাকেন।

তারপর সাদৎ আলী, গাজীউদ্দিন, নাসীরুদ্দিনের দরবারী নর্তকরা হলেন যথাক্রমে হল্লালজী, প্রকাশজী এবং দয়ালজী। তিনজনই নৃত্যবিশারদ।

তাঁদের মধ্যে প্রকাশজীর দুই স্বনামধন্য পুত্র দুর্গাপ্রসাদ ও ঠাকুরপ্রসাদ। তাঁরা, বিশেষ ঠাকুরপ্রসাদ নবাব ওয়াজেদ আলীর নৃত্যগুরু। আর ঠাকুরপ্রসাদ থেকে লক্ষ্ণৌ দরবারে কত্থক নৃত্য ঘরানার পত্তন। তাঁর দুই পুত্র বিন্দাদীন এবং কালকাপ্রসাদ হিন্দুস্থানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৃত্যগুণী। তাঁরাও নবাব ওয়াজেদ আলীর সময়কার।

লক্ষ্ণৌ দরবারের শাহ্‌নাই বাজনদাররাও উঁচুদরের। প্রহরে প্রহরে তাঁদের দরবারে বাজাবার প্রথা। শাহ্‌নাই বাজনারও সব চেয়ে বেশি চলন আর উন্নতি ওয়াজেদ আলীর দরবারেই হয়েছিল।

এসব হল লক্ষ্ণৌ দরবারে নাচ গান বাজনার কথা।

সেইসঙ্গে অতি সঙ্গীতমনা হয় লক্ষ্ণৌর সাধারণ নারী পুরুষ। অলিগলিতে ছেলে ছোকরাদের গান হচ্ছে। চলতে ফিরতে গান গাইছে হাটবাজারের লোকেরা। গলার কাজ দেখাচ্ছে মর্সিয়াখোয়ানী কি সোমখোয়ানীর ধরনে। এ তো লক্ষ্ণৌতে হামেশার ব্যাপার। আর এইসব থেকেই বোঝা যায় লক্ষ্ণৌতে গানের কি রেওয়াজ।

লক্ষ্ণৌ সংস্কৃতির একটি রসাল বিভাগ তার আহার্য পানীয়।

নবাবী খানাপিনা আর ভোজন বিলাসিতাও শুজাউদ্দৌলার সময় থেকে। খাবার টেবিলে যে বিশেষ কাপড়ের ওপর আহার্য সাজিয়ে দেওয়া হয় সেই 'দস্তর খোয়ান' বা দস্তরখান আর 'বাওঅর্‌চীখানার' (বাবুর্চিখানা) নিয়ম-কানুন আর নানান দামী দামী পদের রান্না—সবই নবাব শুজাউদ্দৌলার পত্তন।

তাঁর পরের নবাবরা সেসব ক্রমেই বাড়িয়ে চলেন। যেমন সূক্ষ্ম তেমনি মূল্যবান সব রান্না। নানা মুখরোচক খানা। নতুন নতুন পদ আবিষ্কার। রন্ধনে বৈচিত্র্য আর সৌকর্য লক্ষ্ণৌয়ি সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে ওঠে। যেমন 'শীরজাল' (দুধে আটায় অতি কায়দায় তৈরি সুস্বাদু রুটি বা পরোটা) কিংবা শুধু বাদাম পেস্তার খিচুড়ি বিশেষ করে লক্ষ্ণৌর জিনিষ।

শুজাউদ্দৌলার নবাবী খানার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়—

'নবাব শুজাউদ্দৌলা অন্দরমহলে পত্নী বহু বেগম সাহেবার সঙ্গে আহার

করতেন। এটা তাঁর নিয়মই ছিল। মেহরীরা থালাগুলো বহু বেগম সাহিবার সামনে নিয়ে গিয়ে খুলত এবং দস্তরখানের ওপর সাজিয়ে দিত।

নবাব ও বেগমের জন্যে প্রত্যহ ছ'টা বাবুর্চীখানা থেকে 'খানা' আসত। প্রথমটি হল···নবাবী বাবুর্চীখানা, যার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন মির্জা হাসনু, এবং যেখান থেকে 'খানার খোআন' (বাদশাহী খানার থালা) মৌলবী ফজলে আজিম স্বয়ং নিয়ে গিয়ে দেউড়ীতে পেঁছে দিতেন। এখানে রোজ দু হাজার টাকার রান্না হত। তার অর্থ ঃ বাবুর্চী ও চাকর-বাকরদের বেতন ছাড়া, শুধু খাদ্য সামগ্রী এবং খাওয়া-দাওয়া বাবদই খরচ হত মাসে ষাট হাজার, বছরে সাত লাখ কুড়ি হাজার টাকা। দ্বিতীয়টি হল ঃ সরকারী ছোট বাবুর্চীখানা।···এখানে খানা তৈরির খরচ ছিল রোজ তিনশো, বছরে এক লাখ ষাট হাজার টাকা। তৃতীয় বাবুর্চীখানা ছিল খোদ বহু বেগম সাহিবার অন্দরমহলে। চতুর্থ খানা আসত নবাব বেগম সাহিবা অর্থাৎ শুজাউদ্দৌলার মায়ের বাবুর্চীখানা থেকে। পঞ্চম, মির্জা আলী খাঁর বাবুর্চীখানা এবং ষষ্ঠ, নবাব সালার জঙ্গের বাবুর্চীখানা থেকে। শেষ দুজন ছিলেন বহু বেগম সাহিবার ভাই এবং শুজাউদ্দৌলা বাহাদুরের শ্যালক।

এর সবগুলিই ছিল শাহী বাবুর্চীখানার স্তরের। অত্যন্ত যত্নের ও সূক্ষ্ম কারিগরির সঙ্গে নবাবের জন্যে নানাবিধ মুখরোচক খানা এখানে প্রস্তুত করা হত

(পুরানো লখনউ, পৃঃ ২২৩-২২৪

নবাবী খানার এই খরচের হিসাবে মনে রাখা দরকার যে এসব দুশ বছরেরও আগেকার কথা। তবে আহার্যের এই আর্থিক মূল্যে অতিশয়োক্তি থাকা সম্ভব।

শুজাউদ্দৌলার পরে লক্ষ্ণৌতে নবাবী রান্না কিরকম দাঁড়ায় তারও একটু হদিস মেলে—

'নবাব আবুল কাসেম খাঁ ছিলেন শৌখীন রইস। তাঁর বাড়িতে খুব 'ভারী' পুলাও তৈরি হত। চেঁত্রিশ সের গোশ্‌ত্‌ ফুটিয়ে তার 'ইয়খনি' (সুরুয়া) বা করে নিয়ে তাইতে চাল 'দম' (সিদ্ধ) করা হত। মুখে দিতে না দিতেই মনে হত তামাম চাল গলে গিয়ে নিজেই হজম হয়ে গেছে! সেই সঙ্গে, এতো হাল্‌কা, বোঝবার সাধ্য কি ওতে কোন্‌ ধরনের গরিষ্ঠতা আছে। এতোটাই, কিংবা এর চেয়েও বেশি তাকতের পুলাও ওয়াজিদ আলী শাহ্‌র বিবি খাসমহল সাহেবার জন্যে রোজ তৈরি হত।'

(ঐ পুস্তক, পৃঃ ২৩৩-২৩৪

নবাব ওয়াজেদ আলীর আমলে সব বিষয়েই চূড়ান্ত নবাবী। অন্য স বিলাসিতার মতন খানা আর খাইখিলাইতেও।

শুজাউদ্দৌলা থেকে ওয়াজিদ আলী পর্যন্ত এই ইহ-সর্বস্ব সাংস্কৃতিক ধারা নবাবীয়ানার সঙ্গে যা অঙ্গাঙ্গী। ফয়জাবাদে যার উৎপত্তি আর লক্ষ্ণৌতে বিকাশ পরিণতি। এই বিবরণের সঙ্গে আরও যোগ করা যায়—সূক্ষ্ম, সুন্দর কাজকর্মে ভ বাসন খেলনা। 'বেগম পান্‌' ইত্যাদি তাম্বুল বিলাস আর কিমাম। আবার মুর্গি লড়াই, ভেড়ার লড়াই। হরিণের লড়াই, হাতির লড়াই। তা ছাড়া ঢাউস ঢা ফানুষ আর রকমারি ঘুড়ি ওড়ানো। এমনি আরো কত কি নিয়ে লক্ষ্ণৌ সংস্কৃতির বহর। এ সবের অনেকখানিই নবাব দরবারের পোষকতায়।

তার আসল কথা—দেহ মন প্রাণের আশ মিটিয়ে ভোগ বিলাসিতা। জীবনকে স্থূল উপভোগ অনেকটাই। ওয়াজিদ আলীরও শিল্পীসত্তা ভিন্ন অন্য সব বিষয়ে তাই।

আবার নবাবদের নকলে ধনী আর রইস লোক থেকে সাধারণ মানুষ সবাইকার তেমনি রুচি প্রবৃত্তি। ভোগবিলাসের ঢালাও হালচাল লক্ষ্ণৌতে।

কেবল প্রথম নবাব সাদৎ খাঁ এত আরামের ফুরসত পাননি। যদি গুছিয়ে বসে কিছু বছর নবাবগিরির সুযোগ পেতেন, দেখাতে পারতেন হয়ত।

অযোধ্যার নবাবরা অবশ্য সার্বভৌম ক্ষমতা পাননি। প্রথমদিকে সুবাদারি ও পরে উজীরি। তারপর ব্রিটিশ আমলে রাজনৈতিক শক্তিবর্জিত। তারই মধ্যে মেতে থাকেন নবাবীয়ানার ভোগসুখে।

সেই নবাবী পত্তনের সব হাঙ্গাম হুজুৎ পোহাতে হয় সাদৎ খাঁকে। আউধের প্রথম সুবাদার তিনি ১৭২২ সাল থেকে।

তাঁর সদর দফতর পুরনো অযোধ্যা নগরে। আর লক্ষ্ণৌর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সামান্যই।

সাদৎ খাঁ কখনো কখনো শুধু লক্ষ্ণৌতে আসতেন। থাকতেন দিন কতক। সেই সাময়িক বাসের জন্যে লিখ্‌না কেল্লার মধ্যে দুটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে রাখেন। সে ভবনের মালিক শেখ্‌রা। তাঁরা আগে থেকে লক্ষ্ণৌর বাসিন্দা।

সাদতের ভাগিনা ও জামাতা সফ্‌দরজঙ্গ সেই সৌধ দুটি শেখদের কাছ থেকে অধিকার করে নেন। আর সেখানেই পত্তন হয় এই বংশীয়দের লক্ষ্ণৌ নগরীতে নিজস্ব বাসস্থল। বলা যায়, তাঁদের প্রথম ডেরা। সদন দুটির প্রথমে নাম ছিল পাঁচ মহল আর মুবারক মহল।

সাদৎ খাঁ যখন ভবন দুটি ভাড়া নেন, তখনো লক্ষ্ণৌতে শেখদের খুব বোল-বোলাও ছিল। লিখ্‌না কিল্লার তাঁরাই একরকম দখলদার।

সুবাদার সাদৎ খাঁকে বেশি থাকতে হত দিল্লীতে। আর তাঁর সরকারী আবাস অযোধ্যা নগরে।

অযোধ্যার লক্ষ্মীঘাট এলাকায় তিনি তৈরি করেন কিলা মুবারক। সেই দুর্গেই তাঁর প্রধান দফতর।

আর ফয়জাবাদে শিকারের জন্যে তাঁর একটি বাংলো হল। লক্ষ্ণৌর প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দূরে এই ফয়জাবাদ। অযোধ্যার দু ক্রোশ পশ্চিমে। ঘর্ঘরা নদীর দক্ষিণ ধারে। অযোধ্যাকে মুলমানেরা বলত আউধ বা অওধ বা অবধ। রাষ্ট্রকেন্দ্র আগে সেখানেই ছিল।

ফয়জাবাদ কোন পুরানো শহর হয়। তার ঐতিহ্যও ছিল না কিছু। কিন্তু সফ্‌দরজঙ্গ আর সুজাউদ্দৌলার আমলে হয় অযোধ্যার বৃহৎ নগর।

সাদৎ খাঁর আমলে ফয়জাবাদ অসংখ্য শেওড়া জঙ্গলে ভরা থাকত। শিকারের জন্য বাংলো ছাড়া, তিনি তৈরি শুরু করেন দিল্‌খুসা প্রাসাদ। কিন্তু তাও তাঁর মৃত্যুর সময় শেষ হয়নি।

দ্বিতীয় নবাব সফদরজঙ্গই আসলে ফয়জাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠাতা। ফয়জাবাদেই

তিনি রাখেন তাঁর সরকারী আর সামরিক দফতর।

আর চতুর্থ নবাব আসফুদ্দৌলার আমল থেকে লক্ষ্ণৌর শ্রীবৃদ্ধি। লা
দরবারের পত্তন।

কিন্তু লক্ষ্ণৌর ঐতিহ্যই প্রাচীন। এত পুরনো অঞ্চল সমগ্র উত্তরভারতে অ
ছিল। অতীতের অযোধ্যারাজ্যের এক অঙ্গ নগর। লক্ষ্ণৌর সে অতীত কথা
আছে বৃহত্তর অযোধ্যার ঐতিহ্যে। কত পালাবদল ঘটে গেছে তার সুদীর্ঘক
ইতিহাসে।

নবাব বংশ তো এখানে হাল আমলের কথা। আঠারো শতকের লোক সাদৎ
আর বিশ ত্রিশের দশকে তাঁর সুবাদারী। আগে মোগলদের আর তাদের পূর্ব
শেখ পাঠানদের কত পর্বই এখানে ঘটে গেছে। সেই শেখদেরই জের থেকে
সাদৎ খাঁর সময় পর্যন্ত। লিখ্‌না কিলাও তাদের আমলে।

লক্ষ্ণৌতে যেখানে নবাবদের মচ্ছিভবন, সেখানেই ছিল সেই মজবুত কে
আগেকার দখলদার শেখরাই সে গড়ের মালিক। কিন্তু লিখ্‌না নামে এক হি
হাতে দুর্গটি তৈরি আর পরে এলাকাটিরও নাম হয়ে যায় লিখ্‌না কিলা।

লক্ষ্ণৌর নামটির তাৎপর্য কি ? কেমনভাবে লক্ষ্ণৌ শব্দটির
উৎপত্তি ও প্রচলন হয়েছিল ?
নগরীর আদি ও অকৃত্রিম নামকরণের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে তার
সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। নাম বিকৃতির ভস্মে আচ্ছাদিত
রয়েছে এ অঞ্চলের ঐতিহাসিকত্ব তথা
প্রাচীনত্ব। মহা পুণ্যময় স্থান-মাহাত্ম্য আত্মবিস্মৃতিতে রাহুগ্রস্ত হয়েছে।
স্থানীয় দুর্গটির নির্মাতা লিখনার সূত্রে কি লক্ষ্ণৌর নামকরণ ?
লিখনা থেকে উদ্ভূত হলে উচ্চারণ হত
লিখনৌ। লক্ষ্ণৌ কেন ?
তা ছাড়াও, লিখনা তো মধ্যযুগের শেষাংশে বর্তমান থাকেন। লিখনার চেয়ে
অনেক, অনেক পুরনো কালের নগর লক্ষ্ণৌ।
খৃষ্ট জন্মেরও বহু শত বছর আগেও অস্তিত্ব ছিল তার।

কিন্তু সুদূর অতীতকালে তা 'লক্ষ্ণৌ' নামে উচ্চারিত হত না। অনেক পরবর্তী-কালে, উত্তর ভারতের এক পরাধীন পর্বে বিদেশী শাসকদের বিকৃত উচ্চারণ হল, লক্ষ্ণৌ।

ভারতীয় ঐতিহ্যে এ নগরীর প্রকৃত নাম—লক্ষ্মণপুর। শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ, আদর্শ ভ্রাতৃত্বের মূর্ত বিগ্রহ লক্ষ্মণের নামাঙ্কিত পুরী। সেকালের প্রসিদ্ধ অযোধ্যা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত নগর লক্ষ্মণপুর। রাম, লক্ষ্মণের সমকালীন জনবসতি।

লক্ষ্মণপুর প্রতিষ্ঠার সময় সম্পূর্ণ হয়েছে রামচন্দ্রের বনবাস পর্যায়। রাবণ বধ করে এসে তিনি অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তখন তিনি লক্ষ্মণকে এই স্থানটি দিয়েছিলেন। তারপর লক্ষ্মণ সেখানে স্থাপন করেন এক নতুন জনপদ। নদী তীরে উচ্চভূমিতে নব নগরী লক্ষ্মণপুর গড়ে ওঠে। রামানুজের স্মৃতিপূত সেই টিলা লক্ষ্মণ টিলা এবং বাসাঞ্চলটি পরিচিত হয়ে পড়ে লক্ষ্মণপুর নামে।

লক্ষ্মণপুর থেকে মৌখিক সংক্ষেপে লক্ষ্ণৌ বা লখ্‌নউ।

সেই পৌরাণিক বা প্রাচীন যুগের বৃত্তান্ত বর্ণনার আগে অর্বাচীন কালের বিদেশীদের কিছু বিবরণ দেওয়া যায়। বিশেষ লক্ষ্ণৌর শেখ্‌ পাঠানদের প্রসঙ্গ।

ওয়াজিদ আলীর পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রথম নবাব যে সাদৎ খাঁ, তাঁর পাঁচ শ' বছর আগে থেকে এখানে মুসলমান উপনিবেশের শুরু। দফায় দফায় দলে দলে এ অঞ্চলে শেখরা আসে আর বাস পত্তন করে। তারা নানা গোষ্ঠীর শেখ্‌। হাজির হতে থাকে কয়েক শতক যাবৎ। তারাই এখানকার আদি বিদেশী বাসিন্দা।

শেখ্‌ পাঠানদের আগেও ক'বার ইসলামী অনুপ্রবেশ এই এলাকায় ঘটেছিল। তবে তা সাময়িক।

প্রথম তো গজনীর স্বনাম প্রসিদ্ধ সুলতান মাহ্‌মুদের আমলেই। তাঁর লুণ্ঠন অভিযানের শিকার হয় সুসমৃদ্ধ অঞ্চল। ধনরত্ন আর বহুমূল্য মূর্তি অপহরণের, শান্তিপূর্ণ জনসমাজের হত্যাকাণ্ডের সেই সূত্রপাত। মন্দির বিগ্রহ ধ্বংসের সঙ্গে দেবালয়ের মণি মুক্তা সোনা চাঁদি আত্মসাৎ করার পর্ব। গজনীর মাহ্‌মুদ তাঁর ভাতিজা সাঈদ সালা মাসাউদকে সসৈন্যে পাঠিয়েছিলেন অযোধ্যা রাজ্যে (১০৩০ খৃঃ)

তবে সে নিরাকার উপাসকদের মার মার কাট্‌ কাট্‌ আর লুঠপাট হল মড়কের তুল্য সাময়িক ব্যাপার। কিন্তু বারবার সোনার ভারতে লুণ্ঠনের তাণ্ডব চালিয়ে মামুদ তাঁর স্বদেশবাসীদের সামনে রাস্তা খুলে দিলেন।

গজনীর মহাজনের পন্থায় হানা চিলেন আরেক আফগান মহাপুরুষ। ঘুর বা ঘোর এলাকার শিহাবুদ্দিন। সে লড়াকু মহম্মদ কিন্তু প্রথমে হেরে যান, বন্দী হন পৃথ্বীরাজ চৌহানের হাতে। তখন কান্যকুব্জের চৌহানরাজ মহানুভবতায় শিহাবুদ্দিনকে মুক্তি দিয়েছিলেন। অপাত্রে উদারতার খেসারত তাঁকে দিতে হয় চরম মূল্যে। পরবর্তী আক্রমণে ঘোরীর মহম্মদ পৃথ্বীরাজের মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলেন। চৌহানরাজের সঙ্গে জলাঞ্জলি যায় উত্তর ভারতের স্বাধীনতা। শিহাবুদ্দিনের তুর্ক-আফগান সেনাদল কনৌজ জয় করে অযোধ্যাতেও হানা দিয়ে যায়। তা হল ১১৯৪ সালের কথা। সে লুঠতরাজ, অত্যাচার মন্দির-মূর্তি ভাঙা আর পাইকারী হত্যা অযোধ্যাবাসীরা ভুলতে পারেনি বহুদিন।

তার সাত আট বছর পরে অযোধ্যা অঞ্চলে হাজির হলেন আরেক মহম্মদ—বখ্‌তিয়ার খল্‌জী। তিনি বাংলার সুবেদারি নেবার জন্যে অযোধ্যার মধ্যে দিয়েই যান। তখন শুধু তলোয়ারের খেল্‌ই দেখাননি বখ্‌ৎ ইয়ার। কিছু পাকা কাজও করেন। একটি পুরনো শহরকে বখ্‌তিয়ার নগর নাম দিয়ে একদল পাঠানকে বসিয়ে দেন এখানে।

অযোধ্যার রাজ্যে বিদেশীদের স্থায়ী বাসের সেই সূত্রপাত। এদেশের নিরীহ সাধারণ মানুষদের দেখে তুর্ক-আফগানরা নতুন হিসাব করে নেয়। এদেশীয়রা যেমন শান্তিপ্রিয় তেমনি অদৃষ্টবাদী। সব অত্যাচার, দুর্গতিকে তারা সহ্য করে ভাগ্য বলে। এখান থেকে লুটেপুটে সরে পড়বার দরকার কি? নিজেদের মরুদেশে তো সেই আধ-পেটা খাওয়া আর হা-ঘরে হয়ে থাকা। আবার এখানে হানা দিতে হবে সোনা চাঁদির জন্যে। তার চেয়ে এখানে কায়েম হতে পারলেই আখেরে ফয়দা। এত লুঠের মাল দুনিয়ায় আর কোথায়? তোফা থাকা যায় হামে হাল। তলোয়ারের চোটে দল বাড়াবারও মওকা বেশ।

সেই তের শতকের সূচনা থেকেই অযোধ্যা অঞ্চলে বিদেশী আক্রমণকারীদের বাস পত্তন। প্রথম ঔপনিবেশিকরা হল কাসমান্দি কালানের শেখ্‌রা। জগ্‌তাইয়ের শেখদের লক্ষ্মণপুর পরগনায় আড্ডা গাড়া, তাও ওই শতকের গোড়ার দিকে। সাতরিখ্‌ তাদের বড় ডেরা ছিল। সেখান থেকেই দলে দলে আসে এই শেখ্‌রা। এখানে বাহান্নটি গ্রামে শেখ্‌ উপনিবেশ গড়ে ওঠে। সবই গোমতী নদীর উত্তর তীরে।

তের শতকের মাঝামাঝি হাজির হয় বিজনৌরের মুসলমানরা। কাজী আদম তাদের দলপতি। তারপর সেখানে বাসিন্দা হল রামনগরের পাঠানরা। অনেক পরে যেখানে তৈরি হয়েছিল গোল দরওয়াজা, সেই পর্যন্ত তারা দাবী করত জমিদারী। আর তারই পুব দিকে শেখদের দখলদারী সীমানা। তাদের বসতির চারধারে নিমগাছের সারিঘেরা। তাই সে শেখদের নাম হয়ে যায় নিমবরহা শেখ্‌। তাদের অধ্যুষিত এলাকা হল, মচ্ছিভবন থেকে রেসিডেন্সী। '৫৭-র বিদ্রোহের পরে সেসবের চিহ্ন থাকেনি।

তা ছাড়া, সালেমপুরের শেখদেরও আসার পালা ছিল এখানে। তা হল, পনের শতকের শেষ দিক। লক্ষ্ণৌ পরগনা দখল করতে তাদের অবশ্য অনেক সময় লাগে। কারণ রাজপুতদের প্রচণ্ড বাধা ছিল ১৬০০ সাল পর্যন্ত। ওদিকে দিল্লীর মসনদ তো মোগলদের দখলে এসে গেছে অনেক আগেই (১৫২৬)। আরো প্রায় দু'শ বছর পরে, মোগলদের শেষ দশায় অযোধ্যার সুবেদারি পান সাদৎ খাঁ।

ওই নিমবরহা শেখদের পত্তনী থেকেই শেখদের বাড় বাড়ন্ত। এই গোষ্ঠী থেকে একাধিক জন পরে হন অযোধ্যার সুবেদার। লক্ষ্ণৌর মুসলমানী আমলে প্রথম দুর্গও শেখ্‌দের। ওই লিখ্‌না কিলা। এই কেল্লা কিন্তু লিখ্‌না নামে এক হিন্দু স্থপতিরই তৈরি। সে গড় আর নেই। অওধ নবাবদের যেখানে লক্ষ্ণৌর আবাস মচ্ছিভবন সেখানেই ছিল সেই লিখ্‌না কিলা।

প্রথম নবাব সাদৎ খাঁর আমলের লিখ্‌না কিলার নাম বেঁচেছিল। আর অস্তিত্ব

ছিল গড়ের মালিক শেখদেরও। তার আগেকার বোল্‌বোলাও তখন আর নেই। না হলে লিখ্‌না কিলার প্রাসাদ দুটো দখল করতে পারতেন না দ্বিতীয় নবাব সফ্‌দরজঙ্গ্‌।

নিমবরহা গোষ্ঠী তো বটেই। আর প্রায় সব শেখরাই বিদেশী। কেবল কাসমান্দি কালানের শেখ্‌রা অনেকেই নাকি ধর্মান্তরিত হিন্দু।

যাই হোক, শেখদের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে বাড়তে থাকে জনবসতি। লিখ্‌না কিলার আশপাশ্‌ অঞ্চল জুড়ে নতুন করে নগর গড়ে ওঠে। প্রাচীন অযোধ্যার ঐতিহ্যে পূর্ণ ছিল লক্ষ্মণপুর। ক্রমেই সেখানে পড়তে থাকে অর্বাচীন প্রলেপ। বিদেশী উচ্চারনে নাম বদলে যায়। লক্ষ্মৌ শব্দটি চল্‌তে থাকে বিজাতীয় বিধর্মী পরিবেশে।

ত্রেতা যুগের লক্ষ্মণপুর কোন্‌ পর্যায়ে লক্ষ্মৌতে পর্যবসিত, তা অজ্ঞাত। তবে মোগল আমলের আগে নিশ্চয়। যেমন, ১৪৭৮ সালে লক্ষ্মৌ সরকার কাল্‌পির সঙ্গে মিলে যায়। আর বাহ্‌লুল্‌ লোদী তা খয়রাৎ করেন নিজের পোতা আজম্‌কে। তার আগে লক্ষ্মৌ কিছুদিন জৌনপুর সুলতানদের দখলে ছিল।

তারও আগে, মুসলমান অধিকারের প্রথম থেকেই লক্ষ্মৌ অযোধ্যা সুবার মধ্যে। রাজধানী অযোধ্যা নগরীও থাকত অযোধ্যা সুবা বা প্রদেশের মধ্যে। কিন্তু লক্ষ্মৌ নিবাসী কেউ সুবেদার হলে, রাজধানী চলে আসত লক্ষ্মৌতে। কারণ নগররূপে অযোধ্যা রাজ্যে বরাবরই তার গুরুত্ব ছিল। আর প্রাচীন কালাগত লক্ষ্মণপুরের এই স্বীকৃতি। অযোধ্যার এক অঙ্গস্বরূপ লক্ষ্মণপুর।

শেখ পাঠান বসতির চার শ' বছর পরের কথা। লক্ষ্মণপুর লক্ষ্মৌর আড়ালে কত আগে ঢাকা পড়েছে। তখনো কিন্তু প্রাচীন সূত্রের একটু রেশ এখানে ছিল। লক্ষ্মণপুরের একটি স্মারক অবশেষ। সেই লক্ষ্মণটিলার ওপরে পুরানো একটি দেবালয়।

তখন আওরঙ্গজেবের রাজত্ব। একদিন তিনি সফরে এসেছেন এ অঞ্চলে। মন্দিরটি তাঁর শ্যেনদৃষ্টিতে পড়ল। আর ধূলিসাৎ হয়ে গেল তাঁর হুকুমে। তারপর আরেক হুকুমে সেখানেই এক মসজিদ বানানো হল। এটি বিশিষ্ট আলমগীরী কায়দা। হিন্দু দেবস্থান শুধু নিশ্চিহ্ন করা নয়। তারই স্থাপত্য উপকরণে মসজিদ তৈয়ারি করা।

ধর্মপ্রাণ বাদশাহ্‌র আরো আছে এমন পুণ্যকর্ম। তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট হল, কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির ধ্বংস করে সেখানেই মসজিদ গড়া। কিংবা মথুরার কৃষ্ণ জন্মস্থানের মন্দির বিধ্বস্ত করে মসজিদ প্রতিষ্ঠা। ওই একই পদ্ধতিতে, তরবারির দাপটে। যেখানে যেখানে হিন্দুর ধর্মস্থান সেখানেই আলম্‌গীরী অন্ধতার কুঠার।

অযোধ্যা অঞ্চলে তাঁর মহান পূর্বপুরুষ বাবুর এবিষয়ে পথিকৃৎ। রামচন্দ্রের জন্মস্থান বলে যে জায়গাটির প্রসিদ্ধি তার নিকটেই এক প্রকাণ্ড মসজিদ। বাবুর শিকারে এসে সেবার ধন্য করেন আউধকে। মসজিদটি তখনকার। তার গায়ে খোদিত আছে নির্মাণের তারিখ—৯৩৫ হিজিরা। অর্থাৎ ১৫২৮ খৃষ্টাব্দ। তাঁর উত্তর ভারতে আক্রমণ ও অনুপ্রবেশের দু বছর পরের কথা।

কিন্তু এই মসজিদটিতে হিন্দু মন্দিরের নানা পাথর দ্রষ্টব্য। বিশেষ রামের

জন্মস্থানে যেমন কষ্টিপাথর, অবিকল তেমনি ক'টি থাম দেখা যায় বাবুর সমকালীন মসজিদে।

থাক্ বাবুর আর আওরঙ্গজেবদের কীর্তি কাহিনী।

তাঁদের চেয়ে বহু বহু কাল আগেকার লক্ষ্ণৌ বৃত্তান্ত এখন অনুসরণ করা যাক। মোগলদের আগে শেখ্ পাঠানদের বসতি। তাদের পূর্বে এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-দের বাস ছিল। তবে নাতিবৃহৎ তাদের সম্প্রদায়।

লক্ষ্ণৌ নগরীর কেন্দ্রে, মচ্ছি ভবন এলাকার মধ্যে লক্ষ্মণ টিলা। সেখানে আর তার চতুর্দিক ঘিরে ছিল সেই ব্রাহ্মণ কায়স্থদের বসতি। তাঁদের হটিয়ে বিজ্নৌরের শেখরা সেসব জায়গা দখল করে নেয়।

সেই জবর-দখল থেকে লক্ষ্মণপুরে ঐতিহাসিক পালা-বদল, সে তো মাত্র তের শতকের কথা। তখন থেকে সাদৎ খাঁ পর্যন্ত পাঁচটি শতাব্দের ব্যবধান।

কিন্তু শেখদের পূর্ববর্তী লক্ষ্মণ টিলা তথা লক্ষ্মণপুর কতকালের? কোন্ সুদূর অতীতের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন লক্ষ্মণ টিলার আশেপাশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ সম্প্রদায়?

কবেকার সেই লক্ষ্মণপুর? আর তার চেয়েও সুপ্রাচীন অযোধ্যা?

লিপিবদ্ধ ইতিহাসের পরিধি পার হয়ে তা অতি পুরাতন কথায় বা পুরাণে পরিণত।

রামচন্দ্র কিংবা দশরথেরও অনেক পূর্ববর্তী অযোধ্যা। বাল্মীকী রামায়ণের বর্ণনায় মনু হলেন অযোধ্যা পুরীর নির্মাণকর্তা।

সূর্য বংশীয় নৃপতিদের রাজধানী ছিল অযোধ্যা। যুদ্ধে তাঁরা অপরাজেয়। তাই তাঁদের রাজধানীর নাম অযোধ্যা। ভারতীয় নগর সভ্যতার সুপ্রাচীন কাল থেকেই এক সুবিখ্যাত এই জনপদ। কালজয়ী তার ঐতিহ্য।

সেই পুরাকালের স্থান মাহাত্ম্যে পূর্ণ পুণ্যতীর্থ অযোধ্যা। যুগ যুগ যাবৎ ভারতে বরেণ্য হয়ে আছে সপ্ত পুরী। তাদের মধ্যেও তার নাম সর্বাগ্রে—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা,
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা।

স্মরণাতীত যুগের সে অযোধ্যা আবার রামচন্দ্র ও রাম রাজ্যের শ্রুতিতে প্রাণবন্ত। অবতারকল্পী শ্রী রামের মাহাত্ম্যেই এ রাজ্যের এত ব্যাপক প্রসিদ্ধি।

রাম কাহিনীর গৌরবে অমর হয়েছে আদি মহাকাব্য রামায়ণ। তার মধ্যে অযোধ্যাকেও আদি মহাকবি স্মরণীয় রেখেছেন। সে নগরীর অতি সমৃদ্ধ রূপ প্রকাশ পেয়েছে বর্ণনায়। তার উচ্চ অট্টালিকা শ্রেণীতে, ধ্বজে শোভমান রাজবর্ত্ম। নানাপ্রকার বৃত্তিতে নিরত শিল্পীরা। ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদান করে থাকেন। নানা দেশ থেকে বণিকরা আসেন পণ্যদ্রব্যের সম্ভার নিয়ে। রাজপথে প্রত্যহ জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা। পরিচ্ছন্ন পুরী। একটি প্রশস্ত সরণি বহির্দেশের জন্যে প্রসারিত। অন্যান্য বর্ত্ম নগরীর অভ্যন্তরে শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত। সমস্ত পথ বৃক্ষে পুষ্পে সুসজ্জিত। সুষম ব্যবধানে বিপণির সারি। নানাস্থানে পুরনারীদের জন্যে পরিখা-রক্ষিত নাট্যশালা, উদ্যান, আম্রকানন।

কত সামন্তরাজ কর দান করতে উপস্থিত হন মহানগরীতে।

সরযূ নদী তীরের বিস্তৃত জনপদ কোশল নামে সুপরিচিত। অযোধ্যা তার খ্যাতনামা পুরী। তার স্থাপনকর্তা মনু। দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ। ব্যাপ্তিতে তিন যোজন, সুরম্য অযোধ্যা নগরী।

অমরাবতীতে ইন্দ্র। আর মর্তের রাজকীয় ঐশ্বর্যে মহিমায় শ্রীসম্পন্ন এই পুরে রাজা দশরথের নিবাস।

ভারতের আদি মহাকবি সে রাজধানীর পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে।

অযোধ্যার ঐতিহ্যে দাশরথী রাম ও বাল্মীকীর রামায়ণ একসূত্রে গাঁথা। রামায়ণ রচনার কালে রামচরিত্র কালসীমা,ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করেছে। বহুল প্রচারিত হয়েছে মহাভারতে। রামায়ণের নানা কাহিনী ভারতবর্ষের তাবৎ ভাষায় আপামর সাধারণের হৃদয় নিষিক্ত রেখেছে। সবই বাল্মীকি অনুসরণে। ভারতীয় জনচিত্ত এ মহাকাব্যকে অন্তরে স্থান দিয়েছে যুগে যুগে। এমন কি ভারতবর্ষের সীমানা পার হয়ে ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা, মলয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, বালি দ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি এশীয় দেশে দেশে রামচন্দ্রের উপাখ্যান প্রচলিত। তাবৎ গণমানসে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। অবশ্য ভারতের প্রাদেশিক বিভিন্ন সাহিত্যের তুল্য কিছু কিছু পরিবর্তিত রূপের সেসব রাম কাহিনী।

এশিয়া মহাদেশব্যাপী এই জনপ্রিয়তার মূলে রামায়ণের গভীর ভাব সম্পদ, রামচন্দ্র প্রমুখের দেবোপম অথচ মানবিক আবেদনে পূর্ণ চরিত্রাবলী। আর প্রধানত রাম-চরিত্রের মহৎ আত্মিক আদর্শ, যা প্রত্যেক রূঢ় কর্তব্যের আহ্বানেও অবিচলিত, বাস্তবায়িত। রামচন্দ্রের উচ্চ আদর্শবাদ সার্থকতায় মণ্ডিত। সেজন্যেই তা রামায়ণ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে আদি মহাকবিকে। সেই সত্যের অপরূপ ভাষা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, মহাকাব্য রচনা না করেও যিনি আধুনিক কালের মহাকবি—তার 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায়—বাল্মীকি ও নারদের কথোপকথনে—

দেবতার স্তব গীতে দেবেরে মানব করি আনে
তুলিব দেবতা করি মানবেরে মোর ছন্দে গানে।
ভগবন্দ ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে—
কহ মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহ মোরে বীর্যকার ক্ষমারে করেনা অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহা দৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্বদে কে থাকে ভয়ে, বিকাকে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহোত্তম—
কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্য নাম।'
নারদ কহিলা ধীরে, 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম।'

'জানি আমি জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্তিকথা,
কহিলা বাল্মীকী, 'তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে।
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।'

তারপর নারদ মুনির অভয় পেয়ে বাল্মীকীর সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা। রামচন্দ্রের জীবন থেকে সংগৃহীত হল মহাকাব্যের উপকরণ। সেকালের কবি-লেখকের এই মহান সৃষ্টি যে বাস্তব চরিত্রের ভিত্তিতে, তা একালের কবি-লেখকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে। 'ভাষা ও ছন্দ' তারই সাক্ষ্য।

লক্ষ্মৌ-লক্ষ্মণপুর তথা অযোধ্যার ঐতিহ্য কথায় রাম প্রসঙ্গ কি অবান্তর? না। অযোধ্যার শ্রুতি স্মৃতিতে অচ্ছেদ্য, চির জীবন্ত রামচন্দ্র।

রাম-প্রসঙ্গটি এখানে উত্থাপনের হেতু, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এই সিদ্ধান্ত যে, রামায়ণ কাব্য মাত্র। তার কোন ঐতিহাসিকতা নেই। রামচরিত্র অনৈতিহাসিক অর্থাৎ কাল্পনিক! কবির অলীক কল্পনা। রামায়ণে সমকালীন সামাজিক চিত্র কিছু পাওয়া যেত—এই পর্যন্ত!

অতএব, এদেশীয় পণ্ডিত (!) বর্গও তাই সাব্যস্ত করেন। ইংরেজ পদানত যুগের সেই সব গবেষক ও গবেষণা! দাসসুলভ হীনমন্যতার যত স্বাক্ষর।

বৃটিশ বা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ফতোয়া ভারতীয় ঐতিহাসিকরা নির্বিচারে শিরোধার্য করেন কেন?

তার কারণও ঐতিহাসিক! বাস্তব! প্রভু জাতির স্বীকৃতি মিললেই তবে সে ইতিহাস চর্চা বা গবেষণা সার্থক গণ্য হত। উপাচার্য, অধ্যক্ষ কিংবা অধ্যাপক পদ, বৃত্তি, উপাধি, সরকারী সম্মান সব নির্ভরশীল ছিল—বিদেশী শাসক জাতির পণ্ডিত সৃষ্ট মতামত অনুসরণ এবং তাঁদের অনুমোদনের ওপর। তাঁদের সমর্থন বিনা ব্যর্থ, পরিত্যক্ত তাবৎ বিদ্যা, তত্ত্ব, গবেষণা, মতামত।

আরেক কারণ—দাসজাতির হীনমন্যতা-বোধ, যা নিরপেক্ষ বিচার-বিবেচনার শক্তি সাহস হারায়। মান্য করে নেয় ইংরেজ তথা ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ভ্রম প্রমাদও। এমনিভাবে প্রচলিত হয়েছে উদ্ভট, হাস্যকর সব ঐতিহাসিক তত্ত্ব—বৈদিক আর্যদের আদি বাসভূমি মধ্য ইউরোপ! ভারতের যথার্থ আদিবাসী অনার্য দক্ষিণী আর উত্তরীয় সাঁওতাল কোল ভিল মুণ্ডা প্রমুখ! হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো পত্তনকারিরা ভূমধ্যসাগরীয় জাতির মানুষ! ভারতীয় ইতিহাসের তিন বিভাগ—হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ, বৃটিশ যুগ!

তেমনি—রামায়ণ অনৈতিহাসিক! রামচন্দ্র কাল্পনিক!!

তাহলে, কেন সৃষ্টি হল শ্রীরামের জন্মলগ্ন বলে রামনবমী তিথি, যা অগণিত নর-নারীর সুদূর কালাবধি পালনে জাতীয় পুণ্য অনুষ্ঠানে পরিণত? কেন হিমাচলের সানুদেশে লছমণঝুলা, ভরতমন্দির প্রভৃতি থেকে দক্ষিণ প্রান্তে রামেশ্বর ধনুষ্কোটি পর্যন্ত রাম লক্ষ্মণাদির এত অজস্র স্মরক তীর্থস্থান ভারতব্যাপী? অযোধ্যাকেন্দ্রিক সমগ্র উত্তরভারত জুড়ে জনচিত্তে কেন রামচন্দ্রের এমন সপ্রাণ স্মৃতি শ্রুতি? রাম নাম চিহ্নিত তীর্থগুলির স্থাপত্যাদি অর্বাচীন হলেও কেন তাদের স্থানমাহাত্ম্য

সুপ্রাচীন? কেন নিত্য উচ্চারিত সেই পুণ্য নাম সর্বসাধারণের কণ্ঠে, স্বাগত সম্ভাষণে, দুঃখ সুখের পরম ক্ষণে?

এমনি বহু প্রশ্নের একমাত্র সদুত্তর—সুমহান বাস্তব চরিত্র, তার পরম্পরাগত স্মৃতি ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী অবলম্বনেই গঠিত হয় বাল্মীকীর এই মহাকাব্য। ভারতীয় কিংবা গ্রীক সকল এপিকের তুল্য রামায়ণ এপিকও ছিন্নমূল অলীক কল্পনা নয়। মহাভারত যদি বাস্তবভিত্তিক হয়, (ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সার্টিফিকেট অনুসারে!) তাহলে কেন রামায়ণ নয়? শ্রীকৃষ্ণ যেমন ঐতিহাসিক পুরুষ এবং ঈশ্বরের অবতার, তেমনি শ্রীরামচন্দ্রও।

আদর্শ মানব রঘুপতি রাঘব। আদর্শ নৃপতি তিনি। ভারতীয় রাজধর্ম এবং মনুষ্যত্বের আদর্শ তাঁর জীবনের বাস্তবে রূপায়িত। প্রজার সর্বাঙ্গীণ সুখ ও কল্যাণের জন্যই তাঁর রাজত্ব। প্রজার নৈতিক সমর্থনে সে রাজ্যের অস্তিত্ব। আত্ম-সুখ ভোগের জন্যে তাঁর সিংহাসন আরোহণ নয়। কর্তব্য ও ত্যাগভিত্তিক যে রাজ ধর্ম, তারই শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ রামচন্দ্র। তিনি এবং রামরাজ্য জনমানসে একাত্ম হয়ে আছে। 'রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালীন ইতিহাস'—রবীন্দ্রনাথের এই আর্যবাণী সকল অর্থেই সত্য।

অযোধ্যার ঐতিহ্য রামমাহাত্ম্যের সত্যে পূর্ণ।

সুখের বিষয়, কোন বৈদেশিক বা শাসক জাতি ভারতীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা আর নন। স্বাধীন ভারতে জাতীয় সংবিৎ ফিরে আসছে আত্মবিস্মৃতির অন্ধকার যুগ ঘুচিয়ে। তাই অযোধ্যাক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চলেছে প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের জন্যে। রামকাহিনী তথা রাম রাজত্বের 'পাথুরে প্রমাণ' ভূগর্ভ থেকে স্থূলদৃষ্টির গোচরে আসবে, এই আশা।...

আউধের প্রথম নবাব সাদৎ খাঁ থেকে প্রসঙ্গ বহু দূরে উপস্থিত। অতীতের সত্য গৌরব কথা স্মরণের পরে, পরাধীনতার পর্যায়ক্রমে, তুর্ক-পাঠান-শেখ পর্ব অন্তে মোগল উত্তর পুরুষ ও সাদৎ খাঁর ভাগ্যকাহিনী এবার।

এই নতুন পালাবদলের ঐতিহাসিক উপলক্ষ্য—সাদৎ খাঁ। আউধের নবনিযুক্ত সুবেদার, ইরাণী ভাগ্যান্বেষী সাদৎ খাঁ।

অযোধ্যা শহরে লক্ষ্মণঘাটের ধারে নতুন সুবেদারের নতুন সরকারী আবাস তৈরি হল। তিনি সে কোঠির নাম দিলেন—কিলা মুবারক। অযোধ্যার এই নদীর নাম এখন ঘর্ঘরা। ধু ধু বালির আস্তরণে গৈরিক, জেগে-ওঠা চর এখানে! কোথায় সেই দ্বাপরের সরযূ প্রবাহিণী? কে জানে! বালুস্তীর্ণ বিস্তীর্ণ তটিনীতটে সে উত্তর বুঝি বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে ভেসে বেড়ায়—

রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা!…

সেকালের কোশল রাজধানীর লক্ষ্মণঘাটে সাদৎ খাঁর কিলা মুবারক গড়ে উঠল। একটি বিজাতীয় বিধর্মী প্রলেপ। ফয়জাবাদেরও আগেকার নবাবী মহল। লক্ষ্ণৌ নবাব বংশের প্রথম ভিৎ অবধ অঞ্চলে।

আওরঙ্গজেবের সাধনোচিত ধাম প্রাপ্তি ঘটে দূর দাক্ষিণাত্যে (৩রা মার্চ ১৭০৭)। তখন থেকেই মোগল অক্টোপাসেরও নাভিশ্বাস ওঠে। আর সেই দুর্যোগের মধ্যেই সাদৎ খাঁর উন্নতির সুযোগ। তবে সে সময় সাদৎ খাঁ নন—মহম্মদ আমীন। মোগল দরবারী চক্রান্তের এক চতুর চক্রী। অনেক কাণ্ড করে উঠে এসেছেন ওপর দিকে। দিল্লী দরবারের অমন বে-হাল না হলে বরাত খুলত না মহম্মদ আমীনের।

ওদিকে আওরঙ্গাবাদে আলমগীরের কবরে বাতি জ্বলতে লাগল। আর এদিকে দিল্লীতে মোগল শাহীর লাল বাতি জ্বালাতে লাগলেন তাঁর বংশধররা।

তাঁর পুত্র বাহাদুর শাহ্‌র ভাগ্যে জুটল পাঁচ বছরের বাদশাগিরি (১৭০৭-১৭১২)।

বাহাদুরের দফন হবার সঙ্গেই মসনদ দখল নিয়ে মোগলাই হানাহানি বেধে গেল। সেই বংশানুক্রমিক কায়দা—আত্মজনদের খুন জখম করে তখ্‌তে বসা। তারপর নিজের ভোগসুখের জন্য রাজ্য শাসন। রাজ্য হাতানো আর চালানো সবই তলোয়ারের খেল্! তুর্কী পাঠান মোগল সব আমলের এক শাহী দস্তুর।

এবার মোগলাই ভাই ভাই কাটাকাটিতে আওরঙ্গজীবের পোতা আজিম্ উশ্‌শান মারা পড়লেন। কোনরকমে মসনদ দখল করলেন তাঁরই বড় ভাই, আধ-পাগলা জাহান্দার শাহ্।

তাঁর দশমাসের বাদশাহী তো আহাম্মকির চূড়ান্ত। দিল্লীর এক বাজারে-রূপসী লাল কুঁয়ার হলেন তাঁর খাস বেগম। তাঁকে নিয়ে জাহান্দার যা ঢলাঢলি করলেন, লালকেল্লায় আগে তার জুড়ি মেলেনি।

তারপর জাহান্দারের গর্দান নিলেন ভাতিজা ফর্‌রুখ্‌শিয়র। আজিম্ উশ্‌শানেরই পুত্র তিনি। তাঁর বাদশাহী পালা শুরু হল। সৈয়দ আবদুল্লা আর সৈয়দ হুসেন আলীর মদতে তিনি পান মসনদ। ওই দুজন সৈয়দ ভ্রাতা নামে ইতিহাসে পরিচিত। যেমন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, তেমনি কুচক্রী, নৃশংস স্বভাব। যেমন লোভী স্বার্থান্বেষী, তেমনি বিবেকহীন উচ্চাভিলাষী দুজনেই। দিল্লী শাহীর ক্ষমতা তখন তাঁদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। নতুন বাদশাহ্ তাঁদের হাতের পুতুল।

তখ্‌ৎ-এ-তাউসে বসেই নিজের হাল মালুম হল ফর্‌রুখ্‌শিয়ারের। আবদুল্লা আর হুসেন আলীর মতলব মাফিক চলতে হবে জবরদস্ত পাল্লায় পড়েছেন বাদশাহ্।

তাঁদের কব্‌জা থেকে একটু বেরুবার চেষ্টা করলেন ফর্‌রুখ্‌শিয়ার। সৈয়দ ভাইরা অমনি মোগলাই দাওয়াই দিলেন। আগে উপ্‌ড়ে ফেলা হল ফর্‌রুখ্‌শিয়রের দুই চোখ। আর তিরপোলিয়া অর্থাৎ তিন ফটকের ওপরে খুপরিতে তিনি কয়েদ রইলেন। মসনদ থেকে সেই অন্ধকার গহ্বরে। সেখানে আসবাব বলতে তিনটি পাত্র মাত্র। একটিতে খাদ্য। একটিতে পানীয় জল। আরেকটি শৌচের জলের জন্যে। ইতিহাসের কি ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ। পাঁচ বছর আগে সেই কামরাতেই প্রাণ হারান আগের বাদশাহ্ জাহান্দার। ফর্‌রুখ্‌শিয়ারেরই হুকুমে চাচার জান্ যায়। এবার জল্লাদের কুড়ুল চলল ফর্‌রুখ্‌শিয়রেরই ওপর। অন্ধ করে কুপিয়ে শেষ করা হল। তাঁর পাঁচ বছরের বাদশাহী খতম্ করে দিলেন (১৭১৮) দুই সৈয়দ।

দিল্লী দরবারে দুই সৈয়দের আসল বাদশাহী চলতে লাগল। আর এক সাজানো বাদশাহ্ আসা যাওয়া করে গেলেন মসনদে।

মোগল পরিবারের দুটি মৃত্যুপথযাত্রী ছিলেন রফি উদ্দৌরাৎ আর রফি উদ্দৌলা। দুজনেরই বয়স একুশের নীচে। সৈয়দ ভাইরা সে দুজনকে তাজ মাথায় সাজিয়ে, দিল্লীর মসনদে বসিয়ে দিলেন। একজন তিন মাস ন'দিন। আরেক জন চার মাসের বাদশা। তারপরই কবরে।

তারপর সৈয়দরা তখ্তে আনলেন রোশন আখ্তারকে। জাহান্দার, আজিমুস-শানের ছোট ভাই খুজিস্তা আখ্তারের ছেলে। সতের বছর বয়সী রোশন আখ্তার। মোগল সম্রাট হলেন মহম্মদ্ শাহ্ নামে। আওরঙ্গজেবের এক প্রপৌত্র।

তাঁর এত অল্প বয়স। তা ছাড়া, ব্যক্তিত্ব কিংবা যোগ্যতা কিছুই ছিল না। হয়ত সেজন্যেই সৈয়দরা বাদশাহ্ বানালেন রোশনকে। কিন্তু কি বরাতের ফের! তিনিই টিঁকে গেলেন। সেই ১৭১৯ থেকে ১৭৪৮ পর্যন্ত, প্রায় ত্রিশ বছর। তবে নিজের জোরে নয়, ঘটনাচক্রে। তার মধ্যে আবার কি আপদের বোঝা মাথায় নিয়ে একেক সময়। দিল্লীতে নাদির শাহী তাণ্ডব যেমন। শেষ মোগলাই ঠাট বাট চূর্ণ করা সেই মহামারী। নাদিরের দিল্লী আক্রমণের জন্যে ঐতিহাসিক হয়ে আছে মহম্মদ শাহ্র আমল। নচেৎ ব্যক্তিত্বহীন এই বাদশাহ্র ইতিহাসে ঠাঁই মিলত না।

তবে তাঁর নাম বেঁচে আছে দরবারী সঙ্গীতের জগতে। গুণী সমাবেশে ধন্য তাঁর সংগীতের দরবার। দুজন তাঁদের মধ্যে দিকপাল কলাকার। তানসেনের পুত্রবৎ-শীয় ধ্রুপদী গোলাব খাঁ। আর সেনীয়া বীণকার সদারঙ্গ। তানসেনের দৌহিত্র পরম্পরায় তিনিও ধ্রুপদ-গুণী। কিন্তু বহু উৎকৃট খেয়াল বন্দিশেরও রচয়িতা সদারঙ্গ। তাঁর দুই গায়ক পুত্র সদারঙ্গ, মহারঙ্গও মহম্মদ শাহ্র দরবারী।

সদারঙ্গ তাঁর রচিত নানা গানে 'মহম্মদ শাহ্ রঙ্গিলে' নামে সম্বোধন করেছেন তাঁর পোষক বাদশাহ্কে। সদারঙ্গ তাঁর উপাধি বিশেষ। আসল শ্যামৎ খাঁ। সংগীতে রঞ্জিনী শক্তির জন্যে তাঁকে মহম্মদ শাহ্-ই এই মহা সম্মানের খেতাব দেন—শাহ্-সদারঙ্গ। তারপর থেকে সংগীতজগতে তিনি সদারঙ্গ নামেই স্মরণীয় রয়েছেন। তাঁর রচনা নানা খেয়াল গানেও ধ্বনিত হয়ে থাকে মহম্মদ শাহ্র নাম। তাঁর তুল্য সংগীতপ্রেমী মোগল বাদশাকুলে আর কেউ ছিল কিনা সন্দেহ, আকবরের নাম মনে রেখেও বলা যায়। হয়ত সংগীতপ্রীতির আতিশয্যেই মহম্মদ শাহ্ প্রধানা বেগম করেন উধম বাইকে। দিল্লীর এই বাইজীর তখন নাম হয় কুদসিয়া বেগম।

আউধের দ্বিতীয় নবাব সফ্দরজঙ্গের কথায় কুদসিয়া বেগমের কিছু পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে।

মহম্মদ শাহ্র বিবরণ সবিস্তারে বলার কারণ, তাঁর সঙ্গেই জড়িত মহম্মদ আমীনের প্রসঙ্গ। মহম্মদ শাহ্-ই সুবেদারী দেন মহম্মদ আমীন বা সাদৎ খাঁকে। বাদশাহ্র একজন বিশিষ্ট দরবারী তখন মহম্মদ আমীন। আবার সেই সৈয়দ ভ্রাতাদের সঙ্গেও মহম্মদ আমীনের দহরম্ মহরম্ ছিল। এমন কি, সৈয়দের দলেরই একজন ছিলেন মহম্মদ আমীন। তারপর কি ভাবে সে দল ছেড়ে তাদের বিরুদ্ধ পক্ষে চলে যান সেসব ঘটনাও দিল্লী দরবার আর মহম্মদ আমীনের স্বার্থের সঙ্গে জড়ানো। বাদশাহ

মহম্মদ শাহ্, সৈয়দ ভাইরা, নাদির শাহী আক্রমণ সব কিছুর সঙ্গে অচ্ছেদ্য মহম্মদ আমীনের সূত্র। আর অযোধ্যায় তাঁর বংশগত সুবেদারী বা নবাবীর পত্তনও।

মহম্মদ শাহ্ তো সৈয়দ ভাইদের মসনদে বসেছিলেন। তাই তাজ মাথায় পরেই মালুম হয়েছিল নিজের আসল হাল। ঠিক ফর্রুখ্শিয়রেরই মতন। তবে ফর্রুখের চেয়ে তাঁর বরাত ভাল ছিল। তাই জান্ বেঁচে যায় সৈয়দদের খপ্পর থেকে।

ক'বছরের মধ্যেই নিজের অসহায় অবস্থাটা মহম্মদ শাহ্ সামলে নেন। তবে একা কায়দা করতে পারতেন না আবদুল্লা আর হুসেন আলীকে। জবরদস্ত তিন দরবারীর মদত্ এ ব্যাপারে তিনি পান। তাঁদের একজন হলেন মহম্মদ আমীন।

অথচ কিছুদিন আগেও মহম্মদ আমীন ছিলেন সৈয়দদের দলে।

বিচিত্র ঘটনা আর দুর্ঘটনায় ভরা আমীনের জীবন। আর মোগল শাহীর সেই হাল্চালের মধ্যে তাঁর ধাপে ধাপে উন্নতির পর্ব।

পুরো নাম মীর মহম্মদ আমীন। দিল্লীর দরবারী চক্রে বিস্তর মাথা খাটিয়ে, হুজ্জতি করে তাঁকে ঢুকতে হয়। কারণ তিনি তো একেবারে বাইরেকার লোক। বিদেশী।

তাঁর বংশ কথাও একটু বলতে হয় আগে। সে পারিবারিক পরিচয়ে গৌরবের কথা আছে।

সেজন্য প্রথমে দিল্লী পার হতে হবে। ছাড়িয়ে যেতে হবে হিন্দুস্থানেরও সীমানা। সুদূর মেসোপটেমিয়ার নজফ শহরে পেঁছিতে হবে। মহম্মদ আমীনের চার পুরুষ আগে।

সে সময়টি হল ষোল শতকের প্রথম দিকের কথা। নজফকে তখন মীর শাম্স্-উদ্দীন নামে এক বৃদ্ধ বাস করতেন। তিনি সৈয়দ বংশীয়। তাঁর বংশ পরিচয় এইরকম—

শাম্স্উদ্দীন হলেন মুসা কাজিমের একুশ পুরুষ পরে। আর মুসা কাজিম আলী পরিবারের সপ্তম ইমাম অর্থাৎ ধর্মগুরু। শীয়া সম্প্রদায়ে বহুমান্য আলী বংশ।

মীর শাম্স্উদ্দীনকেও সেই হিসাবে সকলে মানতেন। তখন পারস্যের রাজা শাহ্ ইসমাইল সাফাউয়ি (১৫৯৯-১৬২৩)। তিনি খুরসান প্রদেশের ন্যাসাপুরে কাজী বা বিচারক করলেন শাম্স্উদ্দীনকে।

ভাল আয়ের জায়গীর পেয়ে শাম্স্উদ্দীন ন্যাসাপুরে বাস করতে লাগলেন।

তাঁর সাত ছেলে। বড়র নাম মহম্মদ জাফর। সকলেরই নামের সঙ্গে থাকে, মীর।

জাফরের দুই ছেলে। মীর মহম্মদ নাসের ও মীর মহম্মদ ইউসুফ। তাঁদের পারস্যের তখ্তে ছিলেন, দ্বিতীয় শাহ্ আব্বাস (১৬৪১-১৬৬৬)।

মীর ঘরানার বরাতে শাহী নেকনজর মিলে যায়। মীর নাসেরের কোন কাজে খুব খুশি হন শাহ আব্বাস। উজীর রেজা কুলি বেগের মেয়ের সঙ্গে নাসেরের সাদি দিয়ে দেন। কিজিলবাস তুর্ক জাতীয় নেতা ছিলেন রেজা কুলি বেগ। তাঁর দামাদ হয়ে নাসেরের বৈষয়িক উন্নতির রাস্তা খুলে গেল।

সেই মীর মহম্মদ নাসেরের দুই ছেলে, দুই মেয়ে। ছেলেদের নাম মহম্মদ বাকর ও মহম্মদ আমীন। যে মহম্মদ আমীন হন আউধের প্রথম নবাব।

তাহলে নজফের মীর শাম্‌স্‌উদ্দীনের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ মীর মহম্মদ আমীন। আর সপ্তম ইমাম মুসা কাজিম থেকে প'চিশতম।

খুরাসানের সেই ন্যাসাপুরে মহম্মদ আমীনের জন্ম। আনুমানিক ১৬৮০ তাঁর জন্ম সন। আমীনের প্রথম যৌবনের একটি কথা জানা যায়। তিনি ভালভাবে রপ্ত করেছিলেন লড়াইয়ের কায়দা কানুন।

তখনই মহম্মদ আমীনের দিকে সকলের নজর পড়ত। তাঁর যেমন পালোয়ানী বলিষ্ঠ শরীর, তেমনি বেপরোয়া স্বভাব। আর যুদ্ধের জবানও দস্তুর মত।

ক্রমে শেষ হল ১৭০৭ সাল। মহম্মদ আমীনের বয়স তখন সাতাশ-আটাশ বছর। এমন সময় মীর পরিবার বিপাকে পড়লেন।

সাত শ' বছরের সাফাউয়ি খানদানের তখন অন্তিমকাল। রাজ্যেও ঘনিয়ে এসেছে নানা রকমের বিশৃঙ্খলা। প্রজাদেরও অশান্তি আর দুর্দিন চলছে। আকাল। জিনিসপত্র, খাবার-দাবারের অভাব। নিরাপত্তা নেই।

শাম্‌স্‌উদ্দীনের বংশধররা এতদিন ছিলেন বেশ সচ্ছল। বহাল তবিয়তে। রাজ-অনুগ্রহের ছায়ায় বেশ নিশ্চিন্তে দিন গুজরান হত। আগামী কাল কি হবে এমন দুর্ভাবনা পোহাতে হয়নি কোনদিন। কিন্তু এখন, রাজ্যের অনেকেরই মতন, তাঁদেরও দুঃসময়ে পড়তে হল।

পরিবারের কর্তা তখন মহম্মদ নাসের। মহম্মদ আমীনের বাবা। তাঁর তখন বয়স হলেও শরীরে সামর্থ্য ছিল যথেষ্ট। আর মনেরও জোর খুব। উন্নতির জন্যে ঝুঁকি নেবার, কোন বিদেশে পাড়ি দেবার মতন সাহসও ছিল। ভাগ্য বদলাতে চাইলেন নতুন করে।

মহম্মদ নাসের ঠিক করলেন। এদেশে থেকে আর ফয়দা নেই। ইরাণ ছেড়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এখানে থাকলে আখেরে কিছু হবে না। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? এই নিয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন ছেলেদের সঙ্গে। কথায় কথায় একটি মুলুকের নামই এসে পড়ল।

হিন্দুস্থান! সোনা চাঁদির দেশ। নসীব ফেরাবার এমন মজার মুলুক দুনিয়ায় আর আছে নাকি? তুর্কি থেকে কাবুল পর্যন্ত কত ফকির, লুঠেরা, লড়াকু, এলেমদার হিন্দুস্থানে এসে আমীর বনে গেছে! ওখানেই যাওয়া যাক বরাত ঠুকে। ওদেশে এখন শীয়াদের পক্ষে সময়টাও ভাল। শীয়ারা যাঁর দু'চোখের বিষ সেই আলমগীর বাদশাহ্‌র দফন হয়ে গেছে। আরো খবর, নতুন বাদশাহ্‌ বাহাদুর শাহ্‌ পসন্দ্‌ করেন শীয়াদের। এমন কি নিজের খেতাবের মধ্যে সৈয়দও তিনি জুড়ে দিয়েছেন।

ভেবে চিন্তে ন্যাসাপুরের আস্তানা ওঠালেন মীর মহম্মদ নাসের। বড় ছেলে মহম্মদ বাকরকে নিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে পাড়ি দিলেন। প্রথমে এলেন ইরাণের দক্ষিণ সীমানা বরাবর। সে যাত্রাটা বড়ই কষ্টকর। পরে তার এক বন্দর থেকে দুজনে জাহাজে উঠলেন। লম্বা দরিয়া শেষ করে পেঁছিলেন হিন্দুস্থানের পুবদিকে।

বাংলার কূলে।

কিন্তু ছোট ছেলে মহম্মদ আমীন ন্যাসাপুরেই রইলেন। দিন গুনতে লাগলেন চাচা অথচ শ্বশুর মহম্মদ ইউসুফের সঙ্গে থেকে। হিন্দুস্থান থেকে কবে সুখবর আসবে, তা-ই একমাত্র আশা।

এদিকে মহম্মদ নাসের আর বাকর বাংলা থেকে বিহারের পাটনায় এলেন। বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদার তখন মুর্শিদ কুলি খাঁ। তাঁর জামাই শুজাউদ্দৌলা। তাঁর পূর্বপুরুষও আসেন ইরাণ থেকে। তাই এ ধরনের আগন্তুকদের শুজাউদ্দৌলা মদত দিয়ে নাম করেন।

তাঁর সুপারিশে সপুত্র নাসের পেলেন মদত-ই দামাশ্। অর্থাৎ সাহায্য ভাতা। নাসের আর বাকর পাটনাতেই রয়ে গেলেন। কিন্তু অনেক দিন খবর পাঠাতে পারলেন না ন্যাসাপুরে।

তখন মহম্মদ আমীন আর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরও লক্ষ্য—হিন্দুস্থান।

১২০৯ সালে তিনি হাজির হলেন পাটনায়। জানতে পারলেন এর মধ্যে পিতার মৃত্যু হয়েছে। তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে বাড়ির কাছেই।

কিছুদিন পাটনায় থেকে হালচাল ভাল বোধ হল না মহম্মদ আমীনের। উচ্চাভিলাসী তিনি। বুঝলেন, পাটনায় কোন আশা নেই উন্নতির। তাই বড় ভাই মহম্মদ বাকরকে নিয়ে তিনি দিল্লী যাত্রা করলেন। দিল্লীই তো আসল জায়গা। বাদশাহ্ থেকে রাজ্যের আসল মাথা সব সেখানেই।

তবে দিল্লীতে মহম্মদ আমীনের জানাশোনা কেউ ছিল না। তা হোক। দিল্লীর মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন দু ভাই। উন্নতি এখান থেকেই করতে হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না মহম্মদ আমীনের।

মোগল রাজধানীতে বছর খানেক দুজনের বড় কষ্টে দিন কাটল। একটি সামান্য কাজ জুটেছিল এক আমীনের কাছে। সেখানেই মাথা গুঁজে. তেমন তেমন কাজের বিস্তর ধান্দা করলেন তারা। তারপর কাজ পেলেন, এলাহাবাদের কারা মাণিকপুরে।

ফৌজদার সারবুলান্দ খাঁর কাছে চাকরি মিল্‌ল। এই কাজ পাবার একটি কারণ, সারবুলান্দ খাঁও ইরাণী শিয়া।

মহম্মদ আমীন নিযুক্ত হলেন নতুন মনিবের মঞ্জিল। অর্থাৎ শিবির তত্ত্বাবধায়ক। এ পদের সঙ্গে লড়াইয়ের সংস্রব আছে। সুতরাং কাজে উৎসাহ পেলেন মীর মহম্মদ আমীন।

তা হল ১৭১০ সালের জুলাই মাসের কথা। আওরঙ্গজেবের পরে তখন বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্‌র আমল চলেছে। তাঁর তৃতীয় পুত্র আজীম উশ্‌শানের খুবই নাম ডাক। আলমগীরের আমলে তিনি ছিলেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদার।

সেই খোঁটার জোর ছিল সারবুলান্দ খাঁর। আজিম্ উশ্‌শানের পেয়ারের লোক তিনি। বাদশাহ্‌জাদার নেকনজরের জন্যেই সারবুলান্দের ফৌজদারী জুটেছিল। এসব খবরাখবর নিয়েছিলেন মহম্মদ আমীন।

বাহাদুর শাহ্‌র বয়স হয়েছিল। বাদশাহী পান তো বুড়ো হয়ে। তাই পাঁচ

বছরের বেশি আয়ভোগ হল না।

তাঁর মৃত্যুতে (১৭১২) আবার ওলটপালট হয়ে গেল দিল্লী শাহীতে। মসনদ নিয়ে মোগলাই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব বাধল। আর সেই লড়াইয়ে জান প্রাণ খোয়ালেন আজিম উশ্‌শান (১৭ই মার্চ, ১৭১২)।

জাহান্দার শাহ্‌ খতম করলেন ভাই আজিম উশ্‌শানকে। তাজ মাথায় ময়ূর সিংহাসনে বসলেন। অমনি ফৌজদার সারবুলান্দ খাঁও ডিগবাজী খেয়ে ফিরে গেলেন বাদশাহ্‌ জাহান্দারের দরবারে। এতকাল তার মুরুব্বি অন্নদাতা ছিলেন আজীম উশ্‌শান। কিন্তু তাতে কি! অত মনে রাখলে কি মোগল আমলে উন্নতি করা যায়। নিমকহারামির পরিচয় দিলেন জাহান্দার শাহকে কোর্ণিস করে। নগদা বখ্‌শিশ মিলল—গুজরাট সুবাদারের সহকারীর পদ। নতুন বাদশাহ্‌র কাছে মহম্মদ আমীন কিছুদিন দিল্লীতে বাস করলেন। তারপর নতুন কাজে যোগ দিতে এলেন আহমেদাবাদে। কারা মাণিকপুর থেকে আহমেদাবাদে। বরাবর তার সঙ্গে সঙ্গে এসে মহম্মদ আমীনও পেঁছিলেন। তিনি তো সারবুলান্দ খাঁর মীর মঞ্জিল। সময়টি হল ১৭১২ সালের নভেম্বর মাসে।

মজিব সারবুলান্দের সাক্ষাৎ উদাহরণে মহম্মদ আমীন রীতিমত অভিজ্ঞ হলেন। রাজনৈতিক ঘনঘটাপূর্ণ সেসব দিন। দিল্লী শাহীর ব্যাপার দেখলেন কাছ থেকে। দরবারী আর বাদশাহী উত্থান পতনের লীলা তাঁর মালুম হল। আবার প্রত্যক্ষ করলেন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের চরিত্র মাহাত্ম্য। আদর্শ ভাগ্যান্বেষীর কর্তব্যে হাতে-নাতে তালিম পেলেন। মহম্মদ আমীন নিজেও তারই একজন। সুতরাং স্থির করলেন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা।

আহ্‌মেদাবাদে পড়ে থাকতে তার মন উঠল না।

সারবুলান্দ্‌ খাঁর চাকরি ছেড়ে দিলেন মহম্মদ আমীন। ১৭১৩ সালের গোড়ায় খুদ দিল্লীতে এসে জম্‌লেন। সেখানে কিছু জানাশোনা হয়েছিল এর মধ্যে।

রাজধানীতে আবার বাদশাহ্‌গিরির ভোল্‌ পাল্‌টাল। লাল কুঁয়ারের সঙ্‌-সাজা জাহান্দারকে কোতল করে তখ্‌তে বসলেন ফর্‌রুখ্‌শিয়র। বাবা আজিম উশ্‌শানকে শেষ করার শোধ নিলেন।

করিৎকর্মা মহম্মদ আমীন জুটে গেলেন নতুন বাদশাহের দলে। লাল কেল্লার হাওয়ায় তখন কেবল ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতা। সৈয়দ ভাইদের ওপর ভর দিয়ে বাদশাহী পেয়েছেন ফর্‌রুখ্‌শির। এখন তাঁদের খপ্পর থেকে বেরুবার চেষ্টা করছেন। তৎপর হয়েছেন নিজের দল নিয়ে। কিন্তু তার চেয়েও ধূর্ত আর চক্রী সৈয়দরা। ফর্‌রুখ্‌শিয়রকে তাঁরা বেকায়দায় ফেলতে লাগলেন।

দরবারে এমনি টানাপোড়েন চলেছে। ঘোলা জলে কাজ হাসিলের উর্বর কাল। তারই এক ফাঁকে তালেবর মহম্মদ আমীন এক হাজারী মনসবদার বন্‌লেন। ফর্‌রুখ্‌-শিয়রের এক দোস্ত মহম্মদ জাফর। তাঁকে মুরুব্বি ধরে মহম্মদ আমীন ঢুকে পড়লেন দরবারে। উন্নতির এই প্রথম ধাপ।

তারপর সৈয়দরা ফর্‌রুখ্‌শিয়রকে খতম করলেন। দুটি অল্পায়ু মোগল বংশধরকে মসনদে বসালেন পর পর। শেষে রৌশন আখ্‌তারের মাথায় তাজ চড়ালেন

(২৪শে সেপ্টেম্বর ১৭১৯)।

এই বছর খানেক দর্শক হিসাবে বসে থাকেননি মীর মহম্মদ আমীন। ফররুখ্-শিয়রের ভরাডুবি আন্দাজ করে তিনি সৈয়দ ভাইদের দিকে ভিড়ে যান। দলত্যাগ করেন ঠিক উপযুক্ত সময়ে।

আবদুল্লা আর হুসেন আলীর মতনই সৈয়দ এবং শীয়া তো তিনি। তাই সৈয়দ ভাইদের পক্ষে মিলে যেতে মহম্মদ আমীনের বেশি অসুবিধা হয়নি। তাঁর কূটনীতিক চাতুর্য, সামরিক বুদ্ধি আর আদব-কায়দাও খুশি করেছিল সৈয়দদের। সুতরাং তাঁকে হুসেন আলী অনুগ্রহ করলেন। মাত্র দশ দিন আগে তাঁরা মসনদে বসিয়েছেন মহম্মদ শাহ্‌কে। এবার মহম্মদ আমীনকে আগ্রা প্রদেশের হিন্দুয়ান-বিয়ানা জেলার ফৌজদারী দিলেন।

জয়পুর ভরতপুর অঞ্চলের একটা গুরুত্বপূর্ণ জেলা সেটি। এখানে কর্তৃত্ব পাবার ছ' মাসের মধ্যেই লড়াই-ক্ষমতা দেখালেন মহম্মদ আমীন। বিদ্রোহী জমিদারদের চূর্ণ করলেন। পুরস্কার হিসাবে পেলেন দেড় হাজারি মনসবদারি। মুরুব্বির জোরও অবশ্য ছিল। সৈয়দ হুসেন আলীর বিশ্বাসের পাত্র মহম্মদ আমীনের ভাগ্য-রতি তখন উদয়ের পথে।

সৈয়দ ভাইদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা।

উল্কার গতিতে উঠেছিলেন সৈয়দরা। কিন্তু এক বছরের মধ্যে সে উত্থান রহিত হয়ে এল। দরবারে গড়ে উঠতে লাগল শক্তিশালী বিরোধীপক্ষ। নতুন বাদশাহ্‌র সহানুভূতিতে তারা পরিপুষ্ট হল।

সৈয়দদের কবল থেকে বেরিয়ে গেলেন নিজাম্ উল্ মুল্‌ক্। (আলম্‌গীরের সময় তিনি প্রথম নিযুক্ত হয়েছিলেন)।

নিজাম এবার ঘাঁটি গাড়লেন নর্মদার দক্ষিণে।

তারপরের ঘটনাগুলো দ্রুত ঘটে গেল।

ছোট সৈয়দ হুসেন আলীর বখ্‌সী দিল্‌ওয়ার খাঁর হত্যা। সৈয়দ দলের আসীরগড় কিলদারের ঘুষ খেয়ে বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ। সৈয়দের আত্মীয় আলম্ আলীর ধ্বংস। ক মাসের মধ্যেই এসবের ফলে সৈয়দ ভাইদের ভাগ্যচক্র ঘুরে যায় উল্টো দিকে। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লা আর হুসেন আলীরও উচ্ছেদ। পতন রোধ করতে তাঁরা দস্তুরমত চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তবু কেন যে উৎসন্ন গেলেন সেসব বিবরণ এখানে অবান্তর।

শুধু মহম্মদ আমীন সম্পর্কে একটি দরকারী তথ্য আছে। অন্নদাতা সৈয়দদের দুর্দিনে সে-দল ছেড়েছিলেন তিনি। আর তাঁদের শত্রুপক্ষে যোগ দিয়ে যে দুশমনি করেন তাও বল্‌বার মতন। যাঁর অনুগ্রহে তাঁর এ যাবৎ উন্নতি হয়ে এসেছে সেই হুসেন আলীর হত্যাকাণ্ডেও হাত লাগান। সৈয়দ ভাইদের খতম করে লুঠ করা করা হয় তাঁদের শিবির। সে ধন দওলতেরও ভাগদার মহম্মদ আমীন হয়েছিলেন।

সৈয়দ আবদুল্লা আর সৈয়দ হুসেন আলী ধ্বংস হলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মহম্মদ শাহ। উৎসব পালন করতে দিওয়ান-ই-খাসে সাড়ম্বরে দরবার বসালেন (৯ অক্টোবর, ১৭২০)। সে দরবারে দলীয় চরদের জন্যে ঘোষণা করা হল নতুন

পদ অর্থাৎ পুরস্কার।

মহম্মদ আমীন উপাধি পেলেন সাদৎ খাঁ বাহাদুর। অর্থাৎ সৌভাগ্যের অধিপতি! সেই সঙ্গে পাঁচ হাজারি মনসবদারের পদ। মাত্র এক বছর আগে ছিলেন হিন্দুয়ান-বিয়ানা জেলার ফৌজদার। দুঃসাহসিক বেইমানীর জন্যে মহম্মদ আমীনের এই অভাবিত পদোন্নতি। তাঁর অনেকদিনের খোয়াব এবার সত্য হতে লাগল।

তারপর থেকে মহম্মদ শাহর এক ঘনিষ্ঠ দরবারী হলেন সাদৎ খাঁ। তাঁর অগ্রগতি এবার দ্রুততর হল।

ওই বছরেই তিনি পেলেন আগ্রা প্রদেশের ফৌজদারি। সেই সঙ্গে হাতি, ঘোড়া আর খেলাৎ উপহারও।

তার দু বছর পরেই সাদৎ খাঁর জীবনে সবচেয়ে গৌরবের দিন এল। আউধ বা অযোধ্যা সুবার সুবাদার হলেন সাদৎ খাঁ (১৭২২)।

অযোধ্যার নবাবীর পত্তন ওই বছর থেকে ধর্তব্য।

যেখানে একদিন রাম রাজত্বের পত্তন হয়েছিল, অনেক পালা বদলের পর সেখানে আরেক হিসাবের রাজত্ব শুরু হল। তাঁর সুবাদারিতে কার্যত স্বাধীন এক নবাব বংশ দেখা গেল এই প্রাচীন রাজ্যে।

সেই অযোধ্যার লক্ষ্মণঘাট এলাকায় কিলা মুবারক তৈরি করলেন সাদৎ খাঁ। সেখানেই তাঁর প্রধান দফতর বসল। আর তিনি বেশির ভাগ বাস করতে লাগলেন দিল্লীতে। মহম্মদ শাহ্‌র দরবারে তখন সাদৎ খাঁর দস্তুরমত প্রতিপত্তি। এত বড় সুবার সুবাদার। তাছাড়া, বাদশাহ্‌র বিশেষ আস্থাভাজনও।

তবে সাদৎ খাঁর সরকারী আবাস অযোধ্যাতেই রইল। নতুন তৈরি তাঁর সেই কিলা মুবারকে।

তাঁর আমলে ফয়জাবাদ কিংবা লক্ষ্ণৌর সঙ্গে সম্পর্ক সামান্যই ছিল। শুধু শিকারের জন্যে একটি বাংলো করেন ফয়জাবাদে। আর লক্ষ্ণৌর লিখ্‌না কিলার মধ্যে দুটি কোঠি ভাড়া নেওয়া থাকে। তাদের নাম পাঁচ মহল আর মুবারক মহল।

মোগলদের মধ্যে প্রথম অযোধ্যা দখল করেছিলেন বাবুর। তাঁর আমলের একটি চিহ্ন অযোধ্যা নগরে রাখা আছে। রামের জন্মস্থানের কাছেই এর মসজিদ। কাফেরদের দেবালয়ের অনেক পাথর নিয়ে সে মসজিদ তৈরি।

বাবুরের সময় থেকেই অযোধ্যা প্রদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অংশ। তাকে অতি মূল্যবান গণ্য করা হত। কারণ তার ভূমি যেমন উর্বরা তেমনি সুষম স্বাস্থ্যকর জলবায়ু। সেই সঙ্গে তার ভৌগোলিক অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ।

সাদৎ খাঁ যখন সুবাদার হলেন, প্রদেশের সর্বত্র তখন মোগল শাসন ছিল না। অনেক জায়গায় কর্তৃত্ব থাকে জমিদারদের হাতে। সাদৎ খাঁ অবস্থা ঘুরিয়ে দিলেন। একে একে তাঁদের কব্জা করে নিলেন তিনি। বাদশাহ্‌র নামে দস্তুরমত শাসন শুরু করলেন।

খুশি হয়ে মহম্মদ শাহ্‌ তাঁকে নতুন খেতাব দিলেন—বুরহান-উল্‌-মুল্‌ক্‌ (১৭২৩)।

PATHAGAR

মীর মহম্মদ আমীনকে তখন থেকে সাদৎ খাঁ বুরহান-উল-মুল্‌ক্‌ ন্যাসাপুরীও বলা হত।

তার পরের বছর (১৭২৪) একটি পারিবারিক কাজ করলেন সাদৎ খাঁ। সেই ন্যাসাপুর থেকে ভাগিনা মীর্জা মকিমকে আনালেন। তাঁকে রাখলেন ফয়জাবাদে। তারপর নিজের বড় মেয়ে সদরুন্নিসা বেগমের সঙ্গে মীর্জা মকিমের বিবাহ দিলেন।

আর কিছুদিনের মধ্যেই জামাতা-ভাগিনাকে নিযুক্ত করলেন আপন সহকারী (সুবাদার)। মীর্জা মকিম 'আবুল মনসুর খাঁ' খেতাবে ভূষিত হলেন।

সাদৎ খাঁর পরে আবুল মনসুর খাঁ-ই হয়েছিলেন আউধের দ্বিতীয় নবাব সফদর-জঙ্গ। কারণ সাদৎ খাঁ অপুত্রক। সফ্‌দরজঙ্গ উপাধির সঙ্গে মীর্জা মকিম আউধের সুবাদারিও পান আর পেয়েও হারান মোগল বাদশাহ্‌র উজীরী। সেসব অনেক পরের কথা। বুরহান-উল্‌-মুল্‌কের বৃত্তান্ত এখনো কিছু বাকি।

অযোধ্যার সুবাদার হওয়া থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত সাদৎ খাঁর যুদ্ধ বিগ্রহেই কেটে যায়। সেসব বিবরণে দরকার নেই। শুধু অন্তিম অধ্যায়টি উল্লেখ্য।

পারস্য সম্রাট নাদির শাহ্‌র দিল্লী আক্রমণের ব্যাপার। আর তার সঙ্গে যুক্ত সাদৎ খাঁর সেই পরিচ্ছেদ দুটি অচ্ছেদ্য হয়ে আছে ভারতের ইতিহাসেও।

প্রথম জীবনে তুর্কমান দস্যু। পরে ইরাণের পাদিশা নাদির শাহ্‌। অর্ধ-বর্বর, যুদ্ধ-বাজ, লুঠেরা। সোনার ভারতের ইতিহাসে এমনি যাঁরা চির কুখ্যাত, তিনি তাঁদের একজন। গজনীর মাহ্‌মুদ, ঘোরের মহম্মদ, মোগল তৈমুর লঙের সমান সারির নাদির।

তাঁর দুর্ধর্ষ বাহিনী সে কুক্ষণে ভারতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কান্দাহার, কাবুল, জালালাবাদের পর সিন্ধু নদ পার হলেন নাদির শাহ্‌। দখল করলেন লাহোর (জানুয়ারি, ১৭৩৯)।

পরের লুণ্ঠন-লক্ষ্য—দিল্লী।

কর্ণাল যুদ্ধেই (১৩ই ফেব্রুয়ারি দিল্লীর ভাগ্যপরীক্ষা হয়ে গেল। নাদিরের যুদ্ধবাজদের সামনে তখনকার মোগলদল দাঁড়াবে কি? বাদশাহ্‌কে মদ্য দিতে সাদৎ খাঁ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করলেন ফয়জাবাদ থেকে। উজীরের শরীর তখন অসুস্থ। তবু কর্ণালে লড়লেন যথেষ্ট সাহস দেখিয়ে। কিন্তু সবই বৃথা হল। বুরহান-উল মুল্‌ক নিজেই বন্দী হলেন ইরাণী দলের হাতে।

কর্ণাল যুদ্ধ নাদির শাহ্‌ ফতে করলেন।

তারপর একটি প্রস্তাব পাঠালেন মহম্মদ শাহ্‌র দরবারে। দিল্লী আক্রমণ না করে তিনি ফিরে যেতে পারেন, যদি তেমন নগদ টাকা পান।

টাকা দিয়ে সন্ধি করতে রাজি হলেন পরাজিত বাদশাহ্‌। তাঁর পক্ষে কথা বলতে নিজাম্‌ উল্‌ মুল্‌ক্‌ নাদিরের শিবিরে এলেন।

আলোচনায় ঠিক হল, নাদির শাহ্‌ পাবেন পঞ্চাশ লক্ষ সিক্কা টাকা। তাহলে তিনি দিল্লীকে রেহাই দেবেন। তাঁকে এখনই নগদ দেওয়া হবে কুড়ি লাখ। আর ত্রিশ লক্ষ তিন দফায়। ইরাণে তিনি পেঁছে যাবার পর শেষ কিস্তির দশ লাখ টাকা মিলবে।

আপোসের কথাবার্তা সবই শুনেছিলেন সাদৎ খাঁ।

নিজাম উল্ মুল্ক্ নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেলেন।

কিন্তু তারপরই এক নতুন পরিস্থিতি দাঁড়াল মোগল দরবারে। মহম্মদ শাহ্‌র এক প্রধান সভাসদ্ সামশসুদ্দৌলা খাঁ দৌরান হঠাৎ মারা গেলেন। তিনি ছিলেন আমীর-উল্ উমারা। আবার বখ্‌সী-উল্-মম্‌লিক অর্থাৎ সৈন্য দলকে তলব দেবার কর্তা। দস্তুরমত গুরুত্বপূর্ণ পদ। সাদৎ খাঁর এই বখ্‌সি হবার লোভ আগে থেকেই ছিল। এখন নিজাম পদটি দাবি করলেন নিজের ছেলে ফিরুজ জঙ্গের জন্যে। কিন্তু ফিরুজের বয়স কম বলে কেউ কেউ আপত্তি জানালেন। তাঁর চেয়ে বয়স্ক কোন ব্যক্তির পাওয়া উচিত।

তখন নিজাম বললেন, 'তাহলে, আমিই বখ্‌সি-উল-মম্‌লিক হব।'

কেউ তাঁর মুখের ওপর প্রতিবাদ করতে পারলেন না। কারণ দরবারে নিজামের প্রতিপত্তিই সব চেয়ে বেশি।

কিন্তু বুরহান-উল্-মুল্ক সাদৎ খাঁ ঈর্ষায় জ্বলে উঠলেন। তাঁর বহুদিনের সাধ বরবাদ হল নিজামের জন্যে। প্রতিহিংসায় সাদৎ খাঁ ক্ষিপ্ত হলেন। নিজামকে অপদস্থ করতে চাইলেন অন্যভাবে। বিশ্বাসঘাতকতারই এক রকমফের।

একেবারে নাদির শাহ্‌র সঙ্গে সাদৎ সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর কানে মহা লোভের মতলব দিলেন, 'জাঁহাপনাহ্, আপনি পঁচাশ লাখে রাজি হবেন না। বাদশাহ্‌র পক্ষে এ টাকা খুবই কম। নগদ আর হীরে জহরতে আপনি কুড়ি কোটি পেতে পারেন দিল্লী থেকে। মহম্মদ শাহ্‌র দরবারে এখন নিজামই সব চেয়ে বড় আমীর। অথচ লোকটা ঠক। আপনি নিজামকে কব্জা করে নিন, সবই আপনার মর্জি-মাফিক হবে।'

কথাটা লুফে নিলেন নাদির শাহ্।

নিজামকে আবার তলব করে বললেন, 'পঁচাশ লাখ নয়। আমার বিশ কোটি টাকা চাই। সব নগদা না হয়, হীরে জহরৎ পেলেও চল্‌বে।'

আশমান থেকে পড়লেন নিজাম্-উল্-মুল্ক্। কাকুতিমিনতি করে জানালেন, 'চুঘ্‌তাই বংশ পয়দা হওয়া থেকে এ পর্যন্ত বিশ কোটি টাকা কখনো জমা পড়েনি। শাজাহাঁ সব চেয়ে জমান—ষোল কোটি টাকা। কিন্তু আওরঙ্গদেব সমস্ত খরচ করে ফেলেন দক্ষিণে বছরের পর বছর লড়াই চালিয়ে। শাহী তহবিলে এখন পঞ্চাশ লাখও নেই, আপনি বিশ্বাস করুন।'

নাদির বিশ্বাস করলেন না। সাফ্ জানিয়ে দিলেন, 'তাহলে এখানে কয়েদ থাকুন, যতদিন না ওই টাকা উশুল হয়।'

আপোস হতে নির্ভাবনায় ছিলেন মহম্মদ শাহ্। এখন নিজাম বন্দী হয়েছেন শুনে তাঁর মাথায় বাজ পড়ল। দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে উজীর সাদৎ খাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইলেন। এখন তিনিই একমাত্র বল ভরসা।

অসহায় বাদশাহ্ বললেন, 'মতলব দিন, এবার কি করা যায়।'

উজীর জানিয়ে দিলেন, 'না। আমি এ অবস্থায় কিছুই বলতে পারব্‌না। আপনি নিজে যা ভাল বোঝেন, করুন।'

মহম্মদ শাহ্ ভাল বুঝে যা করলেন, হাল আরো ঘোরালো দাঁড়াল। বাদশাহী মান ইজ্জৎ খুইয়ে তিনি স্বয়ং এলেন নাদিরের শিবিরে। আর কোন কথাবার্তার আগেই কার্যত বন্দী হলেন।

কথা যখন হল, বাদশাহ্ একেবারে আত্মসমর্পণ করলেন বিজেতার কাছে। প্রাণের বিনিময়ে শাহী ধনভাণ্ডার খুলে দিতে রাজী হলেন। সবই পাবেন নাদির শাহ্। শুধু জানে মারবেন না বাদশাহ্কে।

এইভাবে মুক্তি পেলেন মহম্মদ শাহ্। নতুন সন্ধি হল।

এবার বুরহান-উল্-মুল্কের পালা। বেইমানীতে বরাত যে সব সময়েই ফেরে, তা নয়।

এত টাকা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ জেগেছে নাদিরের মনে। সাদৎ খাঁর ওপর তিনি মহা বিরক্ত হলেন। কথা মতন আদায় না হলে শাস্তি দেবার হুমকি দিলেন উজীরকে।

সাদৎ খাঁ উভয় সংকটে পড়লেন। ভয় তো ছিল নাদিরের শাসানিতে। তাছাড়া, এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা কি বাদশাহ্র কানে যাবে না? তিনিও বদলা নিতে পারেন।

একদিকে নাদির শাহী কোপ। অন্যদিকে মোগলাই দাওয়াই। দুদিকেই গর্দান নিয়ে টানাটানি। বে-ইজ্জতিরও একশেষ হবে।

তার চেয়ে নিজের হাতে হিসাব-নিকাশ করাই ভালো।

নবাব উজীর সাদৎ খাঁ—আউধের প্রথম নবাব—ইরাণর মীর মহম্মদ আমীন ন্যাসাপুরী—বিষ পানে আত্মহত্যা করলেন (৮ই মার্চ, ১৭৩৯)।

দিল্লীতেই উজীরের কবর হল। তাই দিল্লীর পরবর্তী সেই ভীষণ ঘটনাগুলো আর দেখতে পেলেন না আউধের প্রথম নবাব।

বাজারী গুজব শুনে নাদিরের সৈন্যদের এখানে সেখানে আক্রমণ করে বসল দিল্লীর লোক। পরের দিন নাদিরের হুকুমে কতল্-ই-আম্। দিল্লীর জনসাধারণের ওপর পাইকারী জল্লাদি। সকাল ৬'টা নাগাদ শুরু হয়ে দুপুর দুটোর মধ্যে অন্তত ত্রিশ হাজার মানুষ ইরাণী সৈন্যরা খুন করে ফেলল।

অক্ষম বাদশাহ্ নাদিরের কাছে দূত পাঠালেন নিজামকে। নাদিরশাকে বিস্তর অনুনয়ে আর দয়া ভিক্ষা করে বন্ধ হল হত্যাকাণ্ড। তারপরই টাকা আদায়ের পর্ব।

নতুন সন্ধি সূত্রে মহম্মদ শাহ্ কথা দিয়েছিলেন। এখন শাহী তোশাখানার চাবি ছাড়তে হল নাদির শাহ্কে। সে ধনরত্ন হস্তগত করতে ইরাণের পাদিশা দিল্লীতে রয়ে গেলেন। মোগল কোষাগার ফাঁক করে নগদ টাকা থেকে সোনা চাঁদি হীরে মুক্তো জহরৎ আর দামী দামী সমস্ত জিনিস উঠিয়ে নিলেন নাদির। ময়ূর সিংহাসন কোহিনূর আর মুকুটের অন্য সব রত্ন কিছুই বাদ পড়ল না।

মোট মূল্য কত? কোন কোন মতে, সত্তর কোটি টাকা। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মনে হয় ওটা অতিকথন। তাঁরা বিশ্বাস করেন নাদির পক্ষে সরকারী হিসাব—পনর কোটি টাকা। সেটাই যুধিষ্ঠীরের বাক্য ধরা গেল।

কিন্তু সেখানেই শেষ হয়নি নাদিরশাহী লুঠ। বাদশাহ্‌র পরে তাঁর আমীরদের ওপরও চড়াও হল পাদিশা। আমিরদের খানিকটা ফকির করে, দিল্লীর সাধারণ মানুষদের শুধে নেওয়া শুরু হল। পাইকারী জরিমানার মতন বাড়ি বাড়ি বরাদ্দ করে দিয়ে আদায় হতে লাগল টাকা। স্বেচ্ছায় না দিলে জুলুম করে, বাড়িঘর তছনচ্‌ করে দিয়ে উশুল করা হল। এমনিভাবেও পাদিশার মিলেছিল দু কোটি টাকা। তাছাড়াও তিনশ হাতি, দশ হাজার ঘোড়া আর উট—এসব হিসাবের বাইরে।

এমনিভাবে ৫৭ দিন দিল্লীতে থেকে নাদির শাহ্‌ যখন সব বামাল সমেত বিদায় হলেন, তখন বাদশাহ্‌ প্রায় ফতুর। আর নিজাম্‌-উল্‌ মুল্‌ক্‌ও নাদিরের কাছে সত্যি কথা বলেন নি। শত্রুপক্ষের হিসাবেই আদায় হয় অন্তত পনর কোটি। আকবরের আমল থেকে ভারতবাসীদের শাসনের নামে মোগল বাদশাহ্‌দের লুণ্ঠন তহবিলের ভোগাবশেষ! মহা মহা পূর্বপুরুষদের তুল্য জবরদস্ত না হওয়ার ফলে মহম্মদ শাহ্‌র বরাতে আর সহ্য হল না। নাদির শাহী তাণ্ডব শেষ ধাক্কা দিয়ে গেল মোগল দরবারকে।

তারপর মহম্মদ শাহ্‌ বছর দশেক বেঁচে ছিলেন নাম-কো-ওয়াস্তে বাদশাহ্‌ হয়ে। মোগল শাহী ভিত্তিকেই বিধ্বস্ত করে দেওয়া, বলা যায়।

দিল্লী শহর আর দিল্লী শাহীর এই চূড়ান্ত দুর্দশার জন্যে, ঘটনাচক্রে খানিকটা দায়ী নবাব-উজীর সাদৎ খাঁ। তিনি নাদিরকে প্ররোচনা না দিলে হয়ত এত তাণ্ডব ঘটত না। অবশ্য তার কথা থেকে ব্যাপার এতদূর গড়াবে তা তার কল্পনার অতীত ছিল হয়ত।

কিন্তু সাদৎ খাঁ মোগল ভাণ্ডারের হিসাবটা নাদির শাহ্‌কে ঠিকই দিয়েছিলেন। বিশ কোটি টাকা আদায় হতে পারে মোগল ভাণ্ডার থেকে। নাদিরের তার চেয়ে বোধহয় কম মেলেনি। এ ব্যাপারে বেশ ওয়াকিবহাল ছিলেন বুরহান-উল্‌-মুল্‌ক্‌।

আউধ নবাবীর আদি অধ্যায় এমনি শোচনীয়ভাবে শেষ হল। অভাবিত
সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন প্রথম নবাব।
কোথায় সুদূর ইরান থেকে এক ভাগ্যান্বেষী নিঃস্ব।
আর কোথায় মোগল বাদশাহ্‌র এক প্রধান দরবারী। এমন সমৃদ্ধ
অযোধ্যা প্রদেশের ভারপ্রাপ্ত। কিন্তু শেষ
রক্ষা করতে পারলেন না। অতি লোভে সর্বস্বান্ত, ধনে
প্রাণে সম্মানে।
নীতিহীন উচ্চাশা চরিতার্থ করতে চরম মূল্য দিলেন, নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা।
জীবনের শেষ বিশ্বাস-হননের শাস্তি আপন
হাতেই নিতে হল। সাদৎ খাঁ সমাধিস্থ রইলেন দিল্লীতে।
অযোধ্যায় আর ফেরা হলনা।
নিজের বরাতে ভোগও জুটল না বিশেষ। লড়াইয়ের

ময়দানে আর বেইমানীতে বিস্তর জমা করেছিলেন। স্থাবর-অস্থাবর প্রচুর ধন দওলৎ। প্রচুর আয়ের আউধ সুবা আর নগদ তনখার সঙ্গে হীরে জহরৎ সোনা চাঁদি মুক্তো। প্রায় বিশ বছরের এক-লক্ষ্য উপার্জন আর সঞ্চয়।

বংশধরদের নবাবীর জন্যে সবই রেখে গেলেন সাদৎ খাঁ (১৭২২-১৭৩৯)।

দ্বিতীয় নবাব সফদরজঙ্গ (১৭৩৯-১৭৫৩) আর তৃতীয় শুজাউদ্দৌলাকে (১৭৫৩-১৭৭৫) তবু যুদ্ধের হুজ্জৎ কিছু পোহাতে হয়। কিন্তু চতুর্থ আসফুদ্দৌলা (১৭৭৫-১৭৯৭) থেকে পর পর সাদৎ আলী (১৭৯৭-১৮১৪), গাজীউদ্দীন হায়দর (১৮১৪-১৮২৭), নাসিরুদ্দীন হায়দর (১৮২৭-১৮৩৭), মহম্মদ আলী শাহ (১৮৩৭-১৮৪২) আর নবম আমজাদ আলী (১৮৪২-১৮৪৭) পর্যন্ত নিরঙ্কুশ নবাবী। লড়াই বর্জিত ভোগ বিলাস আয়েশ কেবল।

আর সে নবাবীয়ানার চূড়ান্ত করলেন দশম পুরুষ ওয়াজিদ আলী। তারও চড়া দাম তেমনি দিতে হল, যদিও প্রথম নবাবের তুল্য ভয়ংকর নয়।

তবে দশম নবাব নন্দন সত্ত্বায় অদ্বিতীয় এ বংশে। শিল্প-গুণে স্মরণীয় ওয়াজিদ আলী। আর লক্ষণীয় তাঁর দ্বৈত চরিত্র। খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। একদিকে লক্ষ্ণৌ দরবারের রোশনি বেহিসাবী জ্বালিয়ে দেওয়া। নবাবীর বাতি দুই প্রান্তে জ্বলন্ত—কাইজার বাগে, সিকান্দার বাগে, আলম বাগে, ছত্তর মঞ্জিল জোড়ায়। হুজুর বাগে নাচ গান বাজনার জলসায়। পরীখানায় আর বাইজী বেগম হারেম বিলাসের বাদশাহী দেখিয়ে দেন বটে ওয়াজিদ আলী।

আবার আরেকদিকে তিনি কবি, গীতিকার, লেখক, গায়ক, বাদক। তাঁর গান, কাব্য আর মসনবী রচনা। আত্মকাহিনী আর সঙ্গীত তত্ত্ব লেখা। তা ছাড়া গীতি-নাট্য রচনাকারও তিনি। শেষোক্ত প্রসঙ্গ এখন বলতে হবে, সদৃষ্টান্ত।

তা হল তাঁর 'রাধা কানহাইয়াকা এক কিস্সা'—উর্দু সাহিত্যের যা একটি বিখ্যাত গীতি নাটিকা।

মসনদ প্রাপ্তির আগেই তাঁর এটি রচনা এবং মঞ্চস্থও হয়েছিল। তিনিই সে অভিনয়ের পরিচালক।

'তারীখ্-এ-পরীখানা'র শেষাংশে 'রহস্' বা রাসলীলা মঞ্চস্থ করার কথা লেখেন নবাব। সুলতান পরী, মাহ্রোক পরী, আশমান পরী, ইজ্জৎ পরীদের অভিনয়ের কথাও তিনি জানিয়েছেন। 'রাধা কানহাইয়া কা এক কিস্সা'র বিষয়বস্তুও অভিন্ন। মনে হয়, পরীখানায় অভিনীত ('রাসলীলা') 'রহস্' আর রাধা কানহাইয়া কা এক কিস্সা' আলাদা কিছু নয়। কোথাও 'রহস্' দেখে তিনি আকৃষ্ট হন এবং রচনা করে ফেলেন এই গীতি-নাট্য।

কিন্তু রাধাকৃষ্ণ কাহিনী কি কিম্ভুতকিমাকার রূপ ধারণ করেছে নবাবের হাতে, তা অনুবাদ থেকে বোঝা যাবে।

আউধ নবাবের প্রমোদ মঞ্চে নর্মসঙ্গিনীদের যোগে মঞ্চস্থ এই গীতি-নাটিকার বিষয়বস্তু ও মানসিকতার সঙ্গে বৃন্দাবনের রাধা-কৃষ্ণ কথার মধ্যে ব্যবধান আশমান জমীন্।

লক্ষ্ণৌ দরবারের সম্পূর্ণ পৃথক সাংস্কৃতিক পরিবেশ। স্থূল ভোগ বিলাস

যার ভিত্তি। বিধর্মী বিদেশীর দৃষ্টি ও সৃষ্টিতে ভারতীয় অধ্যাত্ম কোন ভাব বস্তুর মর্মগ্রহণ কি করে সম্ভব? তার প্রচেষ্টা যে কি অদ্ভুত বহির্মুখী, এমন কি হাস্যকর হতে পারে নবাবের এই গীতিনাট্যটি তার সমুজ্জ্বল সাক্ষ্য।

লক্ষ্ণৌতে এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৮৪৩ সালে। অর্থাৎ তাঁর তখ্‌তে বসার চার বছর আগে। পরে তার পুনরাভিনয়ও হতে পারে, ওই চার বছরের মধ্যে। কারণ নবাব হবার পর পরীখানা শূন্য হয়ে যায়, পরীরা বেগম হবার ফলে। যতদিন পরী-খানা ছিল, সুন্দরীদের নিয়ে নাচ গান নিত্য হত। সুতরাং রাসলীলা আরো মঞ্চস্থ হওয়াই সম্ভব প্রাক-নবাব পর্বে।

তাঁর উদ্‌যোগে 'আফসানা-ই-ইসাক' (প্রেমের কাহিনী) ইত্যাদির অভিনয়ও হত লক্ষ্ণৌতে। এ ধরনের জলসা নবাবের বড় প্রিয় ছিল।

তা ছাড়া তাঁর রচিত তিনটি মসনবী থেকে নাটক করেন—হকীম আসঘর আলী খাঁ। সে সবই লক্ষ্ণৌতে অভিনীত।

এমনি গীতিনাট্য নবাবের মেটিয়াবুরুজ দরবারেও মঞ্চস্থ হয় প্রায় ত্রিশ বছর পরে। ১৮৭৫ সালে নবাব বোধহয় আরেকটি গীতিনাট্য লেখেন রাধাকৃষ্ণ কাহিনী নিয়ে।

এখন তাঁর প্রথম গীতিনাটিকার রূপ, যা লক্ষ্ণৌতে লিখিত ও মহাসমারোহে মঞ্চস্থ হয়ে থাকে।

ব্রজধামের কৃষ্ণ রাধিকা লক্ষ্ণৌ নবাবের হাতে যে উর্দু রূপ ধারণ করেছেন তারই বাংলা অনুবাদ।

PATHAGAR

কানহাইয়া কা এক কিস্সা

(রাধা-কৃষ্ণের একটি কাহিনী)

নাটিকার পাত্র-পাত্রীগণ

১। সাহারা (যোগিনী)।
২। ঘুরবৎ (সাহারার ভৃত্য)।
৩। আফ্রিয়ৎ (দানব)।
৪। আর্ঘোয়ান (গাঢ় লাল) পরী
৫। জাফরান (কমলা) পরী — পরীদ্বয়
৬। কানাইয়া (নায়ক)।
৭। রাধা (নায়িকা)।
৮। ললিতা
৯। শাঘা
১০। চুনীয়া — সখী চতুষ্টয়
১১। লাড়োয়া
১২। রামচিরা (কানাইয়ের পরিচারক)।
১৩। মুসাফির (পথিক—মথুরা থেকে বৃন্দাবন যাত্রী)
(১৪-১৭) চারজন পনহরণে (কলস বাহিকা)
(১৮-২১) চারজন মাখনওয়ালী।

[দৃশ্য আরম্ভের সময় মঞ্চের ওপর দেখা যায়—দুই পরী। তাদের হাতের ওপর ডানা ; একটি কুৎসিত-মুখ লোক (আফ্রিয়ৎ), এক যোগিনী (সাহারা) ও তার ভৃত্য (ঘুরবৎ)।

একদল নর্তক বৃত্তাকারে নৃত্য করে, তারপর মঞ্চের ওপর বসে। পরী দুজন কেদারায় থাকে। আফ্রিয়ৎ গদা হাতে পরীদের সামনে দাঁড়িয়ে। মঞ্চের অন্যদিকে একটি কেদারায় সাহারা বসে। তার সামনে হাত-জোড় করে দাঁড়িয়ে ভৃত্য ঘুরবৎ।

আর এক কোণে রাধা ও কানাই কেদারায় বসে। কানাইয়ের মাথায় মুকুট। রাধার নাকে নথ, কপালে ঝাপটা, মাথায় বাঙ্গালী ঘোমটা।* রামচিরা সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে। ললিতা, শাঘা, চুনিয়া, লড়োয়া মাথায় গয়না পরে, অর্ধ-বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে। চারজন কলসধারিণী কুয়ো থেকে গাগরীতে জল ভরছে। জল নেবার সময় ঠুংরি গাইছে ঃ পাণি ভরতি হুয়ি হুঁ।—মুসাফির, হাতে লাঠি আর গাঁটরি নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে। চারজন মাখনওয়ালীর হোরি গান গাইতে গাইতে মাখন তৈরীর ভঙ্গী।

[যোগিনীর দুঃখিত হাবভাব]

ঘুরবৎ (সাহারাকে)—যুগ যুগ বেঁচে থাকুন। আনন্দে থাকুন। যোগিনী সাহেবা, আপনি মনমরা হয়ে রয়েছেন কেন ? আপনার কিসের দুঃখ ?

সাহারা—দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে আমার মনে এক দুঃখ আছে।

ঘুরবৎ—সে কিসের দুঃখ ? যদি আমার কাছে বলতে পারা যায়, তাহলে বলুন।

সাহারা—এই চব্বিশ বছর চলে গেছে, অথচ রাধা কানাইয়ের নাচ আমি দেখতে পাইনি। এই আমার দুঃখ।

ঘুরবৎ—শুধু এই ব্যাপার ? আচ্ছা, আমি দেখছি, কি করতে পারি ?

(ঘুরবৎ এগিয়ে যায় দানব আফ্রিয়তের সামনে)

ঘুরবৎ—শান্তিতে থাকো, মিয়াঁ আফ্রিয়ৎ, সেলাম ওয়ালেকুম।

আফ্রিয়ৎ—ওয়ালেকুম সেলাম। [তারপর কয়েকটি বন্ধুত্বপূর্ণ গালাগালির বিনিময় ; পারস্পরিক আলিঙ্গন। পরে আফ্রিয়তের হাস্য।]

ঘুরবৎ—মিয়াঁ আফ্রিয়ৎ, আমরা অনেকদিনের বন্ধু। তোমার সঙ্গে আমার খুব দরকারি একটা কথা আছে তুমি যদি পার···

আফ্রিয়ৎ—কি কথা ?

ঘুরবৎ—এক যোগিনী আছেন। তাঁর মনে বড় দুঃখ।

আফ্রিয়ৎ—কিসের দুঃখ ?

ঘুরবৎ—যোগিনী বললেন যে, রাধা কানাইয়ের নাচ তিনি কখনো দেখেননি। সেই তাঁর দুঃখের কারণ। যথাসাধ্য চেষ্টা করবো, তাঁকে এই কথা দিয়ে তোমার কাছে এসেছি। তুমি ভাই যদি পারো, দেখো যাতে আমার কথাটা থাকে !

আফ্রিয়ৎ [প্রথমে ইয়ার্কি]—তনিতি মনিতি দুম ঘোবিসি, লোটক লাটা ঝোটক ঝাঁটা, সন্দুকে মওল্লাক, তুরি গাও কি দুম। [তারপর গম্ভীর হয়ে] আমার ছেলেদের

* "ঘুজ্যুটে বাঙ্গলা।"।

নামে শপথ করছি, কিছুমাত্র করতে পারলেও পেছপা হব না। আর আমি চেষ্টা করব।

[আফ্রিয়ৎ ও ঘুরবৎ-এর খানিক পায়চারি।]

আফ্রিয়ৎ—বাবা সাতুরবাজী, হাম্মালবাজী নেজাবাজী খেয়ালবাজী সমসেরবাজী রাস্তবাজী আমার সঙ্গে আয়।

[তারপর তারা দুজনে জাফরান পরী আর্ঘোয়ান পরীর সামনে এল।]

আফ্রিয়ৎ (পরীদের)—রাধা কানাইয়ের নাচ দেখতে না পেয়ে এক যোগিনীর বড় দুঃখ। তিনি মনের দুঃখে এই যোগ নিয়েছেন আর সেই নাচ দেখতে চান।

পরীরা—যোগিনীকে নিয়ে এস।

[ঘুরবতের সঙ্গে আফ্রিয়ৎ সাহারার সামনে এল।)

ঘুরবৎ (সাহারাকে)—যোগিনী সাহেবা, আসুন। পরীরা আপনাকে ডেকেছে।

[আফ্রিয়ৎ ও ঘুরবতের সঙ্গে সাহারা পরীদের দিকে এসে দাঁড়াল।]

আফ্রিয়ৎ (পরীদের দিকে ফিরে)—যোগিনী এসেছেন।

পরীরা—ওকে ডাকো।

[যোগিনী কাছে যেতে পরীরা তাকে আলিঙ্গন করল।]

জাফরান ও আর্ঘোয়ান পরী (সাহারাকে)—তোমার কি হয়েছে? তুমি যোগ নিয়েছ কেন?

সাহারা—আজ চব্বিশ বছর ধরে আমি রাধা কানাইয়ের নাচ দেখিনি। এই আমার দুঃখ।

জাফরান ও আর্ঘোয়ান—ও আফ্রিয়ৎ, যোগিনীকে রাধা কানাইয়ের নাচ দেখিয়ে দাও।

আফ্রিয়ৎ (চীৎকার করে)—ও রাধা কানাই আর তাঁদের সঙ্গীসাথীরা। আপনারা দয়া করে সেই হ্যাণ্ডোলা নাচ আরম্ভ করুন।

[রাধাকৃষ্ণের সব সখীরা তখন এক সারিতে দাঁড়াল। একটি দোপাট্টার একদিক কৃষ্ণ আর একদিক রাধা ধরলেন। তারপর তাঁরা হ্যাণ্ডোলা গাইতে গাইতে পায়ে এই তাল দিতে লাগলেন। আর সখীরা রাধাকে অনুসরণ করতে আরম্ভ করল। এই ভাবে নাচ শুরু হল। সখীরা ঠিক রাধার মতন করতে লাগল। কৃষ্ণ যখন এগিয়ে আসেন রাধার দিকে, দোপাট্টা তখন টেনে ধরেন। আবার পিছিয়ে যাবার সময় কাপড়টা আলগা করে দেন। (গানের স্থায়ী)

হ্যাণ্ডোলা ঝুলে শ্যামা শ্যাম ঘনে
সে ঘনা চলৎ পবন না নানা না নানা না নানা ॥

(প্রথম অন্তরায়)

সব সখীয়াঁ মিল পিঙ্গ বাড়াও লেকে তান
নানা নানা নানা নানা।

(দ্বিতীয় অন্তরা)

মোর মুকুট কাট রাখেরওরা
কুণ্ডর পায়েল বাজে ঝনা নানা ঝনা নানা ঝনা নানা।

হ্যাণ্ডোলা শেষ হলে সখীরা বলে ওঠে ; জয় রামচন্দ্র কী জয়। তারপর রাধা ও কৃষ্ণ মুখোমুখী দাঁড়ান। আর অর্ধেক সখীরা রাধার দিকে, অর্ধেক সখীরা কৃষ্ণের দিকে ভাগ হয়ে যায়। তারপর রাধা ও কৃষ্ণ উর্দু ও হিন্দী দোহারায় পরস্পরকে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ করেন, ভাও বাতলাবার সঙ্গে (অর্থাৎ ভঙ্গী সহ)।

রাধা—আমার প্রিয় পীড়ন করতে বড় ভালবাসে। যাদের সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সে তাদেরই হাতে। তিলেকের জন্যেও তার মনে পড়ে না আমাকে। প্রিয়ের প্রতীক্ষায় আমি দিন কাটাই। কেউ আমার কাছে নেই। হাত আমার পুড়ে গেছে প্রতীক্ষার জ্বালায়।

কানাই—আমার নাম কানাই। আমি চিনি তোমাকে। তোমার ওপরে টান আমার নিজের জীবনের চেয়েও। রাধার কপালে বিঁদিয়া-টি* মানিয়েছে কি সুন্দর। যেন কেতকী ফুলে বসেছে একটি ভ্রমর।

রাধা—আমি তোমার জন্যে পাগলিনী ওগো কানাই। নিজের চেয়েও তোমার জন্যে ভাবনা আমার বেশি। তুমি আমার চোখের মধ্যে এস। চোখের পাতায় লুকিয়ে রাখি তোমায়। আর কেউ তোমায় দেখতে পায়, এ আমি চাই না।

কানাই—তোমার প্রেমে বনে বনে ঘুরেছি এখানে সেখানে। এই সব পরী আর দানোরাও চিনতে পারেনি আমায়!

রাধা—আমার মনের মণিকোঠায় আছো তুমি বিহারীলাল, তোমার মুরলী, তোমার মুকুটও আছে আমার হৃদয়ে।

কানাই—রাধার দুয়ার অনেক দূরে, খেজুরের মতন। যে উঁচুতে উঠতে পারে, সেই পায় খেজুর। না হলে, যদি তা মাটিতে পড়ে যায়, তাহলে সব নষ্ট।

[এই দোহারার পর কানাই শ্রোতাদের কি বিতরণ করেন। সকলে তার কপালে, চোখে স্পর্শ ও চুম্বন করে।]

রাধা—যখন নদী কিনারে ধোঁয়া ওঠেরে,
বুঝি সেখানে একটা কিছু ঘটছে।
যার জন্যে যোগ নিয়েছি, সে হয়ত আর নেই।
তার দেহ জ্বলছে সেখানে।
তার মুখ চাঁদের মতন, চোখ দুটি গোলাপী, হাত-ভরা ফুল।
আমি নিজের মনকে খুঁজেছি, গিয়েছি দেশ বিদেশ,
পুরান পথ ধরে বেড়িয়েছি এখানে সেখানে।

ও আমার বৈদ্য, তুমি এসব বাঁধন খুলো না। হাত দিও না আমার ক্ষতস্থানে, তারা বড় স্পর্শ-কাতর। আমার দুঃখের ভাগ যদি নাও, প্রিয় আমার চলে যাবে তাহলে। আমি একা চিন্তায় ছিলেম বিভোর। তুমি কেন ছিন্ন করলে গো। তুমি দুই জগতের দাতা। আমি তোমার সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা। জাহাজের ওপর ওড়ে যে কাক, সে আর কিছু দেখতে পায় না। আমিও তেমনি, কিছু আর নজরে পড়ে

---

* অলঙ্কার

না তুমি ছাড়া। ও কানাই, তুমি ভেবনা এই বিরহ শেষ করেছে আমাদের প্রেম।
কিংবা আমি বিচ্ছিন্ন হলে, তোমার প্রেম যাই ভুলে ॥
আমাদের প্রেম যেন একটি পুঁয়ে লতা,
সবুজ থেকে সবুজতর হয় যেন দিনের পর দিন ॥
ও কাক, মরণ হলে আমার শরীরের সব কিছু খেও,
শুধু নষ্ট করনা আমার দুটি চোখ।
কারণ তাদের প্রিয় দর্শণের আশা চিরকাল ধরে ॥
ওগো বংশীধারী মোহন, দয়া করে চাও আমার দিকে।
তোমায় রেখে দেব আমার চোখের মধ্যে, কাজলের রেখার মতন।
কানাই—ও রাধা, তুমি যখন দূরে যাও চলে,
আমার কোন সুখ থাকে না ঘরে।
আমার দশা হয় ওই মেহেদী পাতার মতন,
যাতে আর লেখা যায় না লাল রঙে ॥

রাধা—ওগো রাজার রাজা, অধিরাজ, মহারাজ। তুমি যুগ যুগ বেঁচে থাকো। সুখে থাকো। তোমার সেই মুরলী কোথায়, যাতে বাজাও ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী? সে বাঁশী তুমি কোথায় রেখেছ? দয়া করে সেই মুরলী বাজাও।

কানাই—ও রাণীর রাণী, অধিরাণী, মহারাণী। কানাই তোমায় আশীষ জানায়—যুগ যুগ বাঁচো। আনন্দে থাকো। দোহাই তোমার—আমি আমার বাঁশী হারিয়ে ফেলেছি।

রাধা—মহারাজ, তুমি সেই কুব্জাকে তোমার বাঁশী দিয়েছ।

(রাধা রাগ করে মঞ্চের আর এক পাশে চলে যান, কানাইয়ের কাছ থেকে অনেকটা দূরে। তখন কানাই যথোচিত ভাবভঙ্গীর সঙ্গে এই ঠুংরিটি গান করেন, রাধাকে তুষ্ট করবার জন্যে।)

স্থায়ী ঃ মেরি মহারাণী অধিরাণী
অন্তরা ঃ কা মোখে কুছ চুক পড়ি মোরি রাণী,
আকতার কদর না জানি ॥

(শেষে কানাই তাঁর ভৃত্যকে ডাকেন)

কানাই—রামচিরা।

রামচিরা—হাজির, মহারাজ, হাজির।

(সে সামনে এসে উপস্থিত হয়।)

—রাজার রাজা, অধিরাজ, মহারাজ, শিবপ্রধান, ছত্রপতি। বলুন ত কি হয়েছে?

কানাই—রাধার রাগ হয়েছে। তিনি ভেবেছেন, কুবজাকে আমি মুরলী দিয়েছি।"

রামচিরা—মহারাজ, তাঁর মানভঙ্গ করুন।

(এই ভাবে রামচিরাকে কানাই তিনবার ডাকেন এবং সে তিনবার রাধার মান ভঙ্গ করবার উপদেশ দেয়। চতুর্থবার ডাকা হলে—)

রামচিরা—মহারাজ, রাধার কোন সঙ্গীকে বলুন তাঁর অভিযোগ দূর করতে—

কানাই—ও ললিতা।

ললিতা—আসছি, মহারাজ!

(ললিতা ১, ২ ১, ২ তাল দিতে দিতে আর নাচতে নাচতে উপস্থিত হয়ে তার জায়গায় বসে)

কানাই—ও ললিতা, আমার রাধা আমার কথা শুনছেন না, মান করেছেন। এখন আমি কি করি?

ললিতা—অনুনয় করুন, মিনতি করুন, নাক খৎ দিন, পায়ে পড়ুন, মাটিতে কপাল ঘষুন, তবে তিনি আপনার কথা শুনবেন।

কানাই—আমি সব রকম চেষ্টা করে দেখেছি। রাধাকে রাজি করাতে পারিনি। এখন তোমার কথায় আবার চেষ্টা করি।

(কানাই দ্বিতীয় বার চেষ্টা করেন এবং আগেকার মতন ভাব-ভঙ্গির সঙ্গে এই ঠুংরিটি গান।)

স্থায়ী ঃ রাধাজী মোসে বোলো কিঁউ না রে,

অন্তরা ঃ কা মোসে কুছ চুক্ পড়ি, মেরি রাণী;

হস হস ঘুঁঘুট খোলে কিঁউ নারে॥

[রাধার সব সখীরা তাল দিতে দিতে ওই ঠুংরি থাকে। তারপর যখন রাধার চতুর্থ সখী মঞ্চে প্রবেশ করে, কানাই তখন এই ঠুংরি গান করেন ঃ]

অস্থায়ী ঃ মোরি তু জীবন রাধা

অন্তরা ঃ পাঁইয়া পঁরু ম্যয় তোরি ললিতা তোরি শাখা,

তোরি চুণিয়া, তোরি লড়োয়া, তোরে বিন দেখে নেহি বেন।

(গান গাইবার সময় কোন সখীকে সম্বোধন করতে গিয়ে কানাই মাথা নীচু করেন। রাধা কিন্তু বসে থাকেন, নড়েন না, আর এই তাল দেন ঃ

দি দি আ তা তা তা তা থৈ।

দি দি আ তা তা তা তা থৈ।

অন্তরাঃ থৈ থৈ থৈ দি দি আ তা তা তা তা থৈ

দি দি আ তা তা তা তা থৈ॥

[তারপর কানাই দাঁড়িয়ে উঠে এই গান ধরেন ঃ

রাধা রাধা রাধা রাধা কুঞ্জ গোলিন হ্যায়

রাধা রাধা কুঞ্জ ভান হ্যায় রাধা রাধা।

তারপর নৃত্য করেন পায়ে তাল দিতে দিতে।]

রামচিরা—মহারাজ, ইশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন। তিনি যেন রাধাকে আপনার কাছে দেন। তপস্যা করুন তবে রাধাকে পাবেন।

[কানাই এবার তাঁর আসনে বসে নিজের নাক টিপে নিঃশ্বাস বন্ধ করে তপস্যা আরম্ভ করেন।

তৎক্ষণাৎ রাধা উঠে গিয়ে কানাইয়ের কণ্ঠে আলিঙ্গন করে ঝুলে পড়েন।

তখন সব সখীরা নিলে লাড্ডু পূজা অনুষ্ঠান করে। কানাই ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়ান গাল ফুলিয়ে চোখ স্থির, অপলক দৃষ্টি, বাঁ পায়ে দণ্ডায়মান, ডান পা বাঁ

পায়ের ওপর। তারপর চার সখী দক্ষিণ জানু মেঝেতে ঠেকিয়ে হাত গোল করে লাড্ডুর মুদ্রায় রেখে বসে আর তালে তালে হাত নেড়ে কানাইয়ের ফুলনো গালে মৃদু চপেটাঘাত করে গান গায় ঃ

লে লে লালা লাড়ুয়া লে

এই লাড্ডু পূজার শেষে, চার সখী সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গান ধরে।]

প্রথম তুক ঃ এক নার বেয়াকুল ভৈ
বরছি লাগি যুগ ওয়াবাকে।
দ্বিতীয় তুক ঃ এ্যায় বিধাতা তু মোহে পংক তো দে
তো ম্যয় জায় করুঁ দর্শন পিয়াকে ॥
তৃতীয় তুক ঃ সমঝায়ে সখীয়াঁ মৎ শোঁচ করো
চতুর্থ তুক ঃ অর যে পংখন হি যে পিয়ো মিলে তো ইয়ালী কেয়া।
পংখ নেহি চকয়ি চকওয়া ॥

[চারটি তুক শেষ করে সখীরা বসে পড়ে এবং কানাই দাঁড়িয়ে এই গান আরম্ভ করেন ঃ]

প্রথম তুক ঃ মুরলী হামারি খোই গ্যয়ি
মথরা বৃন্দাবন কি বেত।
দ্বিতীয় তুক ঃ না মুঝে সুজৎ ঔর ছোর
না মোহে সুজৎ খেত ॥

রাধা—মহারাজ, যদি আপনার মুরলী ফিরে পান তবেই আমি সুখী হব।

কানাই—আচ্ছা, আমি যাব। নিয়ে আসব আমার মুরলী।

[তখনি একজন সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করেন]

—কেউ আমার মুরলী দেখেছ ?

রামচিরা (ঠাট্টার সুরে)—কেউ আমার মুরগী দেখেছ ?

কানাই—[তাকে এক চপেটাঘাত করে তাড়িয়ে দেন। তারপর হাসতে হাসতে] মুরলী খুঁজছি, মুরগী নয়।

রামচিরা (আবার সামনে এসে)—মহারাজ, আপনার মুরলীর দুটো শিঙ্ আর একটা লেজ আছে।

[কানাই তার ঘাড় ধরে এক চপেটাঘাত করে বাঁশী খোঁজার ভঙ্গী করতে লাগলেন]

কানাই—কেউ আমার বাঁশরী দেখেছ ?

রামচিরা—কেউ আমার মোষ দেখেছ ?

[কানাই আবার বাঁশী খোঁজার অভিনয় করতে লাগলেন।]

[তার মধ্যে চারজন কলসধারিণী এসে কুয়া থেকে জল তুলতে লাগল, এই ঠুংরিটি গান করার সঙ্গে ঃ]

স্থায়ী ঃ সব রাহ বাট মেঁ ঢুঙ ফিরি,
বন্দরা বন মে হো সামরিয়া।

জঙ্গল নঙ্গল সুন সান ভয়ো
সুন-পায়ী কেইসি বাঁশরিয়া ॥
অন্তরা ঃ পগ ধরৎ ধরৎ লট পলট গয়ো,
পান ঘট্‌ওয়া গাগর উলট্‌ গ্যয়ো।
ক্যয় পাকরৎ কঙ্গন উচট গয়ো
চল্‌ ছাঁড় দে আফ্‌তার বা নগরিয়া ॥

(শেষে কানাই হতাশ বোধ করেন এবং মুসাফিরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ)—পথিক তুমি কোথা থেকে আসছ ?

মুসাফির—মথুরা বৃন্দাবন থেকে।

কানাই—আমার মুরলী কারো কাছে দেখেছ ?

মুসাফির—হ্যাঁ, আমি দেখেছি। ওদের মধ্যে যে সব চেয়ে ফরসা আর মাথায় ছোট, তার কাছে মুরলী আছে।

কানাই (হাত জোড় করে)—আমি তোমাদের লাড্ডু দেব। তুমি দয়া করে আমার মুরলীটি দাও।

(তারা চারজন কানাইকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে)

—যাও যাও, সে এখানে নেই। আমাদের কাছে নেই।

(তারপর কানাই একে একে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করেন এবং প্রত্যেকেই জবাবে তাঁকে একটি করে ধাক্কা দেন। শেষে যে মুরলীটি অপহরণ করেছিল, সে বলল)

—রাজার রাজা, অধিরাজ, মহারাজ, শিবপ্রধান ছত্রপতি। যুগ যুগ বাঁচো। আনন্দে থাকো। টাটকা টাটকা মাখন নিয়ে এস ত বলি।

(কানাই সম্মত হয়ে মাখন খোঁজার ভাবভঙ্গী করতে থাকেন এবং চারজন গাগরি-ধারিণী অবিরাম সেই ঠুংরিটি গেয়ে চলে।)

কানাই (চারজন মাখনওয়ালীকে) যুগ যুগ বেঁচে থাকো। আনন্দে থাকো। আমায় কিছু মাখন দাও না।

(মাখনওয়ালীরা ক'টি ট্রের ওপর পাত্রগুলি রাখে আর যেন মাখন তৈরি করছে এমন অভিনয় করে। আর এই হোরি গানটি গায় ঃ)

স্থায়ী ঃ এ দায় ম্যয় মাখন বেচন যাত।
অন্তরা ঃ না লো কান্‌হা তুম্‌ মাখন মোরা
বেচুঁ আফতার হাত ॥

(তারপর যখন কানাই মাখন চান, মাখনওয়ালীরা জবাবে গানের অন্তরাটি গাইতে থাকে।

শেষে তিনি তাদের অলক্ষিতে একটি ট্রে না বলে নিয়ে নেন এবং কলসধারিণীদের দেন। তখন তিনি তাঁর মুরলীটি ফিরে পান তাদের কাছ থেকে। তারপর তিনি মুরলী বাজাতে আরম্ভ করেন। সেই বংশীধ্বনি শুনে রাধা ছুটে গিয়ে তাঁর কণ্ঠ আলিঙ্গন করেন ও আন্তরিক সম্মতি দেন।)

রাধা (কানাইকে)—মহারাজ,

এখন আর আমার মনে কোন দুঃখ নেই। আমি বড় খুশি হয়েছি। আপনি

অনুগ্রহ করে গদীতে বসুন। আমি আপনার সামনে নৃত্য-গীত করি।

(এ কথার পর রাধা এই ঠুংরিটি গাইতে আরম্ভ করেন, ভাও বাৎলাবার (ভাব প্রদর্শনের) সঙ্গে ঃ

স্থায়ী ঃ বাজন্ লাগি শ্যাম কি বাঁশরী রে।

অন্তরা ঃ নদীয়া কিনারে আফতার বাঁশরী বাজাওৎ
নিকস যাত জীয়াসে সাঁস রি রে ॥

'কিস্‌সা খতম্ হুয়া' অর্থাৎ যবনিকা পতন।

একদিকে এবারের 'রহস্' কিস্সা খতম্। অন্যদিকে যবনিকা ঘনিয়ে আসছে মসনদে। যে রাজনৈতিক বাস্তবের দিকে ওয়াজিদ আলী চোখ বুজেছিলেন, তারই করাল গ্রাসে এখন লক্ষ্ণৌ। আর সমগ্র অযোধ্যা। তাঁর ধারণাই নেই, আউধ্ রাজ্যে রাজনৈতিক জটিলতা কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেজন্যে কি পরিমাণ দায়ী প্রশাসনিক ব্যর্থতা। রাজার কর্তব্য কিভাবে অবহেলিত।

সেই তোল্পাড় ঘোলা জলে কেমন মাছ শিকারী কুটবুদ্ধি বৃটিশ শক্তি—তাও নবাবের চিন্তার বাইরে।

কিন্তু হর্তাকর্তা লর্ড ডালহাউসি। তাঁর অফিসে রেসিডেন্টের পাঠানো ডেসপ্যাচ থেকে সমস্তই জানছেন। তখনকার অযোধ্যা আর ওয়াজিদ আলীর হাল স্যর স্লীম্যান কতখানি ওয়াকিবহাল, তা বোঝা যায়

'A journey through the kingdom of Oudh in 1849' বইখানি থেকে। এ রাজ্য সম্পর্কে এটি তাঁর রিপোর্টও বলা যায়।

ভারত সরকারের সেক্রেটারিকে লেখা তাঁর পত্রগুচ্ছ তার মূল্যবান অংশ। তা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার। অযোধ্যা গ্রাসের ইচ্ছা প্রকাশ পায়নি রেসিডেন্টের বিবরণীতে। স্লীম্যানের উদ্দেশ্য এই পর্যন্ত ছিল যে, অযোধ্যা নবাবকে গদীচ্যুত করা ও পুত্রকে সিংহাসন দিয়ে প্রশাসনে সহায়তা। অবধ দখলের সুপারিশ কখনো তিনি করেননি। বরং তাঁর মত ছিল বিপরীত। গভর্নর জেনারেলকে তিনি স্পষ্ট জানান—এ রাজ্য অধিকার করলে বৃটিশ শক্তিকে মূল্য দিতে হবে তার দশগুণ। আর সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে।

স্লীম্যানের এই ধারণা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত। অব্যবহিত পরেই।

তাঁর ইচ্ছা, লক্ষ্য ও নীতি এই ছিল যে, সীমান্ত রাজ্যগুলি (তখন অযোধ্যাও তেমনি একটি) থাকবে দেশীয় রাজাদের অধীনে। তাহলে প্রজারা ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কম্প্যানি আর নিজেদের রাজ্যশাসন তুলনা করতে পারবে।

কিন্তু গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহাউসি শোনেন নি রেসিডেন্টের মতামত।

স্যর স্লীম্যান ছুটি নিয়ে ইংলণ্ড যাত্রা করলেন ১৮৫৬ সালে। অসুস্থ শরীরে কলকাতা থেকে জাহাজে উঠলেন। কিন্তু স্বদেশে পদার্পণের আগেই অর্ণবযানে তাঁর মৃত্যু হল।

অযোধ্যার নতুন রেসিডেন্ট্ হয়ে এলেন জেনারেল আউটরাম। লর্ড ডালহাউসির বিশেষ বার্তা নিয়ে তিনি লক্ষ্ণৌতে পেঁছিলেন।

পাঁচ বছর আগে স্লীম্যানের চিঠিতে যেমন ছিল—'নভেম্বর, ১৮৫১—সোনার মোহর সব গলিয়ে ফেলা হয়েছে আর আমাদের প্রমিসরি নোট, চার লক্ষ ছাড়া, দিয়ে দেওয়া হয়; টাকার বিষয়ে আমার মনে হয়, মাত্র তিন লক্ষ অবশিষ্ট আছে; সুতরাং রিজার্ভ রাখা তহবিল শূন্য হয়ে যাবে ১৮৫১ সাল শেষ হবার আগেই। ওদিকে রাজপরিবারের সাংসারিক আর বৃত্তিধারীদের প্রাপ্য বাকি পড়েছে, এক থেকে তিন বছর পর্যন্ত। পঞ্চাশ লক্ষ টাকাতেও এই সব বকেয়া মেটানো যাবে কিনা সন্দেহ—নতুন রেসিডেন্ট আউটরাম যখন লক্ষ্ণৌতে হাজির হলেন তখনো একই অবস্থা। ১৮৫৬ সালের ৩ জানুয়ারি তিনি পেঁছিলেন। তাঁর পকেটে গভর্নর জেনারেলের চরম পত্র।

রেসিডেন্ট সাহেব লক্ষ্ণৌ দরবারে এলেন। আলাপ-পরিচয় করলেন নবাব ওয়াজিদ আলীর সঙ্গে। কিন্তু আসল কথা কিছুই ভাঙলেন না।

একসময়ে জনান্তিকে দেখা করলেন আলী নাকি খাঁর সঙ্গে। নবাবের উজীর এবং এক শ্বশুর আলী নকি। তাঁকে লর্ড ডালহাউসির লিপির কথা জানালেন। বুঝিয়ে দিলেন ইংরেজ সরকারের বক্তব্য।

আলী নকি তাজ্জব বনে শুনলেন গভর্নর জেনারেলের ঘোষণা—

নবাবের অযোগ্যতার কারণে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কম্প্যানি আউধ্ রাজ্য অধিকার করতে চান। নবাবকে বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা এবং তাঁর পরিবারের জন্যে তিন লক্ষ টাকা বৃত্তি দেবেন তাঁরা।

উজীরকে এই মর্মে জানিয়ে রেসিডেন্ট অনুরোধ করলেন, 'নবাবের ওপরে আপনার প্রভাব খাটিয়ে তাঁকে এই প্রস্তাবে রাজি করুন। কম্প্যানী তাহলে আপনার সহায়তার কথা মনে রাখবে।'

জেনারেল আউটরাম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিও দেন আলী নকি খাঁকে, যদি তিনি নবাবকে সম্মত করাতে পারেন রাজ্যত্যাগে।

উজীর মধ্যস্থতা করলেন। নবাবকে জানালেন গভর্নর জেনারেল তথা ইংরেজ সরকারের ইচ্ছার কথা।

শুনে, ওয়াজিদ আলী শাহ্ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

এত দূর যাবে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কম্প্যানী? তাঁর রাজ্য কেড়ে নেবে? দশ পুরুষের নবাবীর হক্দার তিনি! তাঁকে উচ্ছেদ করে দেবে দরিয়া পারের ইংরেজ!

আলী নকি খাঁ আর রেসিডেন্ট্ পক্ষের সঙ্গে নবাবের কথাবার্তা চলল। বাদ, প্রতিবাদ। আপত্তি, অনুরোধ। অতি রূঢ় বাস্তবকে মোলায়েম কথার আচরণে ঢাকার প্রয়াস। রাজনৈতিক চাতুরী চালাচালি হল বিস্তর।

নবাবের মনে প্রথম প্রতিক্রিয়া জাগল—বেদনা। ক্রোধ নয়। বৃটিশ মতলব চূর্ণ করবার বাসনা কিংবা শপথও নয়। নিজের অধিকার কায়েম রাখবার কোন উদ্যোগ, তৎপরতাও নয়। ওয়াজিদ আলীর কাঠামো-ই অন্য ধাতুর। পৌরুষের অভাব। তাঁর পুরুষত্ব কেবল রমণী আসঙ্গে।

তিনি আবেদন নিবেদনের রাস্তা ধরলেন।

আউটরামকে সকরুণ মিনতি জানাতে লাগলেন নবাব। তাঁর প্রতি বড়ই অবিচার করা হল! তাঁর কি দোষ? রাজ্যে বিশৃংখলার জন্যে দায়ী তো কর্মচারীরা! সেজন্যে রাজার রাজ্য খোয়া যাবে কেন? আগেও তো আউধে বহুৎ বেবন্দোবস্ত ছিল। তাঁর বাপ্ দাদার নবাবী বরবাদ হয়েছিল কি?

কিন্তু এসব যুক্তি শুনতে বৃটিশ সরকার নারাজ। নবাব চোখের জলও ফেলেছিলেন, শোনা যায়। কিন্তু মন গলেনি ইংরেজ পক্ষের।

তাঁরা আপোসে ব্যাপারটা ফয়সলা করতে চাইলেন। রেসিডেন্ট্ চেষ্টা করতে লাগলেন, নবাব যেন রাজি হন তাঁদের প্রস্তাবে। যেন জোর না করতে হয়। তাঁর সঙ্গে একটি লিখিত চুক্তি হতে পারে। সেই সম্মতিপত্রে স্বাক্ষরের জন্যে নবাবের ওপর চাপ দেওয়া হতে লাগল।

কিন্তু দস্তখত করতে রাজি হলেন না ওয়াজিদ আলী শাহ্।

তখন জেনারেল আউটরাম অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। ইংরেজ সৈন্যদল আর অফিসারদের নিয়ে ঘিরে ফেললেন কাইসার বাগ। স্বয়ং রক্ষীদল নিয়ে নবাবের সঙ্গে প্রাসাদে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁকে সরকারীভাবে জানিয়ে দিলেন গভর্নর জেনারেলের নির্দেশ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্প্যানী তাঁকে গদীচ্যুত আর অযোধ্যা অধিকারের সংকল্প করেছেন।

আউধের নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্কে আনুষ্ঠানিকভাবে মসনদ হারাতে হল সেদিন (৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬)।

চুক্তিপত্রে সই করার জন্যে নবাবকে তিন দিন সময় দেওয়া হল।

কিন্তু তার আর কি প্রয়োজন ? অর্থই বা কি ?

নবাব স্বাক্ষর দিতে অসম্মত হলেন।

চুক্তি হয় সমানে সমানে। তিনি এখন বিজিত। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কম্প্যানী বিজেতা। এখন বাহুবলে রাজ্য বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে তাঁর প্রতি বড় অবিচার করা হয়েছে !

অরণ্যে রোদনের সামিল হল নবাবের সব আবেদন নিবেদন।

জেনারেল আউটরাম ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কম্প্যানীর পক্ষে গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধিস্বরূপ অযোধ্যার রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিলেন।

নবাব কার্যত বন্দী রইলেন কাইসর বাগে। তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হল।

রেসিডেন্টের তরফে রাজ্যবাসীদের উদ্দেশে ঘোষণা শোনা গেল—কুশাসন ও বিশৃঙ্খলার জন্যে তাদের দুর্ভোগ হচ্ছিল। সেজন্যে এই নতুন ব্যবস্থা।

ইংরেজ পক্ষ থেকে নবাবকে অবশ্য অত্যাচারী বলা হয়নি।

এই পালাবদল ঘটেছিল নির্বিবাদে। নবাব আদৌ বিদ্রোহের চেষ্টা কিংবা বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ করেন নি। ইংরেজদের অভিসন্ধি জানবার পরও যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সে ধরনের ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল না।

বরং নবাবের পক্ষেও সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল—

তাঁর সব উচ্চ রাজকর্মচারী, মন্ত্রী, চাকলাদার, নাজিম, সেপাই আর গ্রামের পদস্থ কর্মচারীরা যেন ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কম্প্যানী নিযুক্ত অফিসারদের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করেন।

সরকারী ভাবে ভেঙে দেওয়া হল নবাবের আমলের সেনাদল, রক্ষীদল আর শহর ও রাজ্যের যা ছিল গোলন্দাজ।

সুতরাং বৃটিশ তৎপরতার জবাবে নবাবের আচরণে কোন প্রতিরোধের চিহ্ন দেখা যায়নি।

এ বিষয়ে এলিহু জানের বিবৃতি দেওয়া হবে পরে। এখানে অযোধ্যার এক জমিদারের উক্তি উদ্ধৃত করা যায়।

ওয়াজিদ আলীর গদিচ্যুতির কথা শুনে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—'সরকার কেন যে নবাবকে সিংহাসন থেকে নামালেন ! তিনি তো নেহাত গোবেচারা জীব··· তাঁকে উচ্ছেদ করবার কি দরকার হয়েছিল ?'

জমিদার মশায় বোঝেননি সে কথা।

লর্ড ডালহাউসির আগ্রাসী নীতি চরিতার্থ করতে ওয়াজেদ আলীর উচ্ছেদ প্রয়োজন ছিল। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের তখন সম্প্রসারণ সুপ্রতিষ্ঠ করার যুগ। তার ভিত পাকাপোক্ত করার দরকার। সেজন্যে শুধু অযোধ্যা কেন ? উত্তর, মধ্য ভারতের ছোট বড় নানা রাজ্য ইংরেজ-শক্তি গ্রাস করে চলেছে। অবধ অবরোধের সাত আট বছর আগে থেকে।

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের (১৯৪৮-৪৯) পর ডালহাউসির পাঞ্জাব অধিকার। শিখ্ শক্তি বিধ্বস্ত হয়ে গেল। তারপর নাগপুর রাজ্যও অধিকার করে নিলেন গভর্নর জেনারেল। তেমনি ঝাঁসি, সাতারা, সম্বলপুরের ছোট ছোট রাজ্যগুলিও। নানা-

সাহেবকে বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করা হল। এক এক রাজ্যে একেক অজুহাত।

অযোধ্যায় ছুতো হল, অযোগ্য প্রশাসন। বিশৃঙ্খলার জন্যে নবাব পক্ষে দায়িত্বের কথা বলা হল। কিন্তু সৈন্য পোষণের বাবদ ইংরেজ সরকার যে মোটা টাকা আদায় করে নেয়, সে অপরাধের কথা জানায় কে! এই শোষণের ফল প্রশাসনিক কাঠামোতে মারাত্মক ভাবে পড়ে। আউধ রাজকোষ থেকে ইংরেজদের সেনাদলের জন্যে বিপুল ব্যয়—বিপর্যয়ের এক প্রধান কারণ। অথচ তার সুযোগ নিল ধূর্ত বৃটিশ কর্তৃপক্ষ!

আসলে, আগেকার নবাবী আমল থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত আউধ রাজ্যের ইতিহাস —ভারতে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তারের একটি প্রাদেশিক সংস্করণ। একই সাম্রাজ্য-লিপ্সু স্বার্থের পরিণতি এই অন্যায় রাজ্য গ্রাস। আসফুদ্দৌলা থেকে ওয়াজিদ আলী পর্যন্ত সব অবধ নবাবরাই ইংরেজ শক্তির বংশবদ, তাঁবেদার, দাবার ঘুঁটি বিশেষ। বৃটিশ ঐতিহাসিক স্যর জন উইলিয়াম কেরিও সুস্পষ্ট জানিয়েছেন যে, নবাবরা—'False to their people, false to their manhood—they were true to the British Government.' তবু সাম্রাজ্য বিস্তারের যূপকাষ্ঠে অযোধ্যার বলিদান হল!

এই উদ্ধত আগ্রাসনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাজ্যের নানা শ্রেণীর লোক। তারই প্রতিক্রিয়ায় বিদ্রোহের আগুন বেশি জ্বলে ওঠে আউধেই। আর তা নেভাতে প্রায় প্রাণান্ত হয়েছিল ইংরেজদের। সে মহা বিদ্রোহের উপযুক্ত নেতৃত্ব যদি থাকত, হয়ত—'ভারতের ইতিহাস হত অন্য রূপ।'

ওয়াজিদ আলীর আরো কিছু সংবাদ আছে লক্ষ্ণৌতে, সেই অন্তিম পর্যায়ে।
সিংহাসন বঞ্চিত হবার পর তিনি মাসখানেক থাকেন রাজধানীতে।
এ সময়টিও তিনি কেবল আর্জি পেশ করেছেন। আর তদ্বির তদারক।
কলকাতায় কর্তাদের কাছে হরদম পাঠিয়েছেন দূতের পর দূত।
তাজুদ্দিন হুসেন খাঁ, আহমদ হুসেন খাঁ, হকীম আবুল হাসান, গুলাম জিলানী
এবং আরো অনেকে নবাবের ওকালতী করতে গেছেন কলকাতায়,
ইংরেজ সদর দফ্তরে। আর ব্যর্থ হয়ে লক্ষ্ণৌতে ফিরে এসেছেন।
নবাব শেষ মেশ পাঠালেন মহম্মদ মসিহুদ্দিনকে। সে দৌত্যও বিফলে গেল।
হতাশ্বাস ওয়াজিদ আলী অবশেষে ত্যাগ করলেন লক্ষ্ণৌ (৩ মার্চ ১৮৫৬)।
তাঁর সঙ্গে খাস মহল সাহেবা অর্থাৎ প্রধানা বেগম এবং আরো
চার পাঁচ জন বেগম যাত্রিণী। নানা পেশার লোকজন খিদমদগারও
রইল নবাবের দলে। কিন্তু সংখ্যায় খুব বেশি নয়, প্রথম দফায়। তবে
মণি মুক্তো হীরে জহরৎ সোনা চাঁদি প্রচুর সঙ্গে নিয়েছিলেন নবাব।
খাস মহল সাহেবার সঙ্গে খাস ধন দওলৎও যথেষ্ট ছিল। জনশ্রুতি এই যে, সেই
তহবিল থেকে তিনি নাকি দিতেও চান ওয়াজিদ আলীকে। কারণ নবাবের
বৃত্তিনির্দিষ্ট হয়েছে বছরে বারো লাখ্। মাসে মাত্র লাখ্ টাকা ভাতা!

শুনে, খাস মহল বেগম নাকি নবাবকে বলেছিলেন, আপনি এ টাকা নেবেন না! মাসে এক লাখে কি হবে আপনার? এই সামান্য টাকার জন্যে ইংরেজের কাছে হাত পাতবেন? তার চেয়ে আমার যা তহবিল আছে তাই থেকেই নেবেন।'

নবাব কিন্তু ভেবেচিন্তে বেগমের কথায় রাজি হননি। ইংরেজদের বৃত্তি হাত-ছাড়া করে বেগমের ওপর নির্ভর করা ঠিক মনে হল না তাঁর।

কিন্তু যদি নবাব রাজি হতেন, তাহলে খাস মহল সাহেবা মাসে লাখ টাকার মতন দিয়ে যেতেন তো!

নবাবের নিজস্ব ধন দওলৎও তখন বিস্তর ছিল। কারণ পরে মেটিয়াবুরুজে নবাবীও চলে দস্তুরমত। বার্ষিক বারো লাখে তাঁর কি হবে? নবাবের সেসব হীরে জহরৎ অনেক প্রয়োজন মেটায় সে পর্বে।

সেই সব অস্থাবর নগদ সম্পদ নবাব পরিবার লক্ষ্ণৌ থেকে নিয়ে যান। আর নবাব-জননীর হীরে জহরৎ মণি মাণিক কত যে থাকে লক্ষ্ণৌতে। আমজাদ আলী শাহ্‌র বেগমের সেই গুপ্ত রত্ন ভাণ্ডার! এলিহু জানের বিবরণে তা জানা যাবে।

এখন নবাবের কটি গান রচনার কথা। তাও শেষের মাসটিতে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি থেকে ৩রা মার্চের মধ্যে। লক্ষ্ণৌতে।

কবি-গীতিকার-সুরকার ওয়াজিদ আলী শাহ্‌র তা এক স্মরণীয় দান। জীবনের এক চরম বেদনাকে তিনি পরম সৃষ্টিতে রূপ দিয়েছিলেন। রাজ্য হারাবার আর দেশ ত্যাগের হাহাকার চিরকালীন গাথা হয়ে উঠেছে তাঁর গানে। হৃদয়ের গভীর অনুভবে আকুতিতে স্পন্দমান। নবাবের বিদীর্ণ প্রাণের আর্তিতে সকরুণ তার প্রতি ছত্র।

নির্বাসিত ওয়াজিদ আলীর সেই মর্ম ক্রন্দন—

ঘর ছোড় চলি লখ্‌নউ, নগরী
কহ হাল আদম প্যারে ক্যা গুজারি ।।
আদম গুজারি সদম গুজারি,
যব হম্‌ গুজারি দুনিয়া গুজারি ।।

কিংবা বাবুল মেরা নৈহারা ছুট্‌ যায়।
চার কাহার মিলে ডুরিয়া উঠাও।
আপনা বেগানা সব ছুট্‌ যায় ।।

আরো একটি গান নবাবের এখনকার রচনা—

আংরেজ বাহাদুর জুলুম কিয়া,
মেরা মাল্‌ মুল্‌কো সব লুঠ লিয়া।

তিনটি গানই ঠুংরি অঙ্গের। তার মধ্যে দ্বিতীয়টি উৎকৃষ্ট ঠুংরি হিসাবে সঙ্গীত জগতে বেঁচে আছে আজো মর্মরিত হয়ে ভৈরবীর সকরুণ আবেদনে, আসরে আসরে—'বাবুল্‌ মোরা নৈহরা ছুট্‌ যায়।' এটি রচনাকার ওয়াজিদ আলীর একটি শ্রেষ্ঠ গান। 'যব ছোড় চলি লখনউ নগরী'-ও হয়ে রয়েছে লক্ষ্ণৌ চালের ঠুংরির একটি সুপরিচিত নিদর্শন।

কিন্তু এমনি বিষয় বস্তু নিয়ে ঠুংরি গান? তার বেশি দৃষ্টান্ত কি আছে সঙ্গীত জগতে?

কিংবা 'আংরেজ বাহাদুর জুলুম কিয়া। মেরা মাল্ মুল্‌কো সব লুঠ লিয়া'-কে ঠুংরি অঙ্গে গড়বার কথা কি ভাবতেন অন্য কোন রচনাকার ?

কারণ ঠুংরি তো শৃঙ্গার রসের গান। বিষয়ের দিক থেকে বিরহ মিলনের প্রেম গীতি। রাধাকে উপলক্ষ্য করে নায়িকা ভাবের রূপকার হন ঠুংরি রচনাকার কিংবা ঠুংরি গানের শিল্পী। দয়িতের জন্যে হৃদয়ের আকুতিকে কত ভাবেই এ রীতির গানে প্রকাশ করতে হয়। রাগ সঙ্গীতের মধ্যে থেকেও তাই ঠুংরিতে কাব্য সঙ্গীতের আবেদন। তাই অন্তরের অনুভবকে রম্য সুরে নিবেদন করতে এই গানে রাগ মিশ্রণ স্বীকৃত। ঠুংরি চালের বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে প্রেমের ভাবানুষঙ্গে।

প্রিয় নগরী থেকে চির বিদায়, পিতৃ পুরুষের বাসস্থল ত্যাগ কিংবা রাজ্য, সম্পদ হারাবার দুঃখ কখনো ঠুংরি গানের বিষয়বস্তু রূপে কখনো দেখা যায়নি।

ওয়াজিদ আলী শাহ্ তার অনন্য ব্যতিক্রম। এখানেই তাঁর বিশেষত্ব। ঠুংরি গান ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় রীতির সঙ্গীত। প্রেমের বিষয় অবলম্বনে ঠুংরি গান তিনি রচনা করেছিলেন। তার উদাহরণ দেওয়া হবে শেষ অধ্যায়ে। লক্ষ্ণৌ দরবার থেকে ঠুংরি গান ব্যাপক প্রচলনের জন্যেও তাঁর নাম করা যায়। ঠুংরি গায়ক গায়িকা রচনাকারদের দরবার থেকে দস্তুরমত পোষকতা করতেন নবাব। লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ ঠুংরি রচয়িতা, ঠুংরি শিল্পী সনদ পিয়া তাঁর সমকালীন। সনদ পিয়ার (আসল নাম তবক্কুল হোসেন খাঁ) প্রচুর ঠুংরি গান রচনা আর পরিবেশনাও ওয়াজিদ আলীর দরবারে। তাঁরই উৎসাহে, আনুকুল্যে। নবাব নিজে একাধারে ঠুংরি-রচনাকার, ঠুংরি-গায়ক, ঠুংরি গানের দরদী এবং ঠুংরি গুণীদের মুক্তহস্ত পৃষ্ঠপোষক। উত্তর ভারতে ঠুংরির তিনটি রীতি প্রধান হিসেবে বিখ্যাত। তার অন্যতম লক্ষ্ণৌ চালের ঠুংরি। অন্য দুটি হল, বেনারসী আর পাঞ্জাবী ঠুংরি। সেই লক্ষ্ণৌ ঠুংরির একজন প্রচলনকর্তা-রূপেও ওয়াজেদ আলী শাহ্‌র নাম আছে স্বীকৃত।

এই লক্ষ্ণৌ ঠুংরির চাল নবাবের কাছে সবচেয়ে মনোহারী। তাই 'যব ছোড় চলি লখনউ নগরী', কিংবা 'বাবুল মোরা নৈহারা ছুট্ যায়' বা 'আংরেজ বাহাদুর জুলুম কিয়া'র মতন বিয়োগান্তক বিষয়েও ঠুংরি গান করেছেন নবাব। কারণ ঠুংরি তাঁর মনকে সব চেয়ে বেশি টানে ; তাঁর তখনকার আন্তরিকতা আর আকুলতা তিনি ব্যক্ত করেছেন ঠুংরিতেই। তাঁর প্রাণের সত্য 'যব ছোড় চলি লখনউ নগরী' কিংবা 'বাবুল মোরা নৈহারা ছুট্ যায়' গান দুটিতে শিল্পসৃষ্টিতেও সত্য হয়ে উঠেছে। শ্রোতার মনে এ প্রশ্ন জাগেনা যে তা ঠুংরী রীতিতে নিয়মসম্মত বা প্রচলিত কিনা। সঙ্গীত জগতে স্বীকৃত ঠুংরিতেও থাকে কারুণ্যের আবেশ। মিশ্র খাম্বাজের ঠুংরি নায়িকার আকুল ভাবের অভিব্যক্তিতে মর্মন্তুদ হতে পারে। কিন্তু 'বাবুল মেরা নৈহারা ছুট্ যায়' গানের করুণতা ভিন্ন প্রকৃতির। তা নবাবের নীড় হারাবার, দেশ ছাড়বার আর্ত ফুকার !

ওয়াজিদ আলী শাহ্ চৌত্রিশ বছর বয়সে রাজ্য খোয়ালেন। ছাড়তে হল দশ পুরুষের নবাবী। সাত পুরুষের লক্ষ্ণৌ দরবার আর লক্ষ্ণৌবাস উঠিয়ে দিলেন। সাদৎ খাঁর পরম্পরা উন্মূলিত হয়ে গেল অযোধ্যার মাটি থেকে।

প্রায় দেড়শ বছরের জীবনাট্যধারায় যবনিকা পতন হল !

'এলিহু জানের বৃত্তান্ত বা এক প্রাচ্য রাণীর নেপথ্য জীবন'

ওয়াজিদ আলী শাহ্‌র লক্ষ্ণৌ ত্যাগের প্রাক্‌-কালীন কিছু বিবরণ পাওয়া যায় আরেক সূত্রে। কাইসর বাগ প্রাসাদপুরীর তখনকার অভ্যন্তরীণ সেসব সংবাদ। সেই সঙ্গে নবাব-জননীর গুপ্ত রত্নাগারের কৌতূহলোদ্দীপক সমাচারও। উইলিয়ম নাইটন লিখিত Elihu Jan's Story or Private Life of Eastern Queen পুস্তকটি তারই অন্তরঙ্গ বিবরণী। তৎকালীন নবাব পরিবারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং রাজ্য হারাবার অব্যবহিত পরে ওয়াজিদ আলীর একটি ঘনিষ্ঠ চিত্র এই বইখানিতে প্রকাশ পেয়েছে। পুস্তকটি অবশ্য ইংরেজের লেখা। অর্থাৎ নবাবের শত্রুপক্ষীয় রচনা। লেখক উইলিয়ম নাইটন হলেন তখনকার অযোধ্যার অ্যাসিস্টান্ট্‌ কমিশনার। কিন্তু তাহলেও তাঁর বিষয়বস্তু প্রকৃত রূপে গ্রহণযোগ্য। কারণ তা আসলে এলিহু জান্‌ নামে নবাব পরিবারে নিযুক্তা এক নারীর প্রদত্ত বিবরণ।

এলিহু জানের এই বিবৃতি নির্ভরযোগ্য এই কারণে যে সে ছিল ওয়াজিদ-জননীর এক খাস পরিচারিকা। তার নিকটে উদ্ধার করা উইলিয়ম নাইটনের এই প্রতিবেদন।

বইখানির ভূমিকায় এলিহু জানের পরিচয় মিস্টার নাইটন জানিয়েছেন—

'এলিহু কাল্পনিক চরিত্র নয়। সে লক্ষ্ণৌ নবাব অন্তঃপুরে তার সাত বছর বয়স থেকে অনেক বছর প্রতিপালিত হয়েছিল। অযোধ্যার রানীর (অর্থাৎ ওয়াজিদ আলীর মাতার) হুকাবরদার ছিল সে এবং সেই হেতু প্রাসাদের অনেক ঘটনার সম্পর্কে তার ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। বিদ্রোহের পরে প্রথমে সে লক্ষ্ণৌর ধনী বণিক মিঃ জোহানেসের পরিবারে আয়ার কাজ করে এবং পরে আমার পত্নীর কাছে একই কর্মে নিযুক্ত হয়। আমাদের সঙ্গে সে প্রায় তিন বছর থাকে ও এখনো আছে এবং আমি যতদূর পর্যন্ত রানীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত তার বিবরণ যাচাই করেছি তাতে আমি দেখেছি যে, সে সব সত্য। সুতরাং আমি আগাগোড়া সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং আমি যতখানি সম্ভব তার নিজের কথা ও তার নিজের ধারণা সমেত বিবৃত করেছি।'

Elihu Jan's story or The Private Life of an Eastern Queen পুস্তকটি থেকে এখানে অংশ বিশেষ অনুবাদ করে দেওয়া হল ঃ—

'আমজাদ আলী শাহ্ তাঁর কাঁধের ওপর একটা ফোড়া কিংবা কোন রকম ঘার ফলে মারা যান। আর আমি আমার মনিব, রানীমাকে বলতে শুনেছি যে ঘাটা নিশ্চয় কেউ বিষাক্ত করে দিয়েছিল। খুব সম্ভব তাঁর চিকিৎসকদের মধ্যে কেউ এ কাজ করে, তাঁর মৃত্যুতে সবচেয়ে লাভবান হবে এমন কারুর উৎকোচে বশীভূত হয়ে।...

...প্রাসাদে এরকম কথা বলাবলি হত...ওয়াজিদ আমজাদকে হত্যা করেছে।...

বছর গড়িয়ে চলে, আর কানাঘুষা শোনা যায় যে গতিক খুব ভাল নয়। বলাবলি হতে থাকে, ইংরেজ খুব রেগে গেছে রাজার ওপর। তিনি সারা সময় নাচ, গান আর বাজে বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট করেন—কখনো মেয়ে মানুষের বেশে কখনো পুরুষের পোষাকে। তাঁকে ঘিরে থাকে বেগমরা আর খোজারা। আমার মনিব, রানীমা, প্রায়ই তাঁকে তিরস্কার করেন আর তাঁর নির্বুদ্ধিতা ও তিরস্কারে কর্ণপাত না করার জন্যে খুবই কাঁদেন।

শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত কাণ্ড ঘটল। একদিন সকালবেলা রোজকার মতন রানীমা স্নানের পরে সাজগোজ করছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে আনা হল একটি বড় সিল করা চিঠি। যে সেটি এনেছিল সে জানালে যে, উজীর পাঠিয়েছেন আর ওটা বড় জরুরি। রানীমা খামখানি খুলে চিঠি পড়লেন। আমি তখন আলবোলায় তামাক সাজছিলুম সেই ঘরেই। দেখলুম চিঠিটা খোলা আর তা পড়তে পড়তে রানীমার মুখ ক্রমেই বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শেষকালে তিনি চিঠিটা হাতে নিয়ে, জুতো পরবার জন্যে না থেমেই প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন উঠানে, 'রাজ্য খতম হয়ে গেল' বলতে বলতে।

সেই উঠান আর দৌলৎখানার পরেই রাজার মহল। সেই দিকে ছুটে চললেন রানীমা, খালি মাথা আর খালি পায়ে। আমরা কজনও তাঁর পিছনে পিছনে দৌড়লুম। কেউ মসলিন চাদর বা ওড়নি নিয়ে, কারুর হাতে জুতো, কেউ নিয়েছে

ছাতা। আমরা তাঁকে যখন এসব জিনিস এক একটা করে হাতে দিতে গেলুম, তিনি আমাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন।

'না, না,' তিনি বলে উঠলেন, 'আমার কোন লোক না হলেও চলবে। মসনদ খুইয়েও বাঁচতে হবে তো—এই বুড়ো বয়সে হয়ত বাড়ি-ছাড়া হয়ে না খেয়ে দিন কাটবে।'

রানীমা কাঁদতে কাঁদতে চললেন। আর তাঁর সঙ্গে আমরাও চললুম বুক চাপড়াতে চাপড়াতে, যদিও আমরা জানতুম না ব্যাপারটা আসলে কি ঘটেছে।

রানীমা বিনা ঘোষণায় এবং না জানিয়ে সোজা রাজার, তাঁর ছেলের ঘরের মধ্যে চলে এলেন। কেউ তাঁকে বাধা দিল না, সকলেই সরে দাঁড়াল নির্বাক বিস্ময়ে।

রাজা একলা বসে কাঁদছিলেন। তিনি যখন তাঁর মাকে ঘরে ঢুকতে দেখলেন, দুহাতে মুখ ঢেকে সজোরে কেঁদে উঠলেন।

রানীমা এগিয়ে যেতে যেতে তিনবার কুর্ণিস করে বললেন—এবার আশ মিটেছে? নাচ, গান আর হৈ-হল্লার মাশুল এখন পেলি তো? আমি তোকে কতবার বলেছি না, ওসবের শেষ এই রকমই হয়? তোর কোন বাপ, দাদা কখনো নাচ, গান আর হল্লা করেছে মেয়েমানুষ সেজে?'

রাজা একটা কথাও বললেন না।

রানীমা আমাদের দিকে ফিরে বললেন,—আমাদের একা থাকতে দে।' তখন আমরা সবাই ঘুরে চলে এলুম। রানীমা আমাদের একজনের কাছ থেকে তাঁর ওড়নি নিয়ে রইলেন ছেলের কাছে।

বিকাল দুটো না তিনটের সময় ইংরেজ রেসিডেণ্ট এলেন আর সেখানে একটা বড় বৈঠক বসল, তাতে রানীমাও উপস্থিত থাকলেন।

লক্ষ্ণৌর ছাউনি থেকে সৈন্যরা এসেছিল। প্রাসাদ থেকে সব কামান সরিয়ে নেওয়া হল আর আমরা শুনলুম যে রাজার রাজত্ব শেষ হয়ে গেল। আরম্ভ হল ইংরেজরাজ।

রাজ্যের বড় বড় লোকেরা এসে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে সৈন্য আর গোলাবারুদ দিতে চাইলেন। কিন্তু তাতে রাজি হলেন না রাজা। তাঁরা তখন রানীমার কাছে এলেন। তিনি তাঁদের কাছে এক রাত সময় চাইলেন প্রস্তাবটা ভেবে দেখবার জন্যে। পরের দিন সকালে তিনি জানালেন—'না'।

সেদিনই রানীমা আমাদের সকলের কাছে ঘোষণা করলেন তাঁর ইংলণ্ডে যাবার সংকল্প। 'আমি যাব,' তিনি বললেন, 'ইংরেজদের রানীর কাছে। তিনিও ছেলের মা। আমি তাকে বলব, আমার ছেলের মুকুট যেন তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া না হয়। তাঁর কি মুকুট, রাজ্য আর ঐশ্বর্যের কিছু অভাব আছে? পৃথিবীশুদ্ধ সবই কি হবে একজনের?'...

তারপর এলিহু জানের এই বিবরণ থেকে জানা যায়—সুদূর যাত্রার জন্যে প্রাসাদে নানা রকমের প্রস্তুতি আরম্ভ হল। সেই প্রাসাদের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড জলাধার ছিল। তার নীচে গোপনে তৈরি করা হল একটি বিরাট ঘর। তাতে ওয়াজিদ জননীর বহুমূল্য রত্নাদি, সোনা রুপা, নানা আসবাবপত্র—যা তিনি

ইংলণ্ডে নিয়ে যেতে চাননি—লুকোনো রইল। মাটির নীচের ঘরে সেসব ব্যবস্থা করে রেখে পর পর চাপা দেওয়া হল গদি, অয়েল ক্লথ এবং ওয়াক্স ক্লথ। শেষে সে ঘরের সমতল ছাদ গেঁথে ফেলা হল বড় বড় কড়ির ওপর ভর করে। সেই ছাদই দাঁড়াল চৌবাচ্চার মেঝে। তারপর চৌবাচ্চায় জল ভরে দেওয়া হল।

এমনিভাবে রাজমাতার কয়েকলক্ষ টাকার সম্পদ রয়ে গেল সেই চোরকুঠুরিতে। এলিহু জানের মতন প্রাসাদের কয়েকজন মাত্র ব্যাপারটা জানত, এমন গোপনে সব করা হয়।

এলিহুজানের বিবৃতি থেকে আরো এক পারিবারিক কথা জানা যায়। ওয়াজিদ আলীর প্রধানা বেগম খাসমহলের সঙ্গে দীর্ঘকালের মনোমালিন্য ওয়াজেদ-জননী স্বয়ং সাক্ষাৎ করে মুছে ফেলেন ইংলণ্ডে যাত্রা করার দিন।

'আকুল হয়ে অতি আকুল হয়ে রানীমা সেদিন কেঁদেছিলেন, যেদিন তিনি ওয়াজিদ আলী ও তাঁর সন্তানদের কাছে বিদায় নিয়ে বিদেশ যাত্রার জন্যে স্টীমারে উঠতে যান'—একথা এলিহু জানের বিবরণীতে পাওয়া যায়।

সেই ওয়াজিদ জননী মালিকাই-কিশওয়ারের শেষ যাত্রা। তিনি লক্ষ্ণৌ বা ভারতবর্ষে ফিরতে পারেননি। তাঁর ইউরোপ যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন ওয়াজিদ আলীর ভ্রাতা সিকান্দার হাসমৎ ও এক পুত্র। সে যাত্রায় ওয়াজিদের মাতা এবং সিকান্দার হাসমৎ দুজনেরই বিদেশে মৃত্যু ঘটেছিল।

ইংলণ্ডে ওয়াজিদ জননীর দৌত্য ব্যর্থ হয়। তাঁর আবেদন গ্রাহ্য করেননি মহারানী ভিক্টোরিয়া। অর্থাৎ তাঁকে চালিত করতেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের যেসব কর্ণধার। হতাশায় প্রত্যাবর্তনের পথে প্যারিসে তাঁর মৃত্যু হয়। ওয়াজিদ-পুত্রের জীবনাবসান হয়েছিল প্যারিসেই। কয়েক দিনের আগে পরে এই দুটি মৃত্যু সেখানে ঘটে যায়।...

ওয়াজিদ-জননীর গুপ্ত ভাণ্ডারের আরো সংবাদ আছে। এই তথ্যও পাওয়া যায় এলিহুজানের কাহিনী থেকে। এটি অবশ্য নবাবের লক্ষ্ণৌ ছাড়বার পরের ঘটনা।

তিনি যখন কলকাতায় চলে আসেন, তখন তাঁর অধিকাংশ বেগমই লক্ষ্ণৌতে থেকে যান। তাঁদের অন্যতমা ছিলেন হজরৎ মহল। পরের বছর লক্ষ্ণৌতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় হজরৎ মহল বিদ্রোহী পক্ষে যোগ দেন। তাঁর দশ বছরের পুত্র বিজিস কাদ্‌রকে বিদ্রোহী সেনাদল অধিষ্ঠিত করে লক্ষ্ণৌর শূন্য সিংহাসনে। (লক্ষ্ণৌ বিদ্রোহের এক স্মারকরূপে হজরৎ মহলের মর্মরমূর্তি সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে লক্ষ্ণৌতে স্থাপিত আছে, একথাও প্রসঙ্গত বলে রাখা চলে।)...

ঠিক কোন্ সময়ে জানা যায়নি, হজরৎ মহল সেই লুকোনো ভাণ্ডারের কথা শোনেন। তারপর অনেককে জিজ্ঞাসা করতে করতে সন্ধান পেয়ে যান গুপ্তরত্নের; এবং সমস্তই হস্তগত করে নেন।

সে যাই হোক, জননী ও পুত্র ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ওয়াজিদ আলী ত্যাগ করে গেলেন লক্ষ্ণৌ। বোধহয় তাঁরও ইংলণ্ডে দরবার করতে যাওয়ার কথা প্রথমে হয়েছিল। কারণ এইরকম বিষয়বস্তু নিয়ে একটি গান মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে পড়ে এই সময়ে। গানখানি কার রচনা সঠিক বলা যায় না। কোন কোন মতে এ

নবাবেরই রচিত। কিন্তু তাহলে এখানে নবাবকে তৃতীয় ব্যক্তিরূপে বর্ণনা করা হবে কেন? তাঁর বিরহে গলিতে গলিতে বারাঙ্গনারা বিলাপ করবে এমন উক্তিও কি থাকতে পারত নবাবের রচনায়?

গানটির কটি লাইন হল—

নিমকহারামে মুলুক বিগাড়া,
হজরত যাতে লণ্ডন কো।
মহল মহল মে বেগম রোঁয়ে,
গলি গলি রোঁয়ে পাথুরিয়া।

মনে হয়, এ গান লক্ষ্ণৌর অন্য কোন ব্যক্তির রচনা।

নবাব লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করলেও সেখানে তাঁর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় রয়ে গেল। নবাব সেসব দেখাশোনার ভার দিলেন পিসেমশায় নবাব হাসাজুদ্দৌলাকে।

সাদৎ খাঁ বুরহান-উল্-মুলক্ ন্যাসাপুরীর বংশধর বিদায় নিতে, অযোধ্যার ইতিহাসে আরেকটি পালাবদল ঘটল। বৃটিশ শাসন আরম্ভ হল ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কম্প্যানীর বকলমে।

নির্বাসিত নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্।

মার্চ মাসের ৩ তারিখে তিনি কাইসর বাগ থেকে সদলে যাত্রা করলেন। তখনো তাঁর সঙ্গে থাকে ইংরেজ প্রতিনিধি।

লক্ষ্ণৌ থেকে তাঁদের কলকাতার পথ পরিক্রমা হল এই রকম ঃ—

কাইসর বাগ এলাকা থেকে খানিক দূরে এসে একবার তাঁরা থামলেন খুদা বখ্সের কারবালায়। সেখানে তখন গানের আসর চলছিল।

নবাব গাড়ি থেকে নেমে, যোগ দিলেন সে আসরে।

তাঁর সারিবদ্ধ শকটের যাত্রাও স্থগিত রইল।

নবাবকে আসরে দেখে, তাঁরই রচিত একটি মার্শিয়া (শোকগাথা) আবৃত্তি করে শোনানো হল। সঙ্গে সঙ্গে এক বিষাদের পরিমণ্ডল দেখা গেল আসর জুড়ে। শ্রোতারা বাক্‌রুদ্ধ হয়ে রইল। মার্শিয়ার সকরুণ বিলাপের সঙ্গে নবাবের ভাগ্য-বিপর্যয় একাকার হল। অনেকেরই চোখে অশ্রুধারা নামল অন্তর মথিত করে। কিন্তু কেউ কোন কথা উচ্চারণ করল না।

ভারক্রান্ত-হৃদয় নবাব। এই দৃশ্যের মধ্যে কারবালার আসর থেকে বিদায় নিলেন। আবার শুরু হল শোকমগ্ন যাত্রীবাহিনীর পথ চলা।

প্রথমেই উন্মুক্ত শকটে নবাব চললেন। তাঁর সঙ্গে মিস্টার ব্যান্‌ডেন এবং রাজা ইউসুফ আলী।

তাঁদের পিছনে সারবন্দী গাড়িতে নবাব প্রাসাদের মহিলারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। আর নানা পেশার লোকজন। খিদ্‌মদ্‌গার, পরিচারকবর্গ।

গাড়িগুলির শেষে নবাবের বহু অনুরাগী, বিশ্বস্ত প্রজার দল। নবাবকে বিদায় দিতে তারা কিছু দূর সঙ্গে চলেছে।

লক্ষ্ণৌ থেকে নবাব সদলে চললেন উন্নাও শহরে। উন্নাও পেঁছিতে রাত হয়ে গেল। কিন্তু থামলেন না তাঁরা। প্রায় সারা রাত এগিয়ে চল্‌বার পর গঙ্গাতীরে

PATHAGAR

এলেন। তখনো সূর্যোদয়ের অনেক দেরি।

জায়গাটি পরিষ্কার করে তাঁবু খাটানো হল। হাত মুখ ধুয়ে নমাজ করতে লাগলেন নবাব। সেই অবসরে তাঁর লোকজন নৌকার সেতু তৈরি করল গঙ্গায়।

তারপর নবাব সকলের সঙ্গে নৌকাগুলির ওপর দিয়ে গঙ্গা পার হলেন। গাড়ির দীর্ঘ সারি। সম্ভ্রান্ত ঘোড়সওয়ার। আর অনুগামী প্রজাদের শোভাযাত্রা।

অশ্বচালিত বগিতে ওয়াজিদ আলী উপস্থিত হলেন কানপুরে।

সেখান থেকে আবার যাত্রা শুরু হল বারাণসীর পথে।

কাশী পেঁছবার আগে নবাব এলাহাবাদে এক সপ্তাহ বিশ্রাম করলেন।

তারপর বারাণসীতেও কদিনের বিরতি। শেষে আবার যাত্রা শুরু হল স্টীমারে।

নির্বাসিত নবাব অবশেষে জলপথে কলকাতায় এলেন। মেটিয়াবুরুজে পেঁছিলেন ১৩ই মে (১৮৫৬)।

সে কথার আগে লক্ষ্ণৌর নবাব প্রাসাদের একটি সংবাদ দিয়ে রাখা যায়। তাঁর তৈরি কাইসর বাগের কিছু বছর পরে প্রকাশিত একটি বিবরণ। ওয়াজিদ আলী তখন মেটিরাবুরুজের নবাব। মহা বিদ্রোহের আগুন নিভে যাবারও অনেক পরের কথা। তবে সেই যুদ্ধ বিগ্রহের জের হিসেবেই কাইসর বাগের এই মালিক বদল হয়েছিল।

কাইসর বাগের প্রাসাদগুলি পেয়েছিলেন অযোধ্যার নতুন তালুকদাররা। তখনকার এই কথা। কাইসর বাগের বাইরের চেহারা তখনো একই রকম। সেই চত্বরের মাঝখানে বিশাল প্রাঙ্গণ।

কিন্তু তার ভবনে ভবনে নতুন কালের বাসিন্দারা। সেই সব নবাবী মহলে এসেছেন নতুন তালুকদাররা।

কাইসর বাগের পূর্ব আর দক্ষিণের সব সৌধ তাঁদের অধিকারে আসে। বিদ্রোহের সময় বৃটিশ পক্ষকে সাহায্য করার পুরস্কার।

তেমনি একটি প্রাসাদ লাভ করেছিলেন এক প্রসিদ্ধ বাঙালী। সূর্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র, রাজা দক্ষিনারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর এক নেতা। পরে বর্ধমানের বিধবা রানী বসন্তকুমারীর সঙ্গে পরিণয় ব্যাপারেও দক্ষিনারঞ্জনের প্রসিদ্ধি হয়েছিল। শিক্ষাজগতেও দান আছে দক্ষিণা-রঞ্জনের। কলকাতায় বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় তাঁর প্রদত্ত জমিতেই। সেই দক্ষিণারঞ্জনকে অযোধ্যার সর্ববৃহৎ তালুকদার রূপে উত্তরকালে দেখা গেল। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি থাকেন লক্ষ্ণৌতে, কাইসর বাগের এক প্রাসাদে।

দক্ষিণারঞ্জন তখনো সেই রাজ-সৌধে বাস করছেন। এমন সময় সেখানে গিয়েছিলেন রাজনারায়ণ বসু। আদি ব্রহ্ম সমাজের অন্যতম নেতা এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। উনিশ শতকীয় হিন্দু পুনরুজ্জীবনের সুপরিচিত মনীষী এবং শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ। দক্ষিনারঞ্জনের তিনি আযৌবন সুহৃদ। কাইসর বাগে দক্ষিণারঞ্জনের অতিথি রূপে তাঁর বাস ও আনুষঙ্গিক কিছু বিবরণ, 'আত্মচরিত' পুস্তকে রাজনারায়ণ এইভাবে প্রকাশ করেছেন—'লক্ষ্ণৌ নগরে বাবু (পরে রাজা) দক্ষিনারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হই। তিনি অতি যত্ন-পূর্বক কাইসর বাগস্থ তাঁহার অতি শোভনতম রাজভবনবৎ বাটিতে আমাকে ২।৩ দিন

রাখেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিলাতের বিখ্যাত টাইম্‌স্‌ পত্রে ইংরাজের পক্ষে দুই একটি প্রবন্ধ লেখাতে এবং বিখ্যাত খৃষ্টান মিশনারী ডাক্তার ডফ লর্ড ক্যানিংয়ের নিকট তাঁহার গুনানুবাদ করাতে লর্ড বাহাদুরের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে পর দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে অযোধ্যা প্রদেশে লর্ড বাহাদুর এক জমিদারি প্রদান করেন। দক্ষিণারঞ্জনকে অযোধ্যা প্রদেশের পুনর্জন্ম-দাতা বলিলে হয়। তিনি লক্ষ্ণৌতে ক্যানিং কলেজ ও Oudh Britsh Association স্থাপন করেন।

•

কলিকাতা গ্রামের দক্ষিণে ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়ম নামে দুর্গ। গোবিন্দপুর গ্রাম উচ্ছেদ করে ১৭৭৩ সালে এটি তৈরি। ইংলণ্ডের রাজা তখন তৃতীয় উইলিয়ম বলে দুর্গের এই নামকরণ। ফোর্টের কিছু দক্ষিণেই আদি গঙ্গা। প্রবাহিণীর উত্তর তীরে কুলি বাজার পল্লী, মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসীর জায়গার জন্যে প্রসিদ্ধ। তারই সংলগ্ন অঞ্চল,—হেস্টিংস, নন্দকুমারের ধ্বংসকর্তা হেস্টিংসের নামে সুপরিচিত। ফোর্ট উইলিয়মের পর হেস্টিংস থেকে আদি গঙ্গা পার হলে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে খিদিরপুর। খিদিরপুরের প্রধান পথ সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর এসে মেটিয়াবুরুজে পেঁছেছে।

মুচিখোলা নামেও সে জায়গাটি পরিচিত। মেটিয়াবুরুজে বা মুচিখোলায় খিদিরপুর থেকে যাবার এই পথ।

আর জলপথে হুগলী নদীর পূর্বতীরে, সেই ১৮৫৬ সালের মেটিয়াবুরুজ। তার সংলগ্ন বড় গঙ্গার ধারে দেখা যায় এই এলাকার কয়েকটি বাগান বাড়ি।

ওয়াজিদ আলী শাহ্ সেই পল্লীতে উপস্থিত হলেন জলপথে। নির্বাসিত জীবন যাপন করতে।

তার অনেক বছর আগেকার কথা। সেখানে একটি মাটির দুর্গ ছিল, বড় গঙ্গার ধারে। সে গড়ের প্রথম পত্তন মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সময়ে।

তারপর বাংলার নবাবী আমলেও কেল্লাটির অস্তিত্ব থাকে। সেই মাটির বুরুজ। তাই থেকে অঞ্চলটিরও নাম হয়ে যায় মেটিয়াবুরুজ। পরে আবার Charnock's Batteryও ছিল সেই মাটির বুরুজে। রবার্ট ক্লাইভ ওলন্দাজদের সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজনে কেল্লাটিকে নতুন করে গড়ে নেন।

ইংরেজ আমলে সে মাটির বুরুজ বা কেল্লা বিলীন হয় খিদিরপুর ডকের মধ্যে।

তার আগেকার অর্থাৎ বাংলার নবাবী আমলে হুগলী নদীর এই চিহ্নিত স্থানে বেশ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ছিল। নদীর পূর্ব ধারে মাটির দুর্গ। আর বিপরীত দিকে, অর্থাৎ গঙ্গার পশ্চিমে, টানা দুর্গ—শিবপুর গ্রামে। নাম থানাই ছিল। ইংরেজদের মুখে মুখে দাঁড়ায়—টানা। এখন যেখানে শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিনটেণ্ডেণ্টের বাড়ি, সেখানেই ছিল থানা বা টানা নামের ছোট গড়টি।

গঙ্গার একধারে মেটিয়াবুরুজ। আরেক ধারে থানা। সেকালে এই দুটি কেল্লায়, সমুদ্র থেকে আসা শত্রুর ওপর পাহারা থাকত। আর জলের তলায় পূর্ব পশ্চিমে ঝোলানো, বিরাট লোহার শিকল। তার এক প্রান্ত বাঁধা মেটিয়াবুরুজে। অন্য প্রান্ত শিবপুরের থানায়। শত্রু কিংবা অবাঞ্ছিত জাহাজকে, দুটি গড় থেকে শেকল টেনে গতি রোধ করা হত।

এসব অবশ্য ওয়াজিদ আলী আসার অনেক আগের কথা।

তাঁর কলকাতায় আসা বা মেটিয়াবুরুজে বাসের বন্দোবস্ত কিভাবে হয়? নবাবের নিজের ইচ্ছায়?

সঠিক জানা যায় না গ্রন্থাদি থেকে। এবিষয়ে দু রকম কথা চলিত আছে।

এক মতে, নবাব কলকাতায় আসেন স্বয়ং উদ্‌যোগী হয়ে। এখান থেকে ইংলণ্ডে দরবার করতে যাওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। খোদ বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এবং রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদন জানানো। কিন্তু কলকাতায় পেঁছে অসুস্থ হয়ে পড়েন নবাব। তারপর জননীর দৌত্যের বিফলতা এবং মৃত্যুর সংবাদ পান। তখন ত্যাগ করেন ইংলণ্ডে যাবার ইচ্ছা। মেটিয়াবুরুজেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে দেন।

কিন্তু অন্য মতটিই বোধহয় সমীচীন। তা হল, নবাবের কলকাতা বাস সাব্যস্ত করেন ইংরেজ সরকার। অযোধ্যা রাজ্য থেকে দূরে তাঁকে তাঁরা রাখতে চান। নিজেদের চোখের সামনেও তাঁর থাকা দরকার। সেজন্যে মেটিয়াবুরুজই বেশ নিরাপদ আর সুবিধার জায়গা। কলকাতা ত ভারতে বৃটিশ শাসনের কেন্দ্র। তার

কাছেই মেটিয়াবুরুজ। তখনকার অনেক পদস্থ ইংরেজদের বাসাঞ্চল।

সেই ইংরেজ বসতির মধ্যে থাকবার জন্যে নবাব আপন ইচ্ছায় আসতে পারেন না। এখানে তাঁর বাসেরও জন্যে বাড়ির ব্যবস্থা হয় সরকার থেকে। রাজ্যচ্যুত, নির্বাসিত নবাবের গতিবিধিও নিশ্চয় নিয়ন্ত্রিত ছিল। স্থায়ী আবাস নির্বাচনের স্বাধীনতা তাঁর থাকবে কিভাবে।...

যা হোক, নবাব যখন এলেন, সে মাটির বুরুজের চিহ্ন নেই। আছে কেবল মেটিয়াবুরুজ নামটি। আর সে অঞ্চলে সাহেবদের বাস। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাগান-ঘেরা সব বাড়িতে গঙ্গার ধার থেকেই সাজানো। সেই ইংরেজরা বেশির ভাগই অবসরপ্রাপ্ত। কেউ কেউ আবার মেটিয়াবুরুজের বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চলে যান 'হোমে'। অর্থাৎ ইংলণ্ডে। কর্মজীবনের শেষে তাঁদের স্বদেশে ফিরে যাওয়া।

তেমনি একজন ছিলেন স্যর উইলিয়ম পীল্। সুপ্রীম কোর্টের এক বিচারপতি। আদালতের চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি তাঁর মেটিয়াবুরুজের বাগান বাড়িটি বিক্রি করেন। নবাব এখানে আসবার ঠিক আগে। সেটিই বান্দাবস্ত করা হয় ওয়াজিদ আলীর বাসের জন্যে। মেটিয়াবুরুজে নবাবের সেই প্রথম বাসভবন। নবাব হয়ত তারই নতুন নাম দিয়েছিলেন—নুর-মঞ্জিল।

কোন কোন পুস্তকে আছে যে, বর্ধমান মহারাজার এক সৌধ মেটিয়াবুরুজে নবাবের প্রথম আবাস। তা সম্ভবত সঠিক নয়।

স্যর উইলিয়ম পীলের বাড়িটি নেবার পরে নবাব অবশ্য মেটিয়াবুরুজে আরো বাড়ি তৈরী করে নেন। ক্রমবর্ধমান ছিল ত তাঁর পরিজন এবং প্রয়োজন।

প্রথম আসার সময় নবাবের পরিবারবর্গ খুব বেশি সংখ্যায় ছিলেন না। প্রথম দলে সংগীতজ্ঞও আসেন কিনা সন্দেহ। তাঁরা যোগ দেন পরে পরে। নবাবের আরেকটি শোচনীয় বিপত্তির আগে এবং পরে।

মেটিয়াবুরুজে বাস শুরু করেই লক্ষ্ণৌর মতন সংগীত দরবার পত্তনের ইচ্ছা তাঁর জাগতে পারে। কারণ বিনা সংগীতে একটি দিনও অতিবাহন করতে তিনি নারাজ হতেন। কিন্তু পরিস্থিতি অভূতপূর্ব বলেই হয়ত কিছু বিলম্ব হওয়া সম্ভব। কিংবা হয়ত পরের দফায় বেশি সংখ্যায় ওস্তাদ বাইজীদের আসার কথা ছিল। মেটিয়াবুরুজ দরবার সাড়ম্বরে বসবে তাঁদের নাচ গান বাজনায়।

কিন্তু ঘটনার চক্র অভাবিত পথে ঘুরে গেল।

নবাব অসুস্থ হয়ে পড়লেন মেটিয়াবুরুজে পেঁছবার কদিনের মধ্যেই।

নিদারুণ অবস্থা বিপর্যয়। নতুন পরিবেশে অনভ্যস্ত, অপরিচিত, হয়ত বিরূপও। দূর, ভিন্ন প্রকার জলবায়ু। নতুন স্থানে বাসের নানা বাস্তব অসুবিধা। কোথায় লক্ষ্ণৌতে অপরিমিত আরাম বিলাসের নবাবী। অগণিত দাসদাসী খিদমদগারের নিত্য সেবা। উচ্ছল লক্ষ্ণৌ দরবারে সর্বক্ষণের কলাবৎ কলাবতী। কাইসর বাগের প্রাসাদমালা, বাগ বাগিচা। শত বেগমের চাঁদের হাট হারেমে মহলের পর মহল। বড় ছোট ছত্তর মঞ্জিল। সিকান্দার বাগ। আলম বাগ। হুজুর বাগের নামেই মনে পড়ে যায় জমাটি জলসার পর জলসা। দিনকে রাত, রাতকে দিন।

আর কোথায় মেটিয়াবুরুজের একটি দুটি কোঠিতে এই কটি মানুষজন নিয়ে

দিন গুজরান্। ইংরেজ সরকারের বাঁধা ভাতায় নির্বাসনের জীবনযাপন। তার আনুষঙ্গিক গ্লানিবোধ আর মানসিক যন্ত্রণা। দীর্ঘ দুমাসের কষ্টকর পথযাত্রা। সকলের যোগে বড়ই প্রতিক্রিয়া জাগে নবাবের দেহে মনে।

শরীর বিকল হয়ে পড়ে। তারপর বেশ সময় লেগেছিল শরীর রোগমুক্ত হতে।

অরোগ্যলাভ করে সঙ্গীতপ্রেমী নবাবের একটিই ইচ্ছা জাগল। একটি ভালরকম জলসার আয়োজন করলেন মেটিয়াবুরুজে। হয়ত এর মধ্যে কজন ওস্তাদ বাইজী লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছেন। হয়ত তাঁদের নিয়ে দরবার পত্তনের ইচ্ছাও নবাবের হয়েছে! কারণ সঙ্গীতের আবহ ভিন্ন একটি দিনও তাঁর যায়নি লক্ষ্ণৌতে। তাঁর এতকালের নবাবজাদা আর নবাবজীবনে।

নীরোগ হয়ে খুশমেজাজে ওয়াজিদ আলী মেটিয়াবুরুজে
সেই প্রথম আসর করলেন।
জলসা বেশ বড়ই হল—গান বাজনায় নাচে। আসর
ভাঙতেও রাত হয়ে গেল। তারপর খানাপিনা।
ভারি রাতেই নবাব এলেন শয়নকক্ষে। সুখে নিদ্রামগ্ন হলেন।
তখন আরো গভীর রজনী। দরজায় ধাক্কার শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল
অকস্মাৎ। কিংবা তাঁর ঘুম ভাঙানো হল দরজায় আওয়াজ
করে। লোকজনের ভয়াকুল কণ্ঠস্বরে।
বিস্মিত নবাব ঘরের বাইরে এলেন। জানতে চাইলেন—ব্যাপার কি?
শুনলেন, ইংরেজ সেপাইরা এ কোঠি ঘিরে ফেলেছে!
কেন? কিসের হামলা এখানে, এই রাত দুপুরে?
এবার আসল সরকারী বার্তা এল নবাবের কাছে।

—বাইরে আসতে হবে আপনাকে। পল্টনের সঙ্গে বড়লাটের সেক্রেটারি এসেছেন। তিনি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। জরুরী কথা আছে।

ঘুম-ছুট্ ওয়াজিদ আলী শাহ্ বেরিয়ে এলেন সাহেবের সামনে। সেখানেও কজন ইংরেজ সৈন্য।

গভর্নর জেনারেলের দূত নবাবকে বক্তব্য জানিয়ে দিলেন।

এই সেদিন নবাব লক্ষ্ণৌতে স্তম্ভিত হয়েছিলেন বড়লাটের হুকুম-নামায়। এখনো তেমনিভাবেই শুনলেন সেক্রেটারি সাহাবের বয়ান—

লক্ষ্ণৌর রাজনৈতিক অবস্থা ভাল নয়। সেখানে সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব জাগছে। চাঞ্চল্য আর তৎপরতা দেখা দিয়েছে সেনানিবাসে। এই সব কারণে সরকার নবাবকে সন্দেহের চোখে দেখছেন। এসময়ে কিছুকাল নবাবের ফোর্ট উইলিয়মে থাকাই ভাল।

ফোর্ট উইলিয়মে থাকার মানে?

তখনি সমঝে গেলেন নবাব। প্রমাদ গনলেন।

বড়লাটের সেক্রেটারিকে তিনি আকুল হয়ে বোঝাতে লাগলেন—সাব, ম্যয় বে-কসুর। আপনি শুনুন, গভর্নর জেনারেলকেও জানাবেন, আমার কোন সম্পর্ক নেই লক্ষ্ণৌর সঙ্গে, আর এ ব্যাপারে। সেপাইদের কিংবা তাদের মতিগতি আমি বিলকুল জানি না। তাদের সঙ্গে আমার কোনরকমই যোগসাজস নেই, আপনি বিশ্বাস করুন সাব।

বিশ্বাসযোগ্য নবাবের এই সত্য কথা। কোন সাধারণ বুদ্ধিমান ভদ্রলোক হলে তা বিশ্বাস করতেনও। কিন্তু অসাধারণ দূরদর্শী ধূর্তবুদ্ধি সাম্রাজ্য-গড়া ইংরেজ। পরের দেশে রাজত্ব করছে কূট-মিথ্যাচার আর অস্ত্রবলে। লর্ড ক্লাইভের উমিচাঁদের সঙ্গে জাল উইল আর পলাশীর লড়াই থেকে যার নানা রকমফের। মিথ্যাচারীরা অপরকে বিশ্বাস করে না।

বড়লাটের সেক্রেটারিও গ্রাহ্য করলেন না নবাবের কোন যুক্তি বা আবেদন। তাঁদের হুকুমেরও নড়চড় হল না।

নবাবকে যেতেই হবে ফোর্ট উইলিয়মে। আর সময় নষ্ট করা চলে না। আজই। এখনি।

ততক্ষণে হৈ চৈ পড়ে গেছে নবাববাড়িতে। অনেক লোক সেখানে হাজির। বড়লাটের আদেশ শুনে অনেকেই তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলেন।

কিন্তু তখন নবাবের সঙ্গী হবার অনুমতি পেলেন তাঁর পাঁচজন বন্ধু। মোজাহেদ উদ্দৌলা, দেয়ানৎ উদ্দৌলা, জুলফুকর উদ্দৌলা, ফতাহুদ্দৌলা ও মহ্-তামিমউদ্দৌলা।

কোন বেগমকেও নবাবের সঙ্গে যেতে দেওয়া হল না।

তবে নানা পেশার কজন থাকবার আদেশ পান নবাবের সঙ্গে। তাঁরা হলেন—নবাবের হকীম তবিবউদ্দৌলা। কাজিম আলী সওয়াদ, বাকর আলী, মহম্মদ জান চোপ্দার, হুবদার খাঁ কাওয়াল বরদার, জামালউদ্দীন চাপরাশি, শেখ্ ইমাম বখ্স্ কুলিয়ান বরদার, আমীর বেগ খোয়াশ, ওয়ালী মহম্মদ বোল্দান (পিকদান) বরদার,

মহম্মদ শের খাঁ গোলন্দাজ, আবদুর রেজাক আরামপোশ্ (নবাবের আরাম তদারককারী), করীম বখ্স আবকশ্ (জল দেবার লোক), হাজী কাদ্র্ বখ্স্ কুম্হার (কুম্ভকার), ইমামী গাড়ী পোঁছ (শকট পরিষ্কারক) ইত্যাদি পরিচারকবর্গ

তাছাড়া কজন পরিচারিকাও ফোর্টে থাকবার হুকুম পায়—দারোগা রাহাতুস সুলতান (নবাবের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে), খানা বরদার (আহার্য পরিবেশিকা), কারবলাই আব্ খানা বরদার (জল দেবার জন্যে নিযুক্তা), হুসেনী খাস বরদার (তাম্বুল বাহিনী), মহম্মদ ই খানাম পোষাক দোজ (পোষাক পরিচ্ছদের ভারপ্রাপ্তা) ইত্যাদি।

এমনি ৩৩ জন পুরুষ ও নারীর সঙ্গে নবাবকে ফোর্ট উইলিয়মে বাস করতে হল। নির্বাসন ও নজরবন্দী থেকে এবার ইংরেজের দুর্গে পুরোপুরি কয়েদী শুরু।

ফোর্ট উইলিয়মের একটি ফটকের নাম কুলি গেট। তারই সংলগ্ন বালাখানা কোঠি। নবাব সেই বালাখানায় রইলেন প্রথম আট দিন।

সেখানেই গভর্নর জেনারেলের একটি পত্র তিনি পেয়েছিলেন। সে চিঠিতে তাঁকে জানানো হয় যে, অনেক বিদ্রোহীরা নবাবের কথা বলেছে লক্ষ্ণৌতে। সেজন্যে তাঁকে কিছুদিন ফোর্টে বাস করতে হবে। কর্তৃপক্ষ তাঁকে সব রকম সুখ সুবিধা দেবার চেষ্টা করবেন।

আটদিন পরে নবাবের বাসের ব্যবস্থা হল ফোর্টের আরেকটি বাড়িতে। বন্দী জীবনের নানা অসুবিধা আর কষ্টও দেখা দিতে লাগল।

নবাবের পাঁচজন বন্ধুর মধ্যে ফতাহুদ্দৌলা বেশি বয়সী ছিলেন। তিনি ফোর্টেই কিছুদিনের মধ্যে মারা গেলেন। বন্দী জীবনে নবাবকে কাব্য রচনায় সাহায্য করতেন ফতাহুদ্দৌলা। এ ব্যাপারে তাঁর ওস্তাদ বলে নাম ছিল। তাঁর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হলেন নবাব।

কেল্লার মধ্যে বন্দীদের অনেক ঝামেলা পোয়াতে হত। নানা রকমের বিধি-নিষেধ।

নবাবপক্ষের কারুর তো ফোর্টের বাইরে যাবার হুকুম ছিল না। তেমনি বাইরের আর কেউও দেখা করতে পেতেন না নবাবের সঙ্গে।

নবাবের এক সঙ্গী বন্ধু ছিলেন দেয়ানৎ উল্লা। তিনি হজ্ করতে যেতে চাইলেন। কিন্তু অনুমতি দিলেন না কর্তৃপক্ষ।

ওয়াজিদ আলীর নোকরদের ওপরেও কড়া পাহারা থাকত।

তাঁর হকীম তাবিবুদ্দৌলার একেবারে বরদাস্ত হয়নি এই বন্দী জীবন। তিনি বিস্তর তক্রার করে মেটিরাবুরুজে ফিরে যাবার হুকুম পেয়েছিলেন।

জল দেবার দাসী কারবলাই আব্ খাশা বরদার হয়ে উঠল বেজায় খিট্খিটে। নবাবকে পর্যন্ত সে গালমন্দ করে বস্ত। সেও চলে যায় কেল্লা থেকে।

রোজ রাত্রে ইংরেজ সেপাইরা নবাবের কাছে এসে খোঁজ নিয়ে যেত।

এসব তাঁর ফোর্টে আসবার বেশ কিছুদিন পরের কথা। যে বিদ্রোহের ভয় ইংরেজরা অনেক আগেই করেছিল, তখন তা হয়ে উঠেছে অতি বাস্তব। আর লক্ষ্ণৌতে

প্রবল আকার ধারণ করেছে। ইংরেজদের সঙ্গে দেশী সেপাইদের দস্তুরমত যুদ্ধ চলেছে সেখানকার ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে।

কলকাতায় কয়েদী নবাবের ওপরও তাই দিন রাত নজর। ইংরেজ সেপাই রাত্রেও তাঁর তল্লাস করে যায়।

এমনি এক গোরা পাহারাদার সেদিন এসেছে নবাবের ঘরের কাছে। রাত বেশ হলেও নবাব তখনো জেগে।

সেপাইটার এক আত্মীয় বিদ্রোহীদের হাতে মারা পড়ে। সে অবশ্য লক্ষ্ণৌতে। সেই আক্রোশে লোকটা নবাবকে গালাগালি দিয়ে চলে গেল।

অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন নবাব। পরের দিন তিনি সেপাইটার নামে নালিশ করলেন কর্তৃপক্ষের কাছে।

তবে নবাবের মান রক্ষা হয় এ ব্যাপারে। সে প্রহরীকে কর্তৃপক্ষ বরখাস্ত করে দেন।

এমনি নানাভাবে গ্লানিময় হয়ে উঠল বন্দী-নিবাস। বন্ধ পরিবেশে নবাবের পরিচারকদের বদ্ মেজাজ দাঁড়াল। ঝগড়া থেকে তাদের মারপিট পর্যন্ত হয়ে যেত নিজেদের মধ্যে।

একদিন কথা কাটাকাটি থেকে বাকর আলীর নাক কেটে দেয় মহম্মদ শের খাঁ। তাকে ফোর্ট থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

নবাব একদিন ওই বাকর আলীকে চিঠি দেন বাইরে পাঠাবার জন্যে। কিন্তু সেপাইদের কি কড়া নজর। তারা বাকর আলীকে পাকড়াও করে আরেকটি ঘরে বন্ধ করে রাখে।

একদিন ভিস্তিকেও কাজ থেকে জবাব দেওয়া হয় সন্দেহ করে?

নবাব পক্ষের মোট সাতজনকে কর্তৃপক্ষ বরখাস্ত করে দেন।

অবশ্য নবাবকে লেখা আত্মীয়-স্বজনদের চিঠি দেওয়া হত তাঁকে।

এই বন্দী জীবনের প্রথম দিকে জননী ও ভ্রাতার পত্রাদিও তিনি পেতেন। সে সব চিঠি আসত ইউরোপ থেকে।

তাঁদের মৃত্যু সংবাদও তিনি ফোর্টেই পেয়েছিলেন।

এমনি নানা অশান্তি আর বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা। মেটিয়াবুরুজে এসে হয়ত নবাব ভেবেছিলেন, এ-ই দুর্ভোগের শেষ। কিন্তু অত কাণ্ডের পরেও এখন আবার নতুন রকমের দুঃসময় শুরু হল। কয়েদখানার এই অভাবিত অসম্মানের জীবন।

লক্ষ্ণৌ থেকেও শোচনীয় খবর পেতে লাগলেন নবাব। সেখানে থেকে চিঠিপত্র মাঝে মাঝে পেতেন।

লক্ষ্ণৌতে নবাবের কিছু বিষয় সম্পত্তি তদারক করতেন ফুফা হাসাজুদ্দৌলা। তিনি চিঠিতে সেখানকার হাল জানাতেন। তবে খুলে লিখতে পারতেন না সব ব্যাপার।

তখন সেখানে বিদ্রোহের অবস্থা গুরুতর। হাসাজুদ্দৌলার পত্রে কাইসর বাগের মর্মান্তিক সংবাদ এল।

নবাবকে পিসেমশায় লিখেছেন—লক্ষ্ণৌর আর সব খবর ভাল। কিন্তু তলব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেককে উপবাসে থাকতে হয়েছে।

লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্ট্ আর অন্যান্য ইংরেজ বিপর্যস্ত। যানবাহন যোগাযোগ থেকে আর্থিক ব্যাপারেও বিভ্রাট, বিশৃঙ্খলা।

প্রাসাদ কর্মচারীদেরই শুধু বেতন বাকি পড়েনি। নবাবের পরিবারবর্গও ভাতা পাননি ঠিক মতন, সময় মতন!

এই সব খবর পেয়ে ওয়াজিদ আলী বিচলিত হয়ে পড়লেন। নিজেরই তো কয়েদীদশা। আর কি করতে পারেন তিনি?

কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে একটি দরখাস্ত লিখলেন। সেটি পাঠিয়ে দিলেন হাসাজ্জ-দ্দৌলার চিঠিখানির সঙ্গে।

উত্তরে, একটি সান্ত্বনা-সূচক পত্র নবাব পেলেন।

কর্তৃপক্ষ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন যে, লক্ষ্ণৌতে যথোচিত লক্ষ্য দেওয়া হবে সব বিষয়ে। চিন্তার কারণ নেই। প্রয়োজনীয় খরচের জন্যে দু লক্ষ টাকা সেখানে পাঠানো হয়েছে।...

'আখ্‌তার অর্থাৎ নবাবের বেদনা' তাঁর দ্বিতীয় পর্যায় আত্মজীবন
ওয়াজিদ আলি প্রায় দুবছর বন্দী থাকেন ফোর্ট উইলিয়মে। আর আশ্চর্যে
বিষয়, এই অবস্থার মধ্যেও তিনি লেখার কাজ প্রায় বরাবরই করেছিলেন
গান, কবিতাদি ছাড়া প্রেমপত্র প্রভৃতি গদ্যরচনাও। তাঁর এক প্রিয়তম
বেগম লক্ষ্ণৌতেই থেকে যান। তিনি হলেন আকলীল মহল। তাঁকে নবা
অনেকগুলি চিঠি লেখেন ফোর্ট থেকে। মেটিয়াবুরুজ থেকে
আকলীল মহলকে তিনি পত্র দেন। তাঁর বেগমকে লেখা এ
পত্রাবলীর সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য। নবাবে
পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত নানা সংবাদও পাওয়া যা
চিঠিগুলি থেকে। সেসবের সম্পূর্ণ অনুবাদ পরের একটি অধ্যায়ে থাকবে
তাই নবাবের এই বন্দী জীবনে সব চেয়ে উল্লেখনীয় রচ
—তাঁর আত্মকথা : 'হুজ্‌ন্‌-ই-আখ্‌তার।' অর্থা

আখ্‌তারের (নবাবের লেখনীনাম) বেদনা। উর্দু ভাষায় এবং মসনবী আকারে লেখা ওয়াজিদ আলী শাহ্‌র আত্মজীবনী। নবাব পরিবারের বহু তথ্য সংবলিত এই রচনায় বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তাঁর কবিপ্রাণের প্রকাশ হিসাবেও লেখাটি উৎকৃষ্ট।

বইখানি অবশ্য নবাবের এ পর্যন্ত জীবনের কাহিনী নয়। লক্ষ্ণৌতে রাজ্য হারাবার ও কলকাতায় আগমণের পরে গ্রেফ্‌তার ইত্যাদির বর্ণনা করেছেন লেখক। তারপর ফোর্ট উইলিয়মে তাঁর অভিজ্ঞতাই 'হুজ্‌ন্‌-ই-আখ্‌তার'-এর আসল বিষয়-বস্তু। বন্দী নিবাসে রচনার ছ বছর পরে মেটিয়াবুরুজের মত্‌বা-ই-সুলতানী (সুলতানের ছাপাখানা) থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। নবাবের অন্যান্য পুস্তকের মতই এটিও বিতরণ করা হয়েছিল তাঁর বন্ধু বান্ধব সভাসদদের মধ্যে।

নবাবের মৃত্যুর পর অনেক বছর 'হুজ্‌ন্‌-ই-আখ্‌তার' দুষ্প্রাপ্য ছিল। তারপর ১৯২২ সালে লক্ষ্ণৌর একটি সাহিত্য সমিতির সম্পাদক পুনরায় প্রকাশ করেন পুস্তিকাটি।

পরে তার আংশিক ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল।

বইখানির 'অনুক্রমণিকা' নবাব রচিত মূল বিষয় নয়। সেটি অন্যের রচনা। সে অংশ থেকে বিভিন্ন বিবরণ নেওয়া হয়েছে বর্তমান পুস্তকে। মেটিয়াবুরুজে নবাবের গ্রেফতারি এবং ফোর্ট উইলিয়মে বন্দী জীবন সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, সবই 'হুজ্‌ন্‌'-এর সেই অনুক্রমণিকা থেকে প্রাপ্ত।

নবাবের বিষয়ে আরো কটি কথা এই মুখবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে। যথা—

নবাব কবি এবং সঙ্গীত রচয়িতা। তাঁর অধিকার আছে ফার্সী ভাষায়। তবে আরবী তিনি জানেন না। লেখবার জন্যে তিনি টেবিলে বসেন না কখনো। শায়িত হয়ে রচনা করে থাকেন। বেশির ভাগই তিনি লেখেন না স্বহস্তে। নবাব মুখে মুখে বলেন। লেখেন লিপিকার। কখনো একই সঙ্গে দুজনকে আলাদা লিখিতব্য বিষয়ও জানান।

'হুজ্‌ন্‌-ই-আখ্‌তার' মসনবীতে তিনি তাঁর কষ্ট আর কারাবাসের দুঃখ অতি আন্তরিকভাবে প্রকাশ করেছেন।'

অনুক্রমণিকায় এই মন্তব্য যথার্থ। নবাবের আত্মকাহিনীতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বেজে উঠেছে আন্তরিকতার সুর। আর, সমস্ত বিষয়ের বাস্তব বর্ণনা।

হুজ্‌ন্‌-ই-আখতার

(আখতারের বেদনা)—নবাব রচিত আত্মকথা

এখান থেকে আরম্ভ করা হল 'আখ্‌তারের বেদনা।'
নবাব তাঁর এই মনসবী রচনার প্রারম্ভে প্রার্থনা জানিয়েছেন।
প্রথমে আল্লাহ্‌কে। তারপর মহম্মদকে। তারপর আলীকে।
পরে তিনি খানিক লাল সুরার জন্যে আবেদন জানিয়ে বলেছেন যে, তাহলে
তিনি আচ্ছন্ন হয়ে একটি মানুষের কাহিনী বিবৃত করতে পারেন
—যার দিন কাটছে কারাগৃহে, যে ভয় করে বিচারের দিনটিকে।
আর মাসের পর মাস যে (প্রিয়জনদের সঙ্গে) মিলনের কামনা করছে।
'না চাঁদ, না সূর্য, না বাতাস এদিকে আসে। বন্ধুদের
এখানে পাওয়া যায় না, পরিচিতজনও নেই এখানে। প্রত্যেকেই আমায় ত্যাগ
করেছে। ধন দৌলৎ ও বিষয়-সম্পত্তির ওপর আমার কোন আকাঙ্ক্ষা
নেই। আমার সব সন্তান ও আত্মীয়দের ছিনিয়ে
নেওয়া হয়েছে আমার কাছ থেকে। তারা সবাই কাঁদছে।

আমিও অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি এ জন্যে। রাত্রে আমার নিদ্রা হয় না। খাদ্য পাই না। জল নেই।'

তারপর তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে তাঁর ওয়ার্ডেন প্লেটুন মেজর 'কর্নেল কোনিয়া বাহাদুরের' প্রশংসা করে তাঁর উচ্চপদ লাভের প্রার্থনা জানিয়েছেন ঈশ্বরের কাছে। প্রখর গ্রীষ্মকালীন সেই সময়। প্রতিদিন আট সের হিসাবে বরফের কথা, টানা পাখা, তাঁর পরিচর্যার জন্যে নিযুক্ত এত পরিচারক ইত্যাদির কথাও নবাব এখানে বলেছেন।

এ সবের পর তিনি এইভাবে দিয়েছেন 'কুঠুরিতে আসার বিবরণ'—ও আমার হৃদয়, তুমি এবার তোমার কাহিনীর বর্ণনা আরম্ভ করো। আমার অবস্থা-বিপর্যয় ঘটে গেছে। বিকৃত হয়েছে আমার মুখ। সর্বাঙ্গ খারাপ লাগছে। মাথার প্রত্যেকটি চুল আমার কাছে বিরক্তিকর। অশান্ত হয়ে আমি কাঁদছি। সরু হয়ে গেছে আমার হাতের কব্জি। পাঞ্জা দুর্বল হয়ে পড়েছে। হাতের ওপর ফুটে উঠেছে সব শিরা উপশিরা।

কি নিস্তেজ হয়ে গেছি আমি। আমার নিজের হাতে খাদ্য তুলতে পারি না।···

আগে আমার মুখ ছিল পূর্ণিমার চাঁদের মতন। এখন হয়েছে যেন প্রতিপদের চাঁদ। হাতের তালু আগে কি লাবণ্যময় ছিল। আর এখন হয়েছে বিবর্ণ, কর্কশ। ক'মাসে আমি এমন দুর্বল হয়ে পড়েছি যে চলতে পারি না।'

তারপর শৌচাগারের উল্লেখ করে নবাব জানিয়েছেন যে, তাঁর ঘরের কাছেই তাদের অস্তিত্ব তাঁকে পীড়িত করে তুলেছে। সেই বর্ষার সময়ে সেখানে হাওয়া নেই। গুমোট, নোংরা আর দুর্গন্ধময়।

মশার কথায় নবাব বলেছেন—'খোদা জানেন কত মশা সেখানে আছে। হাতে করে মারতে গেলে হাতেও কামড়ায় তারা। তেমনি ছারপোকাও।·····

'ও আমার হৃদয়, থামাও তোমার বিষণ্ণ কাহিনী। একেবারে প্রথম থেকে বর্ণনা করো তোমার বিবরণ। এমন গল্প বলো যাতে অন্তরকে বিস্মিত করে দেয়। এমন কাহিনী শোনাও যাতে সঞ্চারিত হয় শক্তি, যা অতিক্রম করে যায় রুস্তম ও সামের কথা। সেই সত্য কাহিনী বর্ণনা করো যাতে তা সাক্ষ্যস্বরূপ থেকে যায়।

এ কাহিনী যখন আমি লিখছি তখন সময়টা অদ্ভুত। আমি বাস করছি কারাগারে। কলম পাই না, কাগজ পাই না, কালি পাই না, দোয়াত পাই না। এসব জিনিষ এখানে একেবারে দুর্লভ।

এই আত্মকথায় পরবর্তী অধ্যায়ের নবাব নামকরণ করেছেন, 'কাহিনীর শুরু ঃ রাজত্ব থেকে উচ্ছেদ ঃ পাড়ি'। তা শুরু করে নবাব লিখেছেন —'ও তরুণ, শুরুটা শেষ করে গোড়া থেকে বর্ণনা আরম্ভ করো। এই ওয়াজিদ, আমজাদের ছেলে, তার করুণ কাহিনীতে শোনাচ্ছে যে, সে প্রায় দশ বছর রাজ্য শাসনের পর দেখা দিল তার দুর্ভাগ্য।'

গভর্নর জেনারেল আমায় হুকুম দিলেন রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে। আমার রাজ্যের অধিবাসী তিন কোটি লোক আমাকে শাসন-ক্ষমতা দিয়েছিল। এই হতভাগ্য মানুষটির নাম শাহে অবধ—অযোধ্যার রাজা। আর এমনি করে আমার রাজত্ব শেষ

হয়ে গেল।

লর্ড ডালহাউসি এইসব কথা জানিয়ে আমায় চিঠি লিখেছিলেন—'আপনার প্রজারা আপনাকে নিয়ে সুখী নয় এবং আপনার রাজ্যের বদনাম হয়ে গেছে। প্রজাদের এই দুঃখদুর্দশা আমরা দেখতে চাই না, আর শুধুমাত্র অভিভাবক থাকারও ইচ্ছা নেই আমাদের। আপনি একলাখ টাকা করে প্রতি মাসে পাবেন।'

রেসিডেন্ট জেনারেল মিঃ আউটরাম চিঠিটা আমায় দিলেন। প্রাসাদের প্রত্যেকে ক্রন্দন আরম্ভ করলে। তিনি তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে এনেছিলেন, সংখ্যায় তারা অনেক। আমার মনে বশ্যতা ছাড়া আর কোন ভাব ছিল না। এমন দিনের কথা আমি কখনো ভাবতে পারিনি!

এ বেচারা সে সময় অসুস্থ ছিল।

আমি চিন্তা করতে লাগলুম, কি করা যায়, কি হওয়া উচিত আমার পরবর্তী কাজ।

আলি নকী খাঁ ছিলেন আমার উজীর ও ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা। তখন প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হতে লাগল যে, যা হবার হয়ে গেছে! এ জন্য আমার আর দুঃখ করা উচিত নয়। আমি সেই চুক্তিপত্রে আমার সীল দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলুম। আমার রাজত্ব চলে গেল অকারণে।

আমার আত্মীয়রা আমার ওপর পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আর আমার প্রজারা চীৎকার করত যে, এই রাজা তাদের ধ্বংস করে দিচ্ছে। অনেক লোকই আলী নকী খাঁকে অভিসম্পাত করত তাঁর কাজের (সন্ধিতে উপদেশ) জন্যে।

আমাকে প্রহরায় রাখা হল। কাউকে আমার কাছে আসতে অনুমতি দেওয়া হত না।

ও হৃদয়, মাসের ২৭ তারিখে ১২৭১ হিজরিতে আমি হারিয়েছি আমার রাজ্য।

আমরা আবেদন করব স্থির করেছিলুম। তাই আমি আত্মীয়-স্বজনদের কাছে বিদায় নিলুম আর তাঁরাও আমায় সম্মতি দিলেন প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে।

আমি জেনারেল আউটরামকে বললুম যে, আমি খোদার কাছে আবেদন করতে যাচ্ছি, যিনি আমায় তখত্ দিয়েছেন। আমি আবেদন করব বৃটিশ রাজার কাছে।

তখন মিঃ আউটরাম বললেন, 'তা করবার স্বাধীনতা আপনার আছে। গভর্নমেন্ট আপনার আবেদন গ্রহণ করতে পারেন।'

আমি বললুম, 'আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার লিখিত আদেশ দিন এ বিষয়ে, যাতে আমি ইংলণ্ডে যাবার জন্যে পাশ পেতে পারি।'

দশ দিন পরে আমার স্থানত্যাগের অনুমতি দেওয়া হল এবং আমি যাত্রা করা স্থির করলুম।'

আত্মকাহিনীর পরবর্তী অধ্যায়ের নবাব শিরোনাম দিয়েছেন—'মুন্নাব্বর উদদৌলা বাহাদুর ও আমার কথাবার্তা'।

এখানে তিনি লিখেছেন, 'আহম্মদ আলী খাঁ একজন অতি উদার ব্যক্তি ছিলেন। আমি তাঁকে বললুম, 'আমরা এই শহর থেকে লণ্ডন যাব। আমার কোন রাজ্য নেই, অহংকারও নেই। লণ্ডনে আমাদের আবেদনের জন্যে যাওয়া যাক। আমরা আবেদনে

জিতে যাব। তারপর লক্ষ্ণৌতে ফিরে এসে রাজত্বের উন্নতি করব।'

আহম্মদ বললেন, 'বেশ কথা এই অপদার্থটা আপনার সঙ্গে যাবে।'

আমি আমার পদস্থ কর্মচারিদের শহরের কাজকর্ম চালাবার জন্যে কিছু নির্দেশ দিলুম। তাঁরা আমার যাত্রার কথা শুনে বিমর্ষ হয়ে রইলেন। শহরে কোন চোর, খুনী নেই। গরীব লোকদের জ্বালাতন করতে সাহস করে না কেউ।

যাহোক ১২৭১ হিজরির ৫ই রজব আমি যাত্রা আরম্ভ করলুম আমার মা ভাই, পাঁচ ছজন বেগম ও শাহজাদাকে সঙ্গে নিয়ে। সেই পমছমবার রাতে মাল পত্র নিয়ে লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করবার পর আমরা সারা রজব ধরে কানপুরে ব্র্যাণ্ডেনের বাংলোয় রইলুম। রমজানের আগে যখন আমরা শাওনের চাঁদ দেখি তখন সেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করে আটদিনে পেঁছাই এলাহাবাদে।

তারপর আমরা কাশীতে উপস্থিত হই এবং ১৪দিন রাজার কোঠিতে থাকি। তিনি অতি আন্তরিক ব্যবহার করলেন এবং বৃহৎ সংবর্ধনা জানালেন।

সেখান থেকে একটি প্রকাণ্ড জাহাজে চড়ে আমরা উনিশ বিশ দিন যাবৎ ভ্রমণ করি। রমজানের চাঁদ যখন দেখা গেল, তখন আমরা উপনীত হলুম কলকাতায়।···

প্রত্যেক জায়গায় আমাদের সম্মানে কুচকাওয়াজ এবং আমার সম্মানে তোপধ্বনি করা হয়।

আমি আরো অসুস্থ হয়ে পড়লুম আর লণ্ডন যাওয়ার কোন পথ পেলুম না।

তারপর শম্বলের মাস এল। আমি তখন রোগের জন্যে পরিশ্রান্ত। শম্বলের ১৪ তারিখে আমার ছেলে, ভাই ও মা লণ্ডন যাত্রা করলেন।

'তোমরা আমার প্রতিনিধি হয়ে লণ্ডন যাও আর রাজাকে আমার সব কথা জানাও।'

তাঁরা তিনজন চলে গেলে আমি একা রইলুম। আমার খাস বেগম রইলেন আমার সঙ্গে। আমার ভাই সিকন্দর হাসমতের সঙ্গে মা লণ্ডনে গেলেন। আমার মায়ের খেতাব ছিল মালকা-ই কিসবর।'

তারপরের অধ্যায়ে আলী নকী খাঁ ও আহম্মদ আলী খাঁর কলকাতা ও লক্ষ্ণৌতে যাওয়া আসার কথা নবাব জানিয়েছেন।

তার পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি বর্ণনা করেছেন—বিদ্রোহের সংবাদ প্রাপ্তি, তাঁর পীড়া, আরোগ্য লাভ ও আরোগ্যের জন্যে উৎসব।

'এক বৎসর চলে যাবার পর আমরা সংবাদ পাই যে, (লক্ষ্ণৌতে) বিদ্রোহ হয়ে ইংরেজ সৈন্যদের ধ্বংস করে দিয়েছে। আর এর কারণ শুনেছি—কার্তুজ সব তৈরি হয়েছে গরুর চর্বিতে। বিদ্রোহের এ-ই আসল কারণ। সে সময় আমার শরীর খুব খারাপ, জ্বরে আমার গা পুড়ে যাচ্ছিল। যখন আমি সম্পূর্ণ সেরে উঠি তখন ১২৭২ হিজরীর শম্বল মাস।

আমার প্রাসাদের সব লোকজন জমায়েৎ হল। তারপরে শুরু হয় নাচ-গানের জলসা। রাত পর্যন্ত আসর চলল। জলসার শেষে শয়ন করতে চলে গেল সকলে।

আমি তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এমন সময় খুব হৈ চৈ আর চীৎকার শুনতে পেলুম। কারা চেঁরিয়ে বলছে—'দয়া করে আসুন, খোদার দোহাই, আসুন। উঠে

পড়ুন। আর সবাইকে জাগিয়ে দিন।'

আমি উঠে পড়লুম। আর স্তম্ভিত হয়ে দেখি, নদীর ঢেউয়ের মতন সারবন্দী ইংরেজ সৈন্য।

কে যেন বলতে লাগল—ওরা আমাদের উড়িয়ে দেবে। ধ্বংস করে দেবে আমাদের। মুচিখোলা মাটিতে মিশিয়ে ছাড়বে।

অনেকে খোদার কাছে প্রার্থনা করতে লাগল নিরাপত্তার জন্যে।

তখন আমি জিজ্ঞেস করলুম—এসব কিসের গোলমাল? কারা এসেছে? ব্যাপার কি?

কে একজন আমাকে বলল—'ও রাজা, আলী নকী খাঁ গ্রেপ্তার হয়েছেন।'

আমার মুখ হাত ধোবার দরকার। আমি কলঘরে যেতে চাইলুম—'একটু অপেক্ষা করুন। হাতে মুখে জল দিয়ে নিই।'

ওরা বলল, 'নিন।'

আমি তাড়াতাড়ি জলসেচ করে এলুম।

গভর্নর জেনারেলের সেক্রেটারি বললেন—'রাজা, আপনি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে চলুন। এটা সরকারী আদেশ। দয়া করে আর কিছু করবেন না, আর বিলম্বও নয়। আমার সঙ্গে আসুন।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম—'এর কারণ কি! আমার কি অপরাধ বলুন।'

তিনি বললেন—'এ সরকারের আদেশ। তাঁরা আপনাকে সন্দেহ করেন।

সেক্রেটারির নাম মিঃ এ্যাডিনস্টন্।

আমি তাঁকে বললুম—'আমার কোন দোষ নেই। আমি বরাবর এই সব হাঙ্গামা থেকে দূরে থাকি। আপনি দয়া করে আমায় ব্যাপারটা বলুন। আমি এই ব্যাপারের জন্যে বড়ই দুঃখ বোধ করছি। কি ভুল আমি করেছি যে গভর্নর জেনারেল আমার এত বিরুদ্ধে?'

তিনি বললেন, 'আমি সোজা কথা এইটুকু জানি যে, আপনি এইসব ষড়যন্ত্রে অংশ নিচ্ছেন।'

আমি তাঁকে বারবার জোর দিয়ে জানালুম যে, 'এসব জিনিসের সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। আর সে সময় আমার শরীরও অসুস্থ ছিল।

আপনি অনুগ্রহ করে এই ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলুন আমার এখানেই। আর আমার কি দোষ প্রমাণ করুন।'

তিনি আমার এ কথায় রাজি হলেন না এবং আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে কে আপনার সঙ্গে যাবে?'

তাতে আমি বললুম, 'এখানে যাঁরা আছেন সবাই আমার বন্ধু। তাঁরা আমার সঙ্গী হবেন। এঁদের নাম লিখে নিন।'

তখন তিনি বললেন, 'আট জনের আপনার সঙ্গে যাওয়া হবে। তাঁদের নাম আপনি ঠিক করুন।'

'আমি তাঁদের নাম জানিয়ে দিলুম।...

সেক্রেটারি, আমি, মুজাহেদ উদ্দৌলা ও দেয়ানৎ উদ্দৌলা একটা গাড়িতে যাত্রা

করলুম।

তারপর কুলি গেটে আমায় রাখা হল।

কলকাতার কেল্লায় বাস করবার সময় আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন এবং যাঁরা আমার পরিচর্যা করেছিলেন তাঁদের নাম আমি জানাচ্ছি।'

তারপর নবাব তাঁদের নাম দিয়ে তবিবুদ্দৌলার (হকিম) কথা বর্ণনা করে লিখেছেন যে নবাবের চিকিৎসক উক্ত তবিবুদ্দৌলাও ফোর্ট উইলিয়মে বন্দীরূপে ছিলেন। কিন্তু একদিন তিনি অতি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসতে চান। 'আমি তাঁকে বলি—আমি তোমায় গত বিশ বছর যাবৎ পোষণ করে আসছি। তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। কিন্তু তিনি চলে গেলেন।'

পরবর্তী অধ্যায়ে নবাব তাঁর পরিচারক ও পরিচারিকাদের নাম পরিচয়ের ফিরিস্তি দিয়ে জানিয়েছেন যে কুলি গেটের বাড়িতে তাঁরা আট দিন ছিলেন।

লর্ড ডালহাউসির পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং এসময় নবাবকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। তা সন্তোষজনক বলে উল্লেখ করে উদ্ধৃত করেছেন নবাব—

'ব্যাপারটি বড়ই দুঃখের এবং এ বিষয়ে আমি একেবারে অসহায়। একথা সকলেই জানে যে সব বিদ্রোহীরা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা আপনার নাম করছে এবং কাউন্সিলে স্থির হয়েছে যে আপনি কিছুকাল এখানে থাকবেন। আমরা আপনার গৃহ পরিবর্তন করে দেব যাতে তারা আপনার কথা না জানতে পারে। যখন থেকে আপনি কলকাতায় এসেছেন আমরা আপনাকে কোন কষ্ট দিইনি। আপনি আপনার লোকজন নিয়ে স্বাধীনভাবে ছিলেন এবং কোন বিধি-নিষেধও আরোপ করা হয়নি আপনার প্রতি। এতে করে আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে না এবং আমরা ও অফিসাররা আপনাকে সবর্দা সম্মান প্রদর্শন করব। এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। আমরা আপনার ও আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখব। আপনার সব প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা হবে এবং আপনি সমস্তই বিনা মূল্যে পাবেন সরকারী আদেশে।'

নবাব এই পত্রের যে উত্তর দেন তাতে প্রকাশ করেছেন—'আমি এমন কদাচারী মানুষ নই এবং আমি খোদার নামে শপথ করছি যে এই সব বিদ্রোহে আমার কোন অংশ নেই। আমার ছেলে আর ভাই ওর মধ্যে থাকলে, আমি সে বিষয়ে কোন খবর রাখি না। আমি শপথ করে বলছি যে, আমি এই সব দুষ্কার্যের সম্পর্কে কিছু জানি না এবং আমার বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ মিথ্যা। এখানে যদি আরো কিছু-দিন আমি থাকি, আমি বড়ই দুর্ভোগ ও কষ্ট ভোগ করব। আপনি অনুগ্রহ করে আদেশ দিন যেন আমি আমার গৃহে গিয়ে বাস করতে পারি। আমি আমার বিশ্বস্ততা দেখাব। আমি সর্বদা আপনার প্রশংসা করব। কিন্তু এই বন্দীদশায় আমি অত্যন্ত হতাশ্বাস ও নিরুদ্যম হয়ে পড়েছি।'

নবাব লিখেছেন যে তাঁর এই পত্রের কোন উত্তর পাননি এবং তাকে আর কেউ কোন চিঠি লেখেন নি।

তারপর তিনি ফোর্ট উইলিয়মে তাঁর বাস পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন—'আমরা যখন আটদিন কুলি গেটে অবস্থান করি, আমার দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেল্লার

মাঝখানে একটা কোঠি আছে, আমাকে তারা বদ্‌লি করে দিল সেখানে।

ওঃ ঈশ্বর, আমায় রক্ষা করো। এমন কেউ সেখানে নেই যার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি। এমন কি একটা পাখীও আসতে পারে না ভেতরে। আর যখন সেই কুঠুরির দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়, আমি একেবারে মুষড়ে পড়ি।

আমার সঙ্গে যে ৩৩জন নারী ও পুরুষ ছিল, তাদেরও আনা হয় সেই কোঠিতে।'

তারপর নবাব তাঁর ফুফা (পিসেমশায়) মুজাহেদ উদ্দৌলা মীর্জা জয়নুল আবেদীন খান বাহাদুরের প্রশংসা করে লিখেছেন যে, তিনি অতি দয়ালু ও উদার ব্যক্তি। 'আমার জন্যে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করতে সদাই প্রস্তুত ছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলুম যে আমি নির্দোষ, তিনি যেন আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন আমার এই দুঃসময়ে।'

তারপরে নবাব তাঁর সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ দেয়ানৎ উদ্দৌলা মুলক মহম্মদ মওতামিদ আলী খান বাহাদুর আসমৎ জঙ্গ কামেদান পল্‌টনে আখতারির বর্ণনা করেছেন। 'দেয়ামৎ উদ্দৌলা আমার সঙ্গে ছিলেন এবং আলোকশিখার ওপর পতঙ্গ যেমন করে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পারে তেমনি ব্যবহার করছিলেন আমার সঙ্গে।'

তারপর নবাব তাঁর শিক্ষক বৃদ্ধ ফতে উদ্দৌলার কথায় লিখেছেন, 'আমি তাঁকে বার বার জানাতুম যে তিনি এ ধরনের কষ্ট সহ্য করবার পক্ষে অশক্ত। কিন্তু তিনি বলতেন, আমি যতদিন বেঁচে আছি তোমায় ছেড়ে যাব না। পরে তিনি সাফর মাসে মারা যান এবং এমনি করে পালন করেন তাঁর প্রতিশ্রুতি। এই ঘটনায় আমার মন অত্যন্ত দমে যায়।'

নবাব তারপর মহ্‌তামিম উদ্দৌলা ও নিশাদ মহল সাহেবার ভাই জলফুকার উদ্দৌলার নাম করে এবং পুরুষ নারী অন্যান্য তাঁর সহবাসিন্দাদের সম্বন্ধে জানিয়েছেন যে, তারা সকলেই তাঁর প্রতি অনুগত।

'দেয়ানৎ উদ্দৌলা তীর্থে যাবার জন্যে আবেদন জানালে কাউন্সিল তা প্রত্যাখান করে।...

মহ্‌তামিম উদ্দৌলা পাগল হয়ে যান এবং এই কারণে মুক্তি পান কারাগার থেকে। তিনি অন্যদের সঙ্গে মারপিট আরম্ভ করেছিলেন—আর সে জন্যেই ছাড়া পেয়ে মুচিখোলা চলে যান।'

তারপর নবাব তাঁর (জল দেবার) পরিচারিকা কারবলাই আব্‌খাসা বরদারের বন্দী নিবাস থেকে চলে যাবার বর্ণনা করে লিখেছেন—'ও আমার হৃদয়, একটি রমণীর কাহিনী শোনাও আর কুঠুরিটার কথা বলো। চারজনের মধ্যে কারবলাই ছিল সর্বকনিষ্ঠা আর সাপিনীর মতন তার বিষ। তার মাথা গরম, অপরের সঙ্গে সে ঝগড়া করত, আমায় গালি দিত। সে বলত—আমায় ছেড়ে দাও, আমি কারুর বিবি নই, আমি কারুর মেহ্‌বুবা প্রিয়া নই। আর সে এমন জ্বালাতন করত আমায় যে তাকে বরখাস্ত করতে হল।' কারবলাইয়ের প্রসঙ্গের পরে নবাব বলেছেন এক মাতাল বদরাগী সার্জেণ্ট মেজরের কথা।

'এক রাতে আমি ঘুমোবার চেষ্টা করছি এমন সময় একজন আমার ঘরে ঢুকে

এমন সব কথা উচ্চারণ করতে লাগল যে, খোদা যেন এমন দিন আর না দেন যাতে তেমন কথা শুনতে হয়। সে ক্লান্ত হয়ে পড়া পর্যন্ত যথেচ্ছ গালাগালি দিতে লাগল আমায়। সে বলছিল, 'ওই যে রাজা, ওকে খতম করে দাও। আমার ছেলে আর বৌ খুন হয়েছে, আমার সব আপনার জন শেষ হয়ে গেছে। এমন রাজাকে খুন করে ফেলো।...'

পরের দিন আমি কর্নেলের কাছে এই লোকটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করলুম। তখনি তাঁর উদারতা ও দয়ার জন্যে তার বন্ধ হল কেল্লায় আসা। ভবিষ্যতেও তার পাহারা দেওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল। লোকটা মাতাল হয়েছিল বলেই অমন ভাষা বেরিয়েছিল তার মুখ দিয়ে।

সেই তারিখ থেকে পাহারা দিয়ে থাকা কিংবা আমাকে ওই রকম কিছু বলা বন্ধ হয়ে যায়। আমি শুনলুম যে লোকটাকে বরখাস্ত করা হয়েছে কবে থেকে!

তারপর তার ছেলেরা এসে আমার কাছে আবেদন করে বলল—যা হয়ে গেছে আপনি অনুগ্রহ করে সেজন্যে তাকে ক্ষমা করুন।

আমি বললুম—আমি আর কিছু জানি না। আমি জানি শুধু কর্নেল সাহাবকে।'

এ প্রসঙ্গের পরে, মহম্মদ শের খাঁর দাঁতে বাকর আলী চোপদারের নাসিকা কর্তনের কথা এবং সেজন্যে মহম্মদ শের খাঁর চাকরি যাওয়া ইত্যাদির বর্ণনা করেছেন নবাব। তারপর লিখেছেন—

'একদিন আমি আমার প্রাসাদের লোককে একটা চিঠি লিখি আর আমার ফুফুকে কথাটা গোপন রাখতে বলি। এইসব দিনগুলিতে আমি কখনো কিছু লিখিনি। এ চিঠিটা লিখেছিলুম ফুফার কথায়। আমি শুধু আমার টাকার হিসাব দিয়ে লিখি যে আমার ইচ্ছা অনুযায়ী সব টাকা যেন খরচ করা হয়।

আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে লোকটার বোকামির ফলে আমার লেখা চিরকুটটা কি করে পাহারাদারের হাতে পড়ে এবং এই ব্যাপারে আমাদের ওপর রেগে যান সরকার বাহাদুর। বাকর আলীকে অন্য একটি কুঠুরিতে বদলি করে দেওয়া হয়। গভর্নমেন্টর ধারণা হয়েছিল আমি কোন গুপ্ত কথা লিখেছি চিরকুটটাতে।...আমার এমনি বরাত।'

তারপর নবাব করীম বক্‌স নামে তাঁর জল দেবার লোকটির যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়া ও সে জন্যে কেল্লা থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেছেন—'মোট সাতজন কারাগার থেকে চলে যায়। ফতেদ্দৌলার জন্যে আমার মন বড় বিষণ্ণ হয়ে আছে। খোদা তাঁকে ক্ষমা করুন। তিনি অতি উঁচু দরের কবি ছিলেন আর আমি কবিতা লেখার ব্যাপারে তাঁর সাগীরদ্।

গত প্রায় দু'বছর যাবৎ আমি এখানে আছি। রোজ দুবার করে আমার খাদ্য আসে। ওরা ডেগ্‌চি পরীক্ষা করে রেখে দেয় আমার সামনে। যখনই বাড়ি থেকে কিছু আসে চৌকিদাররা তা লক্ষ্য রাখে এবং আমাকে দেবার আগে পরীক্ষা করে দেখে।

আমার মাথার চুলে উকুন বাসা বেঁধেছে আর আকাশ এখনো আমার প্রতি অবিচার করছে।

আরো দুঃখের কথা বলি। লণ্ডন থেকে আমি চিঠি পাচ্ছি আর তাঁদেরও চিঠি লিখছি আমি। এইসব চিঠির কথা বলতে গেলে একটা কেতাব হয়ে যাবে।'

একথা উল্লেখের পর নবাব বর্ণনা করেছেন তাঁর জননী মালকা-ই-কিশওয়র তাজ আরা বেগম সাহেবা, ভ্রাতা সিকান্দার হাসমৎ ও ভ্রাতুষ্পুত্রী হাসমতের মেয়ে রাফৎ আরা বেগমের মৃত্যু প্রসঙ্গ।

'ও আমার লেখনী, এবার কালো কাপড় গায়ে দাও, কারণ দুর্ভাগ্যের রঙ দেখা দিয়েছে।

তোমার বুক ছিন্ন করো। আর এই কাগজের ওপর কালো চোখের জলের ধারা।

নিজের মুখে চপেটাঘাত করো আর দুঃখের মুখের আবরণ খসিয়ে দাও।

তোমার চুল ছিঁড়ে ফেলো আর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে পাতাও মিতালী।

একদিন লণ্ডন থেকে একটা চিঠি এল। আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে রজবের আগের মাসে। সে মাসের ৯ তারিখে বুধবার সেই মৃত্যু হয়—চিঠিতে ছিল। রজবের মাসে আর একটি চিঠি পাই—হাসমৎ আর নেই। এ মাসের ১০ তারিখে শুক্রবার রাতে মৃত্যু হয়েছে হাসমতের।

আমি সব মনোবল হারিয়ে ফেলেছি। আমার মনে হচ্ছে, আমি জীবন্ত থেকেও যেন মৃত।

শাবনের ৯ তারিখে আমি একটি চিঠিতে জানতে পারি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী রাফৎ আরা মারা গেছে।

আমার জননীর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর, ভ্রাতার ৩৩ এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীর ১ বছর।

আমার জননী ও ভ্রাতার মৃত্যু হয় একই স্থানে, ফ্রান্সে।'

তারপর নবাব তাঁর রাণী মালকা-এ-অবধ আখতার মহল সাহেবার একটি পুত্র সন্তান লাভের উল্লেখ করে বেগম সাহেবার বর্ণনা করেছেন—

'১২৭৪ হিজরিতে যখন এইসব দুঃসংবাদ পাই, তখন আমার বয়স ৩৩ বছর এবং তখনো আমি সেই কারা-কুঠুরিতে আছি। তারপর একটি সংবাদ আসে যে, আখতারের একটি পুত্রসন্তান জন্মেছে। তিনি আমার দ্বিতীয় পত্নী, আলী নকী খাঁর কন্যা। তিনি অবধের রাণী। তিনি যেন একটি ফুল। একটি ময়ূরী। আর সপ্রতীভ, সুদর্শনা, সুন্দরী আখতার মহল। তাঁর মুখ ফুলের মতন রক্তাভ আর তাঁর যৌবন যেন বাগিচার বসন্ত। লালার মতন লাল তাঁর গাল দুটি। পরীরা হিংসা করে তাঁর ধরন-ধারণ। কালো সাপের মতন তাঁর মাথার চুল। দাঁতগুলি যেন হীরা মুক্তা। কাঁধ দুটি যেন আলোর বেলুন আর হাত দুখানি যেন আলমাশ পান্নার মতন। অতি ক্ষীণ কটি তাঁর।...তিনি বাগানের মতন, ফুলের মতন, চাঁদের মতন, হুরির মতন। তাঁর গাল দুটি যেন সূর্যের আভা। ভারি মিষ্টি, একেবারেই মাথা গরম নন আর গাছের মতন সোজা! বয়স ১৭ বছর। কিন্তু হায়, আমি এখন বন্দীশালায়। তাঁর বিষয়ে আমি জানি না, তিনি হীরা কিংবা পাথর।

এই বেগম একটি চাঁদের জন্ম দিয়েছেন আর তার মুখ বা অবয়ব সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। তার মুখ তার মায়ের মতন কিংবা বাবার মতন।

খোদ যদি আমায় কারার বাইরে নিয়ে রাখেন তাহলে সব বৃত্তান্ত বলি।

তা ছাড়া, রউনক্ আরা বেগম আছেন।

আমি আমার পুত্রের কোন নাম দিইনি। আল্লা যেন তার শরীর বাড়িয়ে তোলেন আর সে যেন এই মসনবীর ছায়ায় উন্নতি করতে পারে।'

পরবর্তী অধ্যায়ের শিরোনাম—'লক্ষ্ণৌ থেকে যে বেগমরা এসে এখন মুচিখোলা নামে অভিহিত মেটিয়াবুরুজে বাস করছেন তাঁদের বর্ণনা এবং কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়মের বন্দীশালা নিবাসী মসনবী লেখক। সাকীনামা।'

'ও সাকী, এমন সুস্বাদু সুরা আমায় দাও যাতে আমি এই দুঃখের পাত্র বিস্মৃত হতে পারি। এই পেয়ালা যেন পরিপূর্ণ বর্ণচ্ছটাময় হয়। এমন কি নষ্ট করে দিতে পারে আমাদের শত্রুপক্ষের মাদকতা। আর এই বেশি বয়সে আমি যেন হতে পারি তরুণ। আমি যেন এই কারাগারেও এটা উপভোগ করতে পারি।

লক্ষ্ণৌ থেকে আমি কয়েকজন নরনারীকে কলকাতায় নিয়ে এসেছি। এঁদের মধ্যে আছেন লেখকরা, সৈন্যরা এবং তাঁদের সংখ্যা পাঁচশ'র কম নয়। আমার পরিচারকরা, বেগমরা আর বন্ধুবান্ধবরাও এর মধ্যে গণনীয়।

শাহজাদার জননী এখানে আছেন।

দ্বিতীয়ত, মালকা-ই-মুলক্, জার্নেল (জেনারেল) সাব্-এর জননী। তিনি আমার পত্নী, আমার প্রিয়া। আমার গোপন কথা তিনি জানেন এবং আমার সব বেগমের চেয়ে বিশ্বস্তা। তাঁর নাম তাজ উন্নিসা। তিনি যেন এ জগতে দীর্ঘকাল থাকেন।

তৃতীয়া বেগম আমার প্রিয়তমা, সঙ্গদানের যোগ্যা তিনি। তাঁর খেতাব মহবুব-ই খাস (বিশেষ প্রিয়া)। তিনি অতি রমণীয়া এবং তাঁর নাম আশিক্ নুমা। সুযোগ্যা সঙ্গিনী তিনি, আর কি অপরূপ তাঁর নামটি।

আমার চতুর্থা পত্নীর নাম জানে জান্। তিনি এখন পীড়িত। ওঃ খোদা, তাঁকে নিরাময় করে দিন যাতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

তারপর বড়ী বেগম। তাঁর খেতাব আনীক-এ সুলতান এবং তাঁর নাম মুমতাজ আলম্। এই নামটি তার পক্ষে যথেষ্ট।

তার পরেরটি হলেন কইসর বেগম আর এ নামটি আমি লিখছি ভারি মনে। তাঁকে আমি নিকা কিংবা মুতা কিছুই করিনি (অর্থাৎ তিনি নবাবের বিবাহিত নন)। তিনি আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্যে এসেছেন। কিছুকাল পরে তিনি লক্ষ্ণৌতে ফিরে যাওয়া স্থির করেন আর আমায় ব্যাথা দিয়ে চলে যানও। আমি তাঁকে এগারো হাজার টাকা দিতে মনস্থ করেছিলুম, যাতে তিনি আমার সঙ্গে থাকেন। কিন্তু তাঁর মন এত খারাপ হয়েছিল যে তিনি চলে গেলেন।

আর একজন বেগম, খুজিস্তা মহল, কারবালায় তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। তিনি এখন মুচিখোলায়।

তার পরেরটি হলেন জাফরি বেগম। তাঁর ঠোঁট বাগিচার ফুলের মতন লাল আর দাঁত যেন সাদা মুক্তো। তাঁর মুখ ফুলের মতন দেখায়। তাঁর চুলের গন্ধ যেন কস্তুরির খোশবু। তাঁর চোখ দুটি আমার মনের পাখীকে শিকার করে বেড়ায়। আর তাঁর মুখের জন্যে ছাড়তে প্রস্তুত আছি ফিরদৌসীর সমস্ত কবিতা। তাঁর

ভ্রূযুগল এমনভাবে বাঁকা যে মনে হয় দুই পালোয়ান মল্ল যুদ্ধ করছে। তাঁর বুক দুটি যেন খালের মধ্যে বুদ্বুদ। যেন সাগরের ঢেউ। তিনি অতি চমৎকার সপ্রতিভ। আর কি মিষ্টি তাঁর কথা। তাঁকে সব হুরীদের মধ্যে মুকুট বললেই ঠিক হয়।··· আমি তাঁর বিরহে জ্বলে যাচ্ছি। কত বার তিনি আমায় পান সেজে পাঠিয়ে দিয়েছেন এই কুঠুরিতে। আবার এক এক সময় বন্ধ রেখেছেন, বলে পাঠিয়েছেন—তাঁর হাত শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কখনো কখনো তিনি চলে যেতে চান লক্ষ্ণৌ। কখনো বা কোন তীর্থে। কখনো আসতে চান আমার এই কুঠুরিতে। এক এক সময় আমার কাছে টাকা চান। কখনো এক হাজার, কখনো ছ'হাজার টাকা। আমি বড়ই মুস্কিলে পড়েছি, এই নারীর বিষয়ে বিমূঢ় হয়ে যাই আমি। বুঝতে পারি না, তিনি আমায় ছেড়ে চলে যাবেন কি না।

তাঁর মুহব্বতে আমি নিজেকে নষ্ট করে ফেলব। তাঁর বিরহে মৃত্যু হবে আমার। আর সেজন্যে তিনিও হবেন অনুতপ্ত।

মাসের পর মাস আমার প্রিয়াদের বিচ্ছেদ আমি ভোগ করছি। আর বিষাদ বেদনার ধোঁয়া আমার অন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি কখনো যাঁকে কাছছাড়া করিনি এখন তাঁর সঙ্গ থেকে আমায় দূরে থাকতে হচ্ছে। কি দুর্ভাগ্য আমার।

ওঃ খোদা, আমাদের বিচ্ছেদের রাত্রি যেন প্রভাত হয়। তাঁরা যেন আমায় আলিঙ্গন দিতে পারেন।

এই জেলখানায় এসব কোন দুর্ভোগ নেই যা আমি ভোগ করিনি আর এই বিরহের কয়েদখানা এত উঁচু যে আমি সব কিছু ভুলে গেছি।

এ তো কুঠুরি নয়, এ হল বিরহের দহ। এ যেন অপার সাগর আর এই দুঃখে কেউ বাঁচাতে পারে না। তরুণ যায় বুড়ো হয়ে। এই দুঃখে আমার অন্তর জল হয়ে যায়। আর একটা পাহাড় যেন আমার বুকের ওপর চেপে বসেছে। রুদ্ধ করে দিয়েছে আমার মনের কুঁড়িটিকে।

ভোরাই হাওয়াও আমার কাছে প্রিয়াদের কোন খবর এনে দেয় না। দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি। এ বিরহ-রাতের কোন সকাল নেই—আমার পিয়ারীদের কোন সংবাদ আমি পাই না।

কোন দিকে কোন আশা নেই। আর আমি, আমার বন্ধুরা আর চাকররা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছি।

একদিন আমার মাথায় মুকুট ছিল। আমি ছিলেম অওধের রাজা। আমার হুকুমে ছিল হাজারো চাকর আর সেপাই। ১০০০ নবীশ, প্রায় ৫০০ হেকিম আর ১৫০০ চোপদার। আমার প্রজাদের বিষয়ে আমার কোন ধারণা নেই। আমার বিবিদের যদি গুনতে শুরু করি ৬০ থেকে ৭০ জন হবেন। তাঁদের মধ্যে ৬।৭ জনকে আমি এনেছি কলকাতায়।

বিনা দোষে আমায় কয়েদখানায় থাকতে হচ্ছে। কয়েদীদের সারিতে পড়েছি আমি। কিন্তু আমি একজন রাজা।

এই জেলখানায় মেয়ে পুরুষ নিয়ে ১৮ জন রয়েছে। কিন্তু আমি একা।

দিনরাত এই কুঠুরির মধ্যে আমার দিল্ জ্বলছে। প্রত্যেকে তিতি-বিরক্ত হয়ে গেছে এই জীবনে। এমন কি ঝাড়ুদার আর পানিপাঁড়ে পর্যন্ত কড়া পাহারার জন্যে গণ্ডগোলে পড়েছে। ঝাড়ুদার যখন মেঝে সাফ করতে আসে, তাকে অভিযোগ করে ইংরেজ সেপাই।

এমন কি যে তেলওয়ালা বাতি জ্বালবার জন্যে তেল আনে, তাকেও নজরে রাখা হয়। মিস্টার হার্বার্ট বলে একজন প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় হাজিরা দেন আমার কামরায়। তিনি মেজর আর কর্নেলের সহকারী, নিজেই সব বন্দোবস্ত তদারক করেন। রোজ রাতে তিনি গুনে দেখেন বন্দীদের। দারোগার নাম কলিন সাহাব। আর কোন লোকজনের অসুখ করলে ডাক্তার আসেন। আমার তবিয়ৎ খারাপ হলে হেকিম আসেন। তাঁর বর্ণনা আগে করেছি। তিনি চলে গেছেন জেলখানা থেকে। আমার চিকিৎসার জন্যে তিনি আসেন।

এই কোঠিটা যদিও খুব বড়, কিন্তু কোন কাজে আসে না আমার। কারণ প্রত্যেক দরজা বন্ধ থাকে আর কি দারুণ গরম। আর যে দরজা ক'টা খোলা হয়, সেদিক থেকে আসে রোদ। তাই সেগুলোও অকেজো। আমি মাঝের তলে একটা ঘরে আছি। ওপরে কিংবা নীচে নয়।

গভর্নর জেনারেলকে আমি অনেক চিঠি লিখেছি। কিন্তু কোন চিঠিরই জবাব দেননি তিনি। যখনই আমার মুন্সীকে ডেকে পাঠাই, কর্নেল সাহাবের সঙ্গে তিনি হাজির হন।'

তার পরবর্তী পরিচ্ছেদে নবাব তাঁর সব পুত্র-কন্যাদের বর্ণনা করেছেন, জীবিত ও মৃত সকলের। বিশেষ মীর্জা মহম্মদ হায়দার আলী বাহাদুরের মৃত্যু।—

'সাকিনামা। ও সাকি, লাল সুরা আমায় দাও, যাতে আমি সব দুঃখ ভুলতে পারি। আমাকে একটি প্রিয়া এনে দাও, যে বসে থাকতে পারে আমার চোখের সামনে।

ফুল যেন ফোটে। বাতাস যেন বয়। গাছে যেন ফল ধরে। আর কোকিল যেন গান গায়। যাদের কোন সন্তান নেই তারা যেন সার্ব* গাছের মতন। ফল ছাড়া ফুলও কিছু কাজের নয়। আর যে মানুষের সন্তান নেই সে যেন কাঁটাগাছ।

একথা আমার বলবার কারণ, আমার খুব আশা হচ্ছে যে খোদা বোধহয় শীঘ্রই আমার সন্তানদের সঙ্গে আমায় মেলাবেন আর আমাকে এই বন্দীদশা থেকে মুক্ত করবেন।

আমার ছেলেমেয়ে ১৩টি। তার মধ্যে ৮টি ছেলে আর ৫টি মেয়ে।

বড় ছেলে নৌশের খাঁ কাদ্‌র্ তার বয়স হয়েছিল ২২ বছর।

আল্লার হুকুমে সে ছিল হাবা আর পাগল। যা হোক, সে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সে মাসে আমি তার শাদী দিই। তার বিবির নাম শাহ্‌রিয়ার, সে অন্য স্বামীকে ভালবাসত। ঈদের মাসে লক্ষ্ণৌতে মারা গেল নৌশের খাঁ।

দ্বিতীয় পুত্র মীর্জা কেমা কাদ্‌র্ আলি। যুবরাজ প্রায় ২০ বছর বয়সী। সে লেখাপড়া শিখেছে। তার বিবি হয়েছে আমার বোনের মেয়ে, নাম বহু বাদ্‌শাহ।

---

*এই গাছ খাড়া, এতে ফুল-ফল হয় না, শুধু পাতা।

মীর্জা কাদ্‌র্‌ এখন লণ্ডনে আর বহু বাদ্‌শাহ আছে লক্ষ্ণৌতে। আমি তাকে আনাব।

এরা দুজন হল আমার প্রথম পত্নীর ছেলে।

তৃতীয় পুত্র মীর্জা মহম্মদ হাসবর আলি আমার সঙ্গে এখানে আছে। তার বয়স ১৭ বছর, আর আলি তকি খাঁর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। তার নাম ফখ্‌ফুর বহু। এই ছেলের মা হলেন মাল্‌কা-ই-মুল্‌ক, তিনি মুচিখোলায় আছেন। এই কয়েদ হওয়ার জন্যে তাঁর মন খুব খারাপ।

তার পরের ছেলে বির্জিস কাদ্‌র্‌। বয়স ১৪ বছর। তার জননী—হজরৎ মহল। তিনি বিদ্রোহের নেত্রী আর এখন রাণী।

তারপর মীর্জা কম্‌র কাদ্‌র মহম্মদ আবিদ আলী ৭ বছরের। সে লক্ষ্ণৌতে আছে আর তার মায়ের নাম ফক্‌র মহল।

তার পরের ছেলে আস্‌মা জাহ কাদ্‌র আমার সঙ্গে আছে। তার মা নেই। তাঁর নাম ছিল রশ্‌ক মহল। ছেলেকে ছেড়ে তিনি চলে গেছেন। আমিও তাঁকে ডাকিনি। আর তিনিও ফিরে আসেননি। আমার প্রিয় বিবি ছেলেটির যত্ন নেয়। খোদাও তার ওপর সদয়। তার বয়স ৫ বছর। সে মুচিখোলায় আছে।

তারপর করা হোসেন মীর্জা। তার মা মেহ্‌দি কোম। সে থাকে লক্ষ্ণৌতে। তার ৪ বছর বয়স।

ছোট ছেলের নাম ছোটে মীর্জা। তার মা আখ্‌তার মহল। তারা কলকাতায়। তার বয়স ১ বছর।

প্রার্থনা করি আমি যেন জেলখানা থেকে মুক্তি পাই আর মিলতে পারি তাদের সঙ্গে।

রাজপুত্রদের কথা শেষ হল। এখন লিখি রাজকন্যাদের বিষয়ে।

নবাব কুব্‌বা বেগম, আস্‌মৎ উদ্‌দৌলার বিবি। সে মেয়েদের সবার বড়, এখন লক্ষ্ণৌতে আছে। তার বয়স ১৮ বছর আর তার মায়ের নাম সুলেমান মহল।

দ্বিতীয় রাজকন্যার নাম জয়নাব বেগম। তার জননী থাকান্‌ মহল। তার ৪ বছর বয়স। মায়ের সঙ্গে লক্ষ্ণৌতে থাকে।

তারপরের রাজকন্যার নাম সাহেরবানু বেগম, নবাব বেগমের মেয়ে। তিন বছর বয়সে লক্ষ্ণৌতে সে মারা যায়। তার মায়ের সঙ্গে ওখানে থাকত সে।

চতুর্থ রুকাইয়া বানু, নবাব সইদা বেগমের মেয়ে, ৩ বছর বয়সে মারা পড়ে।

তারপর দায়হাম্‌ আরা, মুলগণ বেগম সাহেবার মেয়ে। লক্ষ্ণৌতে সুলতান বেগম আড়াই বছরের মেয়েকে রেখে মারা গেলেন। মেয়েকে দেখাশোনা করেন তার মাসী নওরোজ বেগম।

ওঃ খোদা, আমার সঙ্গে আবার মিলিয়ে দিন।

আমি কয়েদখানায় রয়েছি অথচ আমার কোন অপরাধ নেই। জেলে আমি কত লোকসান সয়েছি।

এখানে কেউ আমার সঙ্গী নেই। কারণ ছেলেমেয়েরা কেউ লণ্ডনে, কেউ লক্ষ্ণৌতে আর কেউ মুচিখোলায়। কখনো কখনো আমি সন্তানদের কথা ভাবি, কখনো

রাজত্বের কথা, কখনো দারিদ্র্যের কথা। চারিদিকে অশান্তি। আমার দু'চোখ যেন অন্ধ হয়ে পড়েছে। দৃষ্টিশক্তি যেন লোপ পেয়ে গেছে।'

তারপর নবাব লিখেছেন লক্ষ্ণৌর দারোগা দেউড়ির দরখাস্তের কথা আর তাঁর কুঠুরির অন্যান্য বিষয়। এই পরিচ্ছেদের প্রথমেও যথারীতি সাকিনামা এবং ফুল ও সুরার উল্লেখ তিনি করেছেন। তারপর লিখেছেন,

'আমি নেহাৎ একজন দরিদ্র কবি। জ্ঞান আমার সামান্য। কবির শ্রেণীতে আমার কোন মর্যাদার স্থান নেই।

এবার বলি, একদিন কর্নেল সাহাব আমার হাতে দিলেন লক্ষ্ণৌর একখানি চিঠি। চিঠিখানি ছিল একটি লেফাফার মধ্যে এবং সেটি খোলা হয়নি।

লক্ষ্ণৌতে একজন দারোগা ছিল, তার নাম ওয়াজেদ আলী। দুপুরে আমি সেই চিঠিটি পাই। তাতে এমনি একটা আর্জি ছিল ঃ—'আপনি শান্তিতে থাকুন। যখন থেকে ইংরেজরা রাজ্য শাসন করতে আরম্ভ করলেন, বিদ্রোহীদের সাহস চলে গেল। ইংরেজদের অনেক নারী ও শিশুদের প্রাণ আমি বাঁচিয়েছি আর তাঁরা আমার এই সাহায্য করার জন্যে স্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং আপনার বেগমদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছেন আমাকে। তাই আমি আপনাকে সাহস করে জানাচ্ছি যে, নবীনা বেগম একটি পুণ্য কাজ করেছেন যে, চীফ কমিশনারের বিবি ও ছেলেমেয়েদের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করার ফলে তাঁদের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

আমি অন্যান্য মহলদের কথা এখানে জানাচ্ছি। সব চেয়ে ছোট মহল এগিয়ে এসেছেন সবার আগে। তিনি অনেককে বাঁচিয়েছেন। তারপর সুলতান জাঁহা। তারপর শাহেন্‌শা মহল। তারপর আমীর মহল। ফকর মহল তাঁর ছেলেকে নিয়ে বেঁচে আছেন। ষষ্ঠী ছাতার মহল বহাল তবিয়তে আছেন। তারপর ওমরাও মহল। তারপর সইদা মহল—তিনিও আর আর বেগমদের সঙ্গে ছিলেন।

আমি তাঁদের সংখ্যা গুনে দেখেছি ৮ জন। তাঁদের প্রাণের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা এখানে থাকতে পারেন।

প্রত্যেক নবাবজাদীই কষ্টে আছেন। তাঁদের পোশাকআসাক নেই, খানাপিনা নেই। শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁরা। ফৌজের ঢেউয়ে তাঁরা ভেসে গেছেন। শহরের কমিশনারকে আপনি লিখুন, তারপর আমি চেষ্টা করব তাঁদের এক জায়গায় আনতে। খুব তাড়াতাড়ি করুন! কারণ অনাহারে রয়েছেন তাঁরা। আপনি লিখুন যে তাঁরা সবাই নির্দোষী। তাঁদের মাথা পিছু ৫০ টাকা করে দিন যাতে তাঁদের দুর্দশার কিছু লাঘব হয়।

আটজন মহলেরই সব মালপত্র কোতোয়ালিতে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছে। আমি সেসবের ওপর শিলমোহর করে দিয়েছি আর আমাদের জানানো হয়েছে যে, শীঘ্রই ফেরত দেওয়া হবে সমস্ত জিনিসপত্র। বড় সাহেব খুব দয়ালু। আমি কর্নেলকে বলেছি যে আমি গভর্নর জেনারেলকে লিখব আর তিনি বলেছেন যে আমি তা পারি। চিঠিখানি আমি তাঁকে দিয়েছি। খোদা, দোয়া করুন। গভর্নর জেনারেলকে আমি সমস্ত ব্যাপারটা লিখেছি।

আমার স্বদেশ থেকে একবছর পরে এই পত্র পেলাম। এটা ১২৭৪, সাওয়াল

মাস। আমি গভর্নর জেনারেলকে অবস্থা জানিয়ে লিখলাম আর উত্তর এল, 'দুশ্চিন্তা করবেন না। আমরা ব্যবস্থা নেব।'

আমার বিষয়ে, কাউন্সিল সিদ্ধান্ত করেছেন যে দু লক্ষ টাকা আমায় ব্যয়ের জন্যে দেওয়া হবে।

দারোগা ওয়াজেদ আলীকে আমি যে নির্দেশ পাঠাই এই তার প্রতিলিপি ঃ— 'আমি গভর্নর জেনারেলকে লিখেছি যে আমার পরিবারবর্গের পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত যেন করা হয়। আপনিও আমার বিষয় সম্পত্তির দিকে লক্ষ্য রাখবেন। আমার পরিবারের সবাইকার বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততার কথা সরলভাবে লিখবেন আর তাঁরা প্রাসাদে ফিরে এলে তাঁদের নাম পাঠিয়ে দেবেন।'

গভর্নর জেনারেল আমায় খুব শ্রদ্ধা করেন আর আমার ওপর তাঁর বড় দয়া। আমি তাঁর দয়ার কিছু বর্ণনা এখানে করি। যখন আমি রাজা ছিলাম তখনকারই মতন ভাল সম্পর্ক তিনি বজায় রেখেছেন আমার সঙ্গে। তিনি একবার মাত্র আমাকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন এই গারদে, পরে আর কোন পত্র আসেনি। আমি বুঝতে পারি না কেন ওরা আমায় কয়েদ করেছে। তবু এখনো আমি গভর্ণর জেনারেলের প্রতি ধন্যবাদপূর্ণ আছি। একদিন আমার বরাত ফিরে যেতে পারে আর যাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে তাদের সঙ্গে আবার মিলন ঘটতে পারে।'

তারপরের অধ্যায়ে নবাব ওয়াজিদ আলী তাঁর অন্যতমা বেগম সুলতান নবাব খুজিস্তা মহল সাহেবা কারবালাইয়ের বিষয়ে লিখেছেন।—

'ও সাকি, আমায় সুরা দাও, আলিঙ্গন দাও। আমার চোখের ওপর তোমার চোখ রাখো, আমার ঠোঁটের ওপর তোমার ঠোঁট এমনিভাবে চলুক। আমি তোমার কাছে নত হই, আমার অনুগতি জানাবার জন্যে। তুমি আহ্বান জানাও যাতে এখান ছেড়ে চলে যেতে পারি, কারণ পানের এখন সময় হয়েছে। আমাদের ওপর কোন সমীহ ভাব দেখিও না, কোন তারতম্য নয়।

কোথায় সে সারঙ্গীরা, শ্রোতৃবৃন্দ যে উপভোগ করবে? কোথায় সেই সরদ-নেওয়াজ? ডাকো তাদের। কোথায় সেই সাজিন্দারা? তাদের সাজ নিয়ে আসতে বলো। কোথায় সে তম্বুরা? কোথায় সে চাকারা? কোথায় সেই দোহারা আর পাখোয়াজ? কোথায় সেই সুর-আয়না আর সুর-শৃঙ্গার? মঞ্জিরা কোথায়? ডফ্ কোথায়? কোথায় চঙ্গ্? মোচঙ্গ্ কোথায়? জলতরঙ্গ কোথায়? কোথায় তবলা বাঁয়া? খঞ্জনি আর সেতার কোথায়? কোথায় সেই সারি বেঁধে দাঁড়ানো সুন্দরীরা? ঝাঁঝ, তম্বুর, ঘুঙ্ঘুর কোথায়? বাঁশি আর হরাব? তম্বুরিন্ আর সাজ? কোথায় মাক্রোতি আর সর্জিৎ? মাদল কোথায়? কোথায় সেই কান্তোল্ তাসা? কোথায় দোহদাল আর তামাসা? বেলাহ্ আর বেয়ানা কোথায়? অর্গান, শাহ্নাই আর নাকড়া কোথায়?

মেহেরবানি করে আমায় নাচ দেখাও, এই সব যন্ত্রের মিষ্টি সুর শোনাও। গায়কদের ঠোঁট যন্ত্রের সঙ্গে নড়ে। খরজের কি মাহাত্ম্য। সুরের খোঁচগুলো আমার বুকে যেন তীরের মতন এসে বেঁধে। আমি যেন শুনতে পাই গিট্কিরি আর তহ্রির। আর শিল্পীদের গুণের কদরে বখ্শিস্ দিতে পারি চাঁদকে। শোনাও

সেসব অবচিন্ আবচিন্ আর পাল্টি। সেই সাতের তানের বাহার দেখাও। রেখব্ সুর শোনাও, যাতে গান্ধারের দাপট কম্তি হয় আর মধ্যম, পঞ্চম, ধৈকত লাগে—আর তারিফ্ করে ওঠে আশ্মানও। অন্য রাগ যেন হাত কচ্লাতে থাকে। আমাকে শুনতে দাও সেই কলা, পাতার্ আর ভর্জিন্। ২২ শ্রুতি থাকবে আর ১৬ কলা, তারপর আমি সেই সুরেলা সঙ্গীত শুন্ব। ৬ রাগ, ৩৬ রাগিণী আমি গুনেছি আমার আঙুলে। কলাবন্ত, কাওয়াল আর ধাড়িদের ডাকো। ধ্রুপদের স্বাদও কিছু পেতে দাও আমায়। কলাবন্ত আলাদা। কাওয়াল আলাদা। কিছু টপ্পাবাজ আর খেয়ালীদের আনো। আসুক গজল আর ঠুঙ্রি গাইয়েরা। নুক্টা আর দাদরা গাইয়েরাও। একটা একতালা আর রূপক হবে। কোন কোন গায়ক দেখাবেন চৌতলা, আড়া-চৌতলা আর খাম্সা। তেতালার কিছু স্বাদও যেন আমি পেতে পারি। একটা চতুরঙ্গ আর চুট কলা যেন হয়। প্রত্যেক তালের নিপাদ আমায় দেখাও। লছমী আর সওয়ারী যেন হতে পারে আর এইসব তালের সঙ্গে যেন নাচে সুন্দরী মেয়েরা। পটতাল আর টিমাও হোক।

আমায় এনে দাও সুখ বিলাস। ও সাকি, আমায় সুরা এনে দাও। এই বর্ষা ঋতুর রাত যে ফাঁকা কেটে যাচ্ছে তা যেন উপভোগ করতে পারি। খোদাতালার কাছে প্রার্থনা করি যেন নাচ আর গানের সঙ্গ পাই আর তার মধ্যে সব সময় দেখায় তার ভদ্র আচরণ।

কয়েক মাস হয়ে গেল আমার প্রিয়াদের বিচ্ছেদ আমি ভোগ করছি। তাঁদের চোখ আমায় দেখাও। আর কতদিন অপেক্ষা করতে পারি আমি। তোমাদের প্রেমিক পড়ে আছে কয়েদখানায়।

এই কুঠুরির মধ্যে আমি একা। শুধু তোমাদের স্মৃতি আমার মনে ভরা রয়েছে।

এক প্রেমিক পড়েছে বিপদে। কেউ তাকে দেখবার নেই! আল্লা জানেন, কে তাকে দেবে সুখ।

ইংরেজদের এই গারদের কথা বলো। এই জেলখানায় একেবারে হাওয়া নেই। বিনাদোষে আমায় কয়েদ করা হয়েছে। কিন্তু সেজন্যে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। কারণ আমি আলীর নফর, যিনি আমার তদারক করেন আর বাঁচিয়েছেন সল্মান্কে। তিনি আমার মুরুব্বি। জেলখানা থেকে আমায় ছাড়িয়ে নেবেন।

শোনো এই করুণ কাহিনী। আমার যা কিছু ঘটেছে সব তোমায় বলি। আমি কারুকে প্রেমবিশ্বাসী দেখিনি। একশ' বছর ধরে যদি কেউ আর একজনের জন্যে জীবনের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে চলে তবু বিশ্বাসঘাতক হতে তার কিছুই সময় লাগে না।

১২৭৪ সালে (হিঃ) আমার বিবি খুজিস্তা মহল মুচিখোলা থেকে যাত্রা করেন। তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর। আমার কয়েদ হওয়ার জন্যে তাঁর একঘেয়ে লাগছিল। তিনি আমার পোশাক চেয়ে পাঠালেন। তারপর আমায় উপহার দিলেন তাঁর দোপাট্টা। আমার মনে হল, তাঁর মনে আমার জন্যে মুহব্বৎ বেড়েছে। কিন্তু দুদিন পরে ফিরিয়ে পাঠালেন আমার পোশাক। তখন আমিও ফেরত দিলাম তাঁর দোপাট্টা।

তারপর তিনি জাফ্রি কোমের বাড়ি চলে গেলেন। শুনেছি তিনি লক্ষ্ণৌ

যাবেন আর সেখান থেকে তীর্থ করতে কারবালায়।

শেষ পর্যন্ত তিনি কারবালার পথে যাত্রা করেছিলেন। আমি তাঁকে ৫০০ টাকা দিই এবং তা খরচ করেন তিনি। ১০০ টাকা হিসাবে তিনি হাত খরচ পাচ্ছিলেন। কিন্তু আমার রাজত্বের সময় আমি তাঁকে মাসে ২৫০০ টাকা করে দিয়েছি। আমি অনুরোধ জানিয়েছি, ভালবেসেছি, মান্য করেছি। কিন্তু তিনি আমার অনুরোধ কিংবা ইচ্ছা বুঝতে পারলেন না। আর এই জগতের নিয়ম যে হতাশার সময়ে কিংবা দুঃখের দিনে পাওয়া যায় না কাউকে।

পতঙ্গ যখন কামনার আগুনে নিজেকে জ্বালিয়ে ফেলে, সেই আগুন কেন বিসর্জন দেয় না নিজের অস্তিত্ব? তারও শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। ওই প্রেমিকের জন্যে বাতির নিশ্চয় গরজ আছে। কারণ সে তার রূপকে জ্বালিয়ে দেয়। জ্বলন্ত শিখার জন্যে তার মনে প্রেমের আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু তো নেই। আর সে সেই শিখার গভীরেই মেতে যেতে চেয়েছিল। এ সেই প্রেম, যা মুর্দেগানদের জন্যে ব্যবস্থা করে কফিনের। এ সেই প্রেম, যা বাগিচায় পড়লে সারা বাগিচা জ্বলে যায়। আর যদি শরীরের ওপর পড়ে, তাহলে খাঁটি মদের মতন জ্বালিয়ে দেয় দেহকে। এ সেই প্রেম, যা ফুলের সঙ্গে এলে ফুলের মুখ পুড়িয়ে দেয়।

এ সেই প্রেম, যা কফিনের মধ্যে থাকলে সে কফিন থাকতে পারে না মুর্দার ওপরে। এ সেই প্রেম, যা হামেশা আছে কোয়েল আর ফুলের মধ্যে আর এই দুয়েরই অন্তর জ্বালিয়ে দেয়। আর সে সিংহাসনের রাজা।

ওঃ আখ্‌তার, শান্ত হও, খেয়াল রাখো। কি আশ্চর্য কথাই তুমি শোনালে। খোদার কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন শীঘ্র তোমায় কারামুক্ত করেন। আমি এই বিপদে পড়েছি শুধু আমার রাজত্বের জন্য। না হলে আমার আর এই বন্দীদশার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।

ওঃ আল্লা, আমাকে এই কয়েদখানা থেকে উদ্ধার করো। শোকে আমার কথা কইবার আর শক্তি নেই। ওঃ খোদা, এই বেচারা আখতারকে মুক্ত করে দাও।...'

'ও লক্ষ্মীর কোয়েল, তুমি গাও। ও আমার কলম— বন্ধুদের প্রশংসা করা তোমার এক গুণ আর তুমি ফুলের মতন—প্রিয়ার রূপ তুমি উন্মুক্ত করো আর চিন্তার পাখির কাবাব বানাও। প্রিয়া বিরহের শোকের যন্ত্র তুমি বাজাও। নতুন সঙ্গীত সৃষ্টি করো সুরশৃঙ্গারে।

ও আমার পিয়ারীর কেশগুচ্ছ, তুমি তার মুখের ওপর নেমে এসো। কেঁদে ওঠে আমার হৃদয়।

আমি এক অভিশপ্ত মানুষ।

ও কোয়েল, ফুলের সঙ্গে বিবাদ করো না। ও কুঁড়ি, তুমি ফুটে ওঠো ফুল হয়ে।

সব কিছু বর্ণনা করবার চেষ্টা করো সচেতনভাবে আর প্রিয়ার মুখের প্রতি পুরো শ্রদ্ধা জানিও।

ও মালী, কোথায় এই সব গাছ—আর্‌ ঘেঁয়া, সুম্বুল, নস্‌রিন্‌, নস্‌তরঙ্গ্‌, রাইহান্‌ গুলে জাস্‌রফি, লীলা, পীলা, সাম্বো, জুই চামেলি, নার্গিস আর দোণ্দি?.....

এই ইংরেজ তরুণীরা চমৎকার। কিন্তু তারা মনের অবস্থা বোঝে না আর ভালবাসাকে মনে করে বদ্ খোয়াবি।

ও শ্রোতার দল, মন দিয়ে শুনুন আর যে রাজা এই অবস্থায় এসে পেঁছেচেন তাঁকে আপনাদের সম্মান জানান।

আমি খোদার নামে কসম খেয়ে বল্‌ছি যে আমার এই জগতের সম্বন্ধে কোন দুঃখ নেই। আমি এখন আপনাদের জানাই কয়েকজন জেনানার অবিশ্বাসের কাজ, রূঢ়তা আর অহংকার। এঁরা—আখ্‌তার মহল, জাফ্‌রি আর কাইসার—আমার বেগম ছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ নেই। আর আখতার মহল আমায় খুবই ভালবাসেন। তাঁর বিচ্ছেদ আমার পক্ষে বড় কষ্টকর। আর এই জেলখানায় আমার কিছু ভাল লাগে না।

জাফ্‌রি আমার সঙ্গে ৭ বছর ছিলেন আর কাইসার ১৩ বছর এবং আমার মনে আরো কামনা কিছু নেই। আখতার আমার সঙ্গে আছেন ৯ বছর আর এই বেগম আমার প্রেমে আছেন গত ১৮ বছর।

যখন আমার মন খুব খারাপ হয়ে যায় তখন আমি চেয়ে নিই কাইসারের ছল্লা (পায়ের আঙুলের আঙ্‌টি) আর এক প্রিয়ার মিসি, আখতার মহলের কেশ, জাফ্‌রির চর্বিত তাম্বুল।

জাফ্‌রি একই জিনিস আগে পাঠিয়েছিলেন আর আমি তার স্বাদও নিয়েছি। আমি তাঁকে এবার পাঠাবার জন্যে বলি একটি আঙ্‌টি, একটি কম্বল, একটি দোপাট্টা, হল্‌দে পাউডার।

জাফ্‌রি উত্তর দিলেন—এইসব জিনিস আপনি তাঁর কাছে চান, যাঁকে আপনি ১০০০ টাকা দিয়েছেন আর যাঁর প্রেম আপনার হৃদয়ে রয়েছে। আমি আপনাকে দেব না।

দুঃখ ছাড়া তিনি আর কিছুই দেননি আমায়।

অন্য রাণী জানালেন—জগতে আমার নাম প্রিয়া। আপনি সেইসব জেনানার নখ্ চান যারা আপনাকে ভালবাসেন। আর তাঁরা আপনাকে পাঠাবেন যাঁরা আপনার গোপন কথা জানেন। আপনি নখ্ চেয়ে পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমি নাপিতানী নই। আর আমি নাপিতগিরি করতে শিখিনি।

দিল্‌দারও আমায় মিসি পাঠালেন না। তিনি লিখেছেন যে তিনি খুব অসুস্থ। সেজন্যে তা পাঠাবার কোন উপায় করতে পারেন নি।

কাইসার লিখেছেন—আমাকে আপনার পিয়ারীদের তালিকায় রাখবেন না। আমার কোন পায়ের আঙ্‌টি নেই।

আঙ্‌টি হারাবার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত আছি। কেউ আমার প্রতি দয়া করলেন না। আর কেউ তাঁদের প্রেম পাঠালেন না এই গারদ ঘরে।

কিন্তু একজন বেগম আছেন—আখতার মহল আর তিনি আমার এই বন্দীজীবনে বন্ধু হয়েছেন। তিনি আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর কেশগুচ্ছ। আর আমি রেখে দিয়েছি আমার বুকের কাছে। তিনি আমার জন্যে খানা পাঠিয়েছেন। এই তো কারুর বন্ধুত্ব আর ভালবাসা জানাবার সময়। আবার এই রাণী রোজ খানা পাঠান

আর ৫ খিলি করে পান পাঠাতেন। জাফরের একটা আঙুটি আমার কাছে আছে, আগে যা চেয়েছিলাম। উবাট্‌নার একটা মোড়ক আমার কাছে আছে আর সেজন্যে কিছু ভাবি না। আর যে দোপাট্টা আর কম্বল কয়েদখানায় পাঠানো হয়েছিল সে কথা বলি। বাকর আলীকে যখন জবাব দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেও দুটি জিনিস সঙ্গে নিয়ে যায়। খোদা তাকে নাশ করেন। আমার জিনিস চুরি করেছে সে।'

তারপরের পরিচ্ছেদে নবাব বন্দীশালায় তাঁর খরচপত্রের কথা বর্ণনা করেছেন—

'ও আমার মন, থামাও এই বর্ণনা আর বলো যে বিয়োগান্ত ব্যাপার ঘটেছে তোমার হৃদয়ে।

এই জেলখানায় আমি যা খবর করেছি, তার ফিরিস্তি দিচ্ছি। আজ ২৬শে জিনকৎ, ১২৭৪, শুক্রবার।...

অযোধ্যার রাজা আখতার, যিনি এই গারদে রয়েছেন আর যাঁর এখান থেকে উদ্ধার পাবার কোন আশা নেই, তাঁর কিছুই অর্থ নেই। আর যা আমি আজ পর্যন্ত করেছি, আমি লিখেছি হিসাবপত্রের মধ্যে। এটা বখ্‌শিস নয়, দয়াও নয়। এ নিতান্তই গরীবের খানা আর এই টাকায় আমার পুরোপুরি হয় না। মুনসী সফ্‌দারকে আমি ৫০০০ টাকা দিয়েছি ব্যয় করবার জন্যে। ৪৫,৪০০ টাকা লণ্ডনে। আবার ৭৯,৩৫০ টাকা লণ্ডনে পাঠিয়েছি। আমার রাণীকে দিয়েছি ৪৫,৪০০ টাকা, মুজাহেদকে ১১,০০০ টাকা, পিয়ারী দিল্‌দারকে ২৫,৪০০ টাকা, জাফরি বেগমকে ৬৩০০ টাকা। জুলফিকারকে ৫০০০ টাকা, কারবালাইকে ১০০০ টাকা, মহম্মদ রেজাকে ১০০০ টাকা, ফগউদ্দৌলাকে ৫০০ টাকা, মীর্জা জাফরকে ৫০০ টাকা। ও আখতার মহল, আমি দয়া দেখিয়েছি যে তাঁকে দিয়েছি ৩০,০০০ টাকা, মালকা-ই-জুল্‌ফকে ৩০,০০০ টাকা, কাইসারকে ১১,০০০ টাকা, খুজিস্তা মহলকে ১০০০ টাকা। আমি জেলখানায় ৪০০০ টাকা খরচ করেছি। খয়রাতের বাবদ ৬৩০ টাকা। চাকরদের মাস মাহিনা ১০,০০০ টাকা। আমার হাতে একলক্ষ টাকার সোনা আছে। আর আশা করি সেটাও খরচ করব।...

ওঃ খোদা, আমায় সুখ দাও আর রাগ দিও না আমার বন্ধুদের। ওঃ খোদা, আমাকে এই কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে দাও আর আমায় শক্তি দাও বিপদের মুখোমুখী দাঁড়াবার। আমার চিন্তায় মুক্তার আলো দাও আর এই সব মুক্তো যেন একটি সুতোয় থাকে। লোকে যেন ফির্‌দৌসির কবিতার স্বাদ ভুলে যায় আমার কবিতা পড়ে। আমি যেন নষ্ট করে দিতে পারি খাকামির (বিখ্যাত ইরাণী কবি) বাগিচা। আমি যেন জামালিকে ধ্বংস করে দিয়ে ওস্তাদি বনতে পারি। (আমার কবিতা পড়ে) আর কেউ পড়বে না জালালি, হেজালী, জামি, সাদি, নিজামী, আনওয়ারী, জহুরী, শমস, তবরিজ, হাফেজ, হাজী (ফার্সী কবিরা) ; লক্ষ্ণৌর নাসিখ্‌ আতীশ।

এসব কি নির্বোধের মতন বকছ। এঁরা উচ্চস্তরের কবি আর আমি নীচু দরের। তাঁরা হলেন মুকুট আর আমি তাঁদের পায়ের ধুলো। তাঁরা ওস্তাদ, আমি চাকর।

যে একটিমাত্র জিনিস আল্লার কাছে আমার চাইবার আছে তা হল এই গারদ থেকে মুক্তি।'

শেষ পরিচ্ছেদে ঈশ্বরকে সম্বোধন করে নবাব লিখেছেন—

'ও খোদা, আমার বন্ধু পরিচিতেরা যেন আমার সঙ্গে মিলতে পারে। আমাকে সেই পরীদের দেখতে দাও। আমায় দয়া করো, আমার প্রার্থনা পূরণ করো, তোমার ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে তুমি আমাকে এখান থেকে মুক্ত করে দেবে। তুমি এ জগতের সৃষ্টিকর্তা, তুমি দেখবে এই জীবদের দুঃখ বেদনা। প্রত্যেকে তোমার সাহায্যের জন্যে আশা করে। রঙ দিয়েছ পৃথিবীকে, খাবার দিয়েছ পাখীদের। তুমি দয়া আর করুণা ছাড়া কিছু নও। তুমি আমাদের দীর্ঘজীবন দিতে পারো। তুমি ভিখারীদের বসাতে পারো সিংহাসনে। ফকিরকে প্রাচুর্য দিতে পারো। রাজাকে করতে পারো ফকীর। ভিখারীকে ধনী করে দিতে পারো। তোমার হুকুমে জগতের উৎপত্তি হয়েছে। সব হজরৎ, ইমাম এবং নবী তোমার তাবেদার।

অপদার্থ আখতারের এই আর্জি নাকচ করে দিও না। সে বিনা কসুরে কয়েদ-খানায় পড়ে আছে আর কাঁদছে দিনরাত। তার কোন অপরাধ নেই। সে চোরও নয়। খুনে, ঠগ্ কি গরীবের ওপর অত্যাচারী, কিছুই নয়। সে পকেটমার, কি গুণ্ডা, কি মেয়েমানুষ চুরি করা, কি মাতাল, কি জুয়াড়ি, এসব কিছুই নয়।

আমার বিরুদ্ধে কারুর কোন অভিযোগ নেই। তুমি এ সমস্তই জানো। কারণ তুমি সর্বজ্ঞ। ও খোদা, আমার ওপর সদয় হও। মহম্মদ, আলী, ফাতিমা, হাসান, হুসেনের নামে, সৈয়দ উস্ সাজেদাইনের জন্যে, বাকর, জাফর, ইমাম, রেজার খাতিরে মুসা কাজিম, মহম্মদ তকী, আলী তকী, আসকরি আর মেহেদীর দোহাই—আখতারকে ছাড়া পাইয়ে দাও।

আমায় মুক্ত করো পূর্ণ মর্যাদা আর সম্মানের সঙ্গে—তোমার জীবদের প্রতি তোমার অনেক দয়া।

ও আখতার, এই কাহিনী এবার শেষ করো।

ও খোদা, হিন্দুস্থানের সবাই যেন সুখে থাকে আর কমবয়সীদের যেন উন্নতি ঘটে।

এই কথা বলে আমি এই মসনবি সমাপ্ত করি—তোমাদের শান্তি হোক। তোমাদের শান্তি হোক।'

অবশেষে নবাবের বন্দীদশা কাটল। 'হুজন্'-ও সমাপ্ত করলেন সেই সময়। তখন জুলাই মাস। তারিখটা সম্ভবত ৯ই। ১৮৫৮ সাল। বেগম আখ্‌লীল মহলকে লেখা চিঠি থেকে মুক্তির দিনটি আন্দাজ করা যায়। তাহলে তিনি ফোর্টে কয়েদ থাকেন প্রায় দু'বছর। কারণ মুচিখোলায় প্রথম আসেন ১৮৫৬, মে ১৩ তারিখে। আর গ্রেফতার হন কিছুদিনের মধ্যেই। নবাবের কারাবাস শেষ হবার কিছু আগেই মহাবিদ্রোহের আগুন নিভে যায়। বিদ্রোহীদের একেবারে শায়েস্তা না করে নবাবকে মুক্তি দেয়নি অতি সতর্ক ইংরেজশক্তি।

তখন কুন্‌ওয়ার সিং মৃত্যুবরণ করেছেন (৯মে, ১৮৫৮) মৌলভী আহমদুল্লা পরের মাসে (৫ জুন) নিহত হন। তারপর ঝাঁসির রাণী প্রাণ দেন রণক্ষেত্রে (১৭ জুন)।

ওয়াজিদ আলীর বেগম হজরৎ মহল মাস দুয়েক আগে, মার্চ মাস নাগাদ, আশ্রয় নিয়েছেন নেপালে। সঙ্গে নাবালক পুত্র বির্জিস কাদ্‌র।

তাতিয়া টোপে আত্মগোপন করেছেন। (পরের বছর ১৮ই এপ্রিল তাতিয়ার ফাঁসি হয়, মান সিংহের বেইমানীতে ধরা পড়বার পর।) নানা সাহেবও সপরিবারে নেপালে অজ্ঞাতবাসী।

যে অযোধ্যা আর রোহিলখণ্ডে বিদ্রোহ সবচেয়ে সফল হয়েছিল, সেখানে তখন শ্মশানের শান্ত অবস্থা।

ওয়াজিদ আলীর তুল্য অক্ষমকে আর কয়েদ রাখবার দরকার কি?

বিদ্রোহ দমন করে বৃটিশের অযোধ্যা গ্রাস নিরঙ্কুশ হল। নবাবকে '৫৬-তে নির্বাসিত করেই তা সম্পন্ন হয় বটে। কিন্তু লর্ড ডালহাউসির কল্পনার অতীত ছিল '৫৭র বিস্ফোরণ। জুনের মাঝামাঝি থেকে অবধে বৃটিশ শাসন কর্পূরের মতন উপে যায়। সারা রাজ্যে একটি কেন্দ্রেও ইংরেজ সরকারের কোন প্রতিনিধি সেপাইদের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকদের এমন বিদ্রোহে যোগ দেওয়া আর বিশেষ কোথাও দেখা যায়নি। কারণ ইংরেজদের অবধ দখলের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সকল শ্রেণী। তা ছাড়া, অন্যায়, বেআইনীভাবে অযোধ্যা অধিকার করা হয়। সেই ক্ষোভ ধূমায়িত ছিল সকলের মনে। বিদ্রোহী সিপাহিরা পথ দেখাতেই বৃটিশ বিদ্বেষ ফেটে পড়েছিল। এত বড় বিপদের হাত থেকেও নিস্তার পেয়ে গেল বৃটিশ সাম্রাজ্য। বিদ্রোহীদের সুসংহত, উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে। পরিকল্পনা-হীন যুদ্ধ পরিচালনার জন্য। একতা বর্জিত হওয়ার ফলে। ভারতীয়দের এই ত্রিদোষ সাগর পারের বিদেশীদের জয়লাভের কারণ। আর—ইংরেজদের দুর্বার জাতীয় ঐক্য ও মরণপণ, সুপরিকল্পিত সংগ্রাম।

কথা উঠলে, আজকের ভারতবাসীর মনে প্রশ্ন জাগে—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বশক্তি আর রাসবিহারী, যতীন মুখুজ্যের সংগঠনী ক্ষমতা যদি তখন থাকত, ওই সিপাহীরাই কি সুসংবদ্ধ হয়ে মুষ্টিমেয় ইংরেজদের কবর দিতে পারত না ভারতের মাটিতে?

সে সম্ভাবনা নিশ্চিহ্ন হতে, ওয়াজিদ আলী কলকাতার ফোর্ট থেকে মুক্তি পেলেন।

এতদিন পরে তার স্থায়ী বাস শুরু হল মেটিয়াবুরুজে। দীর্ঘদিন অদর্শনের পর পরিবারবর্গের সঙ্গে দিন যাপন করতে লাগলেন। লক্ষ্ণৌ নবাবের এখন পরিচয় হল—মেটিয়াবুরুজের নবাব!

কিন্তু এত বড় পালা বদলের পর ওয়াজিদ আলী মনে প্রাণে সেই অওধের নবাব। সেই লক্ষ্ণৌয়ি খানদান। আসফুদ্দৌলা-নাসীরুদ্দিন-আমজাদ আলীর বংশধর। বেগম আর বাইজী, ইলাহী খানাপিনা, লোকলস্কর খিদমদ্‌গার বহর, মঞ্জিল আর চিড়িয়াখানা, নাচ গান বাজনায় দরবার তাঁর চাই।

লক্ষ্ণৌ গেছে, কি করা যাবে। মেটিয়াবুরুজকেই ছোটী লখ্‌নৌ বানাতে হবে এবার। এখানে ত দিন কাটবে নবাব ওয়াজিদ আলীর। মেটিয়াবুরুজ নবাবের কলিজায় সেই অওধের নবাব। যখন ছিলেন লক্ষ্ণৌ তোশাখানার মালিক, তখনকারই মতন হালচাল এই ভাঙা হাটেও।

হিন্দুস্থানের নানা নামী কলাকারদের আনালেন। ওস্তাদ গাওয়াইয়া বাজনদার বাইজী সব চেয়ে বেশি এলেন লক্ষ্ণৌ থেকেই। নাচে গানে বাজনায় মেটিয়াবুরুজের কাসরুল বায়েজা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

সে দরবারের পরিচয় দেওয়া হবে আরেকটা অধ্যায়ে। নবাবের প্রেমপত্র ধারার পরে। এখন মেটিয়াবুরুজ নবাবের আরো কিছু কথা।

এখানে তাঁর বাস শুরু হতেই আত্মীয় পরিজন লক্ষ্ণৌ থেকে আরো অনেকেই চলে আসতে থাকেন। কিছু কিছু আমীর আর রইস লোকও। পোষণের আশায় নানা পেশার মানুষ জন।

নতুনদের জায়গা দিতে মেটিয়াবুরুজের নবাবী এলাকা ক্রমেই বাড়তে লাগল। নবাবের নিজের প্রথম দুটি তিনটি বাড়ি থেকে আরো হল কয়েকটি, নতুন পুরানো নিয়ে। কিন্তু লক্ষ্ণৌর কোন প্রাসাদের মতন নয় তার একটাও, একথা বলা বাহুল্য। তবে প্রত্যেক বাড়ির নাম রাখা হল গাল ভরা। আগে ছিল শুধু 'সুলতান খানা' আর 'আজাদ মঞ্জিল'। পরে—'কাসরুল বায়েজা', 'শাহানশাহ্ মঞ্জিল', নুর মঞ্জিল', 'মুরসসা মঞ্জিল', 'শাহ্ মঞ্জিল', তকরীহ বখশ্' ইত্যাদি।

(পুরানো লখনউ, পৃঃ ৭৪—আব্দুল হলিম্ শরর)।

আর সব খিদ্মদ্গার চৌকিদার মকান্দার পাহারাদার আর নবাব পেশার লোক-জনের জন্যে ক'টা মহল্লাও গড়ে উঠল। ওস্তাদি গাওয়াইয়া বাজনদারদের জন্যে ওস্তাদ-পাড়া। এখানে সেখানে মুর্গি-ডাকা বস্তি দোকান বাজার কসাইখানা। সব মিলিয়ে ঘিঞ্জি হতে লাগল মেটিয়াবুরুজ। আগেকার বাগান বাড়ি ভরা চেহারা তা বদলে যেতে লাগল। আগে ছিল বেশিরভাগ সাহেব পাড়া। উচ্চ রাজকর্মচারীদের সুদৃশ্য পরিচ্ছন্ন নিরিবিলি অঞ্চল। এখন লক্ষ্ণৌ থেকে আসা আর খিদিরপুর কলকাতারও মুসলমান মেহনতী মানুষ রকমারি পেশা নিয়ে বসবাস করতে লাগল। ইংরেজ সিভিলিয়ানরা আর বসবাস করতে চাইলেন না, বিশেষ অবসর নেবার পর। বাড়ি বিক্রি করে দিতে লাগলেন, অনেক সময়েই সস্তা দামে। নতুন নতুন বাসিন্দা এল। বসতি বনতে লাগল অন্য ধাঁচের।

মেটিয়াবুরুজের আকার প্রকার অন্য রকম দাঁড়াল। কাঁচা ঘর আস্তানায় খানিকটা নোংরা যেমন, আরেকদিকে তেমনি চলে এল লক্ষ্ণৌ সংস্কৃতির একাংশ। গোটা মেটিয়াবুরুজ এলাকায় লক্ষ্ণৌয়ি তমদ্দুন ছড়িয়ে পড়ল। লক্ষ্ণৌর গাইয়ে বাজিয়ে আর বাইজীদের সঙ্গে হাজির হলেন কবিরা, মুশায়রা নিয়ে। মুচিখোলায় তাঁদের দস্তুরমত আসর বসতে লাগল। তেমনি মহররমের তাজিয়া জুলুশ্ আর জাঁকজমক।

অবার লক্ষ্ণৌর কিছু কিছু আদব কায়দা বোলচালও আমদানি হল এখানে। আর সেই সঙ্গে সুগন্ধী আতর। চিকন মখমল্ পাঞ্জাবী পিরাণ থেকে ঢাউস ঢাউস ফানুষ, হরেক রকম ঘুঁড়ি। তা ছাড়া, মুর্গির লড়াই, পায়রার ঝাঁক ওড়ানো পর্যন্ত। আবার বিস্তর দফার মোগলাই খানার রান্না বান্না। আর আদব কায়দা সহবত কদরদান।

নবাবী-কোঠীকে কেন্দ্র করে এসব চলন। মেটিয়াবুরুজের রইস জন থেকে নানা

লোকের ঘরে।

ওয়াজিদ আলী একটি চিড়িয়াখানাও পত্তন করলেন। চিতা বাঘ আর হরিণ বাঁদর সাপ কচ্ছপ আর রকমারি মাছ সেখানে। নানা রকম জন্তু জানোয়ার খাঁচায়। 'এদের সংগ্রহের জন্যে তিনি বেপরোয়া অর্থব্যয়ও করেছিলেন। কেউ কোন নতুন পাখি বা পশু আনলে, যে দাম চাইত পেয়ে যেত। শোনা যায়, একজোড়া শাদা ময়ূর এগারো হাজার টাকায় কিনেছিলেন। আফ্রিকার জিরাফও ছিল দুটো। কোহাণের দুটো বাগদাদী উটও।'

(পুরানো লখনউ, পৃঃ ৭৬-৭৭)।

সেই সঙ্গে তাঁর নতুন নবাবী পর্যন্ত শুরু হয়ে গেল। তার একদিকে সঙ্গীতের আম দরবার। অন্য দিকে খাস ভোগ বিলাস। ইলাহী বাবুর্চিখানা আর হরেক রকম চীজ।

রাজসংস্করণ লক্ষ্ণৌর একটি নকলদারি। আউধ নবাব এখন মুচিখোলায় নবাব।

সরকারী বৃত্তি কিন্তু বছরে বার লাখ্। মাস মাস লাখ্ টাকায় কি এত কাণ্ড পোষায়? হারেম বাইজী ওস্তাদ দরবার মহফিল্ থেকে পায়রাবাজ খানসামা বাবুর্চি খিদ্‌মদ্‌গার চৌকিদার মুহুরি উকীল হাকীম। খাই খিলাই। চিড়িয়াখানা। আর মত্‌বা-ই-সুলতানি-নবাবের ছাপাখানা। সেখান থেকে নবাবের লেখা সব কেতাব ছাপানো। আর ইয়ার দরবারী আত্মীয় স্বজনদের বিলোনো। না বছরে বারো লাখে এত কাণ্ড হয়না।

লক্ষ্ণৌ থেকে সঙ্গে আনা ছিল—হীরে মুক্তো মাণিকের দওলৎ—দশ পুরুষ নবাবীয়ানার ঝড়তি পড়তি সোনা চাঁদি। নইলে বান্‌চাল্ হয়ে যেত মুচিখোলার এই ময়ূরপঙ্খীও!

'মেটিয়াবুরুজের বাদশাহ্ প্রথম প্রথম বুজে-সুজে, হুঁসিয়ারির সঙ্গে জীবন নির্বাহ করতেন বলে শোনা যায়। তাই দেখে প্রতিবেশীরা কয়েকটি বাদ্য দিল। দ্রুত চরিতার্থ হল, 'যে ঢুল্‌ছে তাকে শুধু ঠেলা দেওয়ার অপেক্ষা' প্রবচনটি। জমে উঠল আনন্দ লহরী।...

লখ্‌নউয়ে যেমন শোনা যায়, তেমনি এখানেও সুন্দরী রমণীদের সমাবেশ এবং প্রেম-প্রণয়-লীলায় মেতে যাওয়ার সেই শখ্ পুনর্জাগ্রত হল। তবে মেটিয়াবুরুজের সৌখীন লীলাবিলাসে ছিল কিছু ধর্মীয় সতর্কতা। বাদশাহ ছিলেন শিয়া। শিয়া ধর্মে অবাধ 'মুতয়া' বিহিত। এই ধর্মীয় স্বাধীনতার সাহায্যে বাদশাহ প্রাণ ভরে শখ্ মিটিয়ে নিতে লাগলেন। আরেকটি নিয়ম ছিল ঃ যার সঙ্গে 'মুতয়া'* হয়নি, এমন স্ত্রীলোকের মুখ দেখা পাপ। অতএব, যে যুবতী ভিশ্‌তিনী অন্দর মহলে জল নিয়ে আসত, তাকে 'মুতয়া' করলেন।

খেতাব দিলেন 'নবাব আবরসা বেগম।' হজুরাণীর কাছে আসা-যাওয়া ছিল যুবতী ঝাড়ুদারনীর ; তাকেও মুত আশুদা' বেগমদের শাবিল করে নবাব মুসফ্‌কা বেগম' খেতাবে ভুষিতা করলেন। এইভাবে, গানের শখও সীমিত ছিল 'মুত

---

* একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্ধারিত বিবাহ-বন্ধনের নাম।

আশুদা বেগম পর্যন্ত। বাদশাহ বাজারের কোন বেশ্যার মুজরা দেখেছেন, এটা কদাচিৎ সম্ভব ছিল। 'মুত আশুদা বেগম'দের নিয়েই তিনি দল গড়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তাদের নাচ গান শিক্ষা দেওয়া হত। রাধা মনজিলওয়ালী, ঝুমুরওয়ালী, লটকনওয়ালী, শারদা মনজিলওয়ালী, নথওয়ালী, ঘুংঘুটওয়ালী, রাসওয়ালী, নকলওয়ালী'—এই রকম প্রায় কুড়িটা দল। নাচে গানে এরা ছিল পটিয়সী। অনুরঞ্জিত করে রাখত বাদশাহ হৃদয়কে। এদের সঙ্গে তাঁর 'মুতআ' হয়েছিল; এদের বলা হত 'বেগম।' 'মুতআ' হয়নি, এমন কয়েকটি অল্পবয়সী নাবালিকাও ছিল দু একটা দলে। এরা যখন সাবালিকা হবে, তখন 'মুতআ' হবে—এইরকম ব্যবস্থা ছিল। এইসব বেগমদের অধিকাংশই থাকত খোদ বাদশার কাছাকারি, খাস 'সুলতান খানা'য়। কয়েকজন থাকত অন্য বাড়িতে, স্বতন্ত্র অন্তঃপুরে। এদের মধ্যে যাদের সন্তান হত তাদের 'মহল' খেতাব দেওয়া হত; থাকবার জন্যে আলাদা মহল এবং বেতন ও ইজ্জত নির্দিষ্ট হত।' (পুরানো লখনউ, পৃঃ ৭২-৭৩)।

মেটিয়াবুরুজের নবাব এইভাবে দিন গুজরাণ করতে লাগলেন ১৮৫৮-র শেষ থেকে।

(বেগম আকলীল্ মহলকে লেখা পত্রাবলী)

বেগম বিলাসী ওয়াজিদ আলী শাহ্। লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসনের সময় তাঁর বেগমদের সংখ্যা কত? অন্তত একশ'র কম নয়। কারণ তাঁর পরীখানা'র শেষ অধ্যায়ে তিনি স্বয়ং জানিয়েছিলেন যে, শত পরীকে বেগম করে নেওয়া হল! আর তার পরেও ত সাত আট বছর নবাবী করেছিলেন লক্ষ্ণৌতে। বেগম বিষয়ে নবাবের উদারতা সর্বজনবিদিত। আবদুল হলীম 'শরর' ও তার কিছু বিবরণ দিয়েছেন। নবাব বেগমদের সংখ্যায় আরো শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে অবধে রাজত্বকালে। কিন্তু যখন তিনি লক্ষ্ণৌ থেকে বিদায় নেন তখন তাঁর সঙ্গিনী থাকেন কজন? সঠিক জানবার উপায় নেই বটে। তবে, সম্ভবত দশের অনধিক। অন্তত নবাবের মেটিয়াবুরুজ বাসের প্রথম

দিকে, অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়মে বন্দী হবার আগে তাঁর বেগম ছিলেন জনা দশেক। কারণ ফোর্টে রচিত তাঁর 'আখতারের বেদনা'য় ওইরকম সংখ্যায় বেগমদের নাম পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

অর্থাৎ নির্বাসিত হয়ে চলে আসবার সময় বিপুল সংখ্যক বেগমকে নবাব রেখে দেন লক্ষ্ণৌতে। সকলকে কলকাতায় সঙ্গিনী করে আনবার নানা বাস্তব অন্তরায় থাকতে পারে। প্রথমত, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। দ্বিতীয়ত, মেটিয়াবুরুজে ইলাহী বেগম মহলের অভাব। তৃতীয়ত, আর্থিক সমস্যাও জাগতে পারে। তাছাড়া ইংলণ্ডে দরবার সফল হবে, পুনরায় ফিরে আসবেন লক্ষ্ণৌর নবাব জীবনে, এমন দুরাশাও পোষণ করতে পারেন নবাব।

কিংবা হয়ত সর্বনাশ সমুপস্থিত দেখে তিনি প্রাজ্ঞ হয়ে ওঠেন। অর্ধেকেরও বেশি ত্যাগ করে আসেন বিগত রাজধানীতে।

যে কারণেই হোক, লক্ষ্ণৌতে ওয়াজিদ আলীর অনেক বেগম থেকে যান। সেকথা জানা যায় বিদ্রোহের ঘটনাবলী থেকে। বেগম হজরৎ মহলের কথাও এখানে বলা চলে। সেই বিদ্রোহের পর্যায়ে অবধের সিপাহীরা ইংরেজ শাসন চূর্ণ করে আবেদন জানিয়েছিল বেগমদের কাছে। নবাবের প্রতিভূ হয়ে তাঁদের কেউ যেন দাঁড়ান বিদ্রোহের পুরোভাগে। তাঁকে সামনে রেখে বিদ্রোহীরা নবাব পক্ষে লড়াই চালাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে।

সেই অগ্নিপর্বে নবাবের লক্ষ্ণৌ নিবাসিনী প্রত্যেক বিশিষ্টা বেগমকে সিপাহীরা এইভাবে দরবার করেছিল। কিন্তু আর কেউ সম্মতা বা সাহসী হননি বিদ্রোহীদের অনুরোধ রাখতে। কেবল বেগম হজরৎ মহল এগিয়ে এসেছিলেন। দশ বছরের পুত্র বির্জিস কাদ্‌রকে রীতিমত অভিষেক করে বসিয়েছিলেন আউধের রাজ-সিংহাসনে। নাবালক নবাবের অভিভাবিকা হয়ে হজরৎ মহল প্রায় এক বছর বিদ্রোহে জড়িত থাকেন। যথেষ্ট সাহস আর বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় দেন বেগম হজরৎ মহল। তাঁর 'ঘোষনা'রও (proclamation) রাজনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল।

তার মধ্যে ইংরেজ চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে অতি মুন্সিয়ানার সঙ্গে। অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, হজরৎ মহলের রাজনীতিক পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। মনে হয়, প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং সাহসই অবস্থার উপযুক্ত করেছিল বেগমকে। বিদ্রোহের সেই চূড়ান্ত পর্বে অনভিজ্ঞা নবাব মহিলার পক্ষে যতখানি সম্ভব তা তিনি করেছিলেন। আর বিদ্রোহ বিফল হলে বন্দীত্বও এড়িয়ে যান হজরৎ মহল। রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে নেপালে পুত্রের সঙ্গে বাস করতে থাকেন। পুত্রের জন্যে ইংরেজ সরকারের বৃত্তিও নেন বেগম। কারণ তার ফলে বির্জিসের দাবিও স্বীকৃত হল। তেজস্বিনী হজরৎ মহল আর ফিরে আসেননি আউধে কিংবা ভারতে। নেপাল রাজ্যেই তার মৃত্যু হয়। বির্জিস ফিরেছিলেন কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর পরে। ওয়াজিদ আলীরও মৃত্যুর ছ বছর পরে, বির্জিস কাদ্‌র চলে আসেন কলকাতায়। ইংরেজ সরকারের ক্ষমা পেয়ে তিনি ভারতে ফেরেন। তখন মৃত নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে মীর্জা কমর কাদ্‌র ইংরেজের বৃত্তি ভোগ করছিলেন সব চেয়ে বেশি। বির্জিস কাদ্‌র সেই বৃত্তি নিজের জন্যে দাবি করলেন। কারণ, তাঁর বক্তব্য হল,

PATHAGAR

বাদশাহ্‌র সব পুত্রর চেয়ে তাঁরই অধিকার ও প্রতিষ্ঠা বেশি। এজন্যে দরবার করতে বির্জিস ইংলণ্ডে যাবার তোড়জোর করছিলেন। এমন সময় তাঁকে ভোজের নিমন্ত্রণ জানালেন এক আত্মীয়। সেখানে আহারের পর বাড়ি ফিরেই বির্জিস প্রাণ হারান। শোনা যায়, খাবারের সঙ্গে তাঁকে বিষ দেওয়া হয় সেই আত্মীয় গৃহে।

যা হোক, নবাবের সেই লক্ষ্ণৌ বাসিনী বেগম হজরৎ মহল ইতিহাসখ্যাতা হয়ে আছেন বিদ্রোহের অধ্যায়ে। সিপাহী বিদ্রোহের শত বর্ষ-পূর্তির সময় তাঁর মর্মর মূর্তিও লক্ষ্ণৌতে স্থাপিত হয়েছে।

অথচ, প্রথম জীবনে হজরৎ মহল ছিলেন নবাবের এক 'পরী'। তাঁর নাম তখন মাহক পরী। ওয়াজিদ আলীর 'তারিখ-এ পরীখানা'য়ও মাহক পরীর নাম করা আছে।

হজরৎ মহলের মতন আরো অনেক বেগম লক্ষ্ণৌ নিবাসিনী থাকেন, নবাবের মেটিয়াবুরুজ জীবনে। তেমনি একজন হলেন মুমতাজ জাহাঁ আকলীল্‌ মহল! তাঁকেই লেখা নবাবের প্রেম পত্রাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত। বেগম আকলীল্‌ মহল অবশ্য রাষ্ট্র ব্যাপারে জড়িতা হননি। তবে স্মরণীয়া হয়ে আছেন নবাবের এই পত্রগুচ্ছের জন্যে।

হজরৎ মহল আর আকলীল্‌ মহল ভিন্ন আর যাঁরা লক্ষ্ণৌতে থেকে যান তাঁদের নাম জানা যায়নি। কিন্তু তাঁরা যে সংখ্যায় যথেষ্ট তা বোঝা যায় বিদ্রোহের কোন কোন বিবরণে। পরে তাঁদের মধ্যে কেউ মেটিয়াবুরুজে এসেছিলেন কিনা জানবার উপায় নেই। নবাবের এই নির্বাসিত জীবনে বেগমদের আবার আধিক্য ঘটতে পারে, তবে, তা আবদুল হলীম 'শরর' বিবৃত দরাজ 'মুত আশুদা' বিবাহের ফলেও সম্ভব।

নবাব যে সকল দয়িতাকে কলকাতায় সহযাত্রিণী করেননি, তা প্রেমের অভাবে নয়। এ বিষয়ে নবাবের ছিল সমদৃষ্টি। 'আখতারের বেদনা'তেও তিনি সেকথা প্রকাশ করেছেন। আকলীল্‌ মহলকে লেখা পত্রধারাও তার নিদর্শন।

লক্ষ্ণৌ বেগমদের বেশির ভাগই মেটিয়াবুরুজে আসেননি কিংবা আসতে চাননি, কে জানে। হয়ত নির্বাসিত নবাবের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের আর জড়িত রাখবার ইচ্ছা হয়নি কোন কোন বেগমের। নবাবও অনেককে নানা কারণে কলকাতায় আনতে পারেননি।

লক্ষ্ণৌ থেকে বিদায়ের সময় নবাবের সঙ্গিনী বেগম নির্বাচন কিভাবে হয়? যাঁরা সেখানে থেকে যান তাঁরা যে দুয়ো রাণী আর যাঁরা কলকাতায় আসেন তাঁরা সুয়ো রাণী—তা নয়। মেটিয়াবুরুজবাসিনী প্রত্যেক বেগমের রূপ গুণের সঙ্গে স্বভাব আর নবাবের প্রতি মনোভাবও তিনি বর্ণনা করেছেন 'আখ্‌তারের বেদনা'য়। তার মধ্যে সুরের অনুরণন যেমন আছে, তেমনি বেসুরও। মাধুর্যের সঙ্গে তিক্ততাও।

আবার আকলীল্‌ মহলের তুল্য প্রিয়তমাও লক্ষ্ণৌতে রয়ে গেছেন। তাঁকে লেখা নবাবের চিঠিগুলি হৃদয়ের আবেগে উচ্ছ্বাসে ভরপুর। নবাব এই দূরের প্রিয়ার প্রতি গভীর প্রেম আর বিরহের যন্ত্রনা প্রকাশ করেছেন পত্রের ছত্রে ছত্রে। আকলীল মহলের অনিন্দ্য সৌন্দর্যের তীব্র আকর্ষণের কথাও তিনি গোপন রাখেননি।

অন্তরের তপ্ত অনুরাগে সিঞ্চিত নবাবের প্রেমপত্রগুচ্ছ। চিঠির পাঠকদের বিস্ময় জাগে, এমন বেগমকে তিনি সঙ্গিনী করেননি কেন? পরেও মেটিয়াবুরুজে কেন আনীতা হননি আকলীল্ মহল!

কিংবা—পত্রাবলীতে প্রকট প্রনয় কি আন্তরিক, না লক্ষ্ণৌ কাব্য-রীতি সুলভ বাক্ বাহুল্য-প্রীতি? পত্রাধরা পাঠকদের মনে হবে, আকলীল্ মহল নবাবের অদ্বিতীয় প্রিয়তমা। অথচ একই কালে আরো পাঁচ ছ জন তাঁর বেগম মেটিয়াবুরুজে অবস্থান করেছেন যাঁদের প্রতি মুগ্ধ প্রাণ মনের উচ্ছ্বাস নবাব জানিয়েছেন 'আখতারের বেদনা'য়! কে বুঝবে শাহী মুহব্বতের রীত্!

সে যা-ই হোক, আকলীল্ মহলকে লেখা নবাবের চিঠিগুলিও 'আখতারের বেদনা'র সমকালীন। নবাবের এই 'হুজুন্' রচনার শুরু ফোর্ট উইলিয়মে, শেষও সেখানে। অর্থাৎ দু বছরের মধ্যে তিনি এই আত্মকাহিনী লেখেন। কিন্তু বেগম আকলীল মহলকে লেখা তাঁর পত্রধারার রচনাকাল, তিন বছর দু মাস। এই সময়ে নবাব ২০ খানি চিঠি এই লক্ষ্ণৌ নিবাসিনী বেগমকে লিখেছিলেন। অর্থাৎ গড়ে দু মাসের মধ্যে একখানি করে চিঠি। তার মধ্যে আবার দু বছর পত্র বিরতি। সুতরাং গড়পড়তা আরো বেশি। আউধের প্রায় এক বছরের বিদ্রোহ পর্বও তার মাঝখানে ছিল। সেকালের ডাক ব্যবস্থার মন্থর গতিও ধর্তব্য। অতএব নবাবকে তৎপরই বলতে হয় বেগমকে চিঠি লেখার ব্যাপারে।

নবাবের প্রথম পত্রের তারিখ ৯ জুলাই, ১৮৫৬। আর শেষ চিঠিখানি লেখেন ১৮৫৯ সালের ৫ ই সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ ফোর্ট থেকে মুক্তি পাবার এক বছরেরও বেশি পরে। বিদ্রোহ শেষ হয়ে গেছে, হজরৎ মহল স-পুত্র নেপালে পলায়ন করেছেন তার দেড় বছর আগে।

'আখতারের বেদনা' নবাবের ব্যক্তিজীবনের কথা হলেও বাইরের কিছু প্রসঙ্গ তার মধ্যে আছে। কিন্তু আকলীল্ মহলকে লেখা পত্রাবলী তাঁর নিতান্তই ব্যক্তিগত। নবাবের এক প্রেমিক সত্তার প্রকাশ এখানে। তাঁর কবি-স্বভাবেরও পরিচায়ক। ভাষায়, আন্তরিকতায় কয়েকখানি চিঠি হয়েছে রীতিমত সাহিত্যগুণ সম্পন্ন। নবাব রচিত তিনটি গজল, যেমন রচনা শক্তিতে তেমনি গভীর অনুভব আর দরদেও প্রাণবন্ত।

পত্রধারার কালানুক্রমিক অনুবাদ দেওয়ার আগে আর ক'টি সংশ্লিষ্ট কথা আছে।

আকলীল্ মহল নবাবেরই আপন বংশীয়া। তাঁর আরেক নাম জিন্নৎ মহল। নবাবের সঙ্গে বিবাহে বেগমের একটি পুত্র হয়—করা হোসেন।

আকলীল্ মহলকে নবাব যে বিশটি চিঠি দেন তার প্রায় সবই মেটিয়াবুরুজ থেকে লেখা। ফোর্ট উইলিয়মে লিখিত পত্র অতি অল্প। সমস্ত চিঠিই উর্দুতে রচনা। মহম্মদ বাকর নামে এক ব্যক্তি এগুলি সংকলন করেছিলেন।

পত্রাবলীর মোট রচনাকাল তিন বছর দু মাস। কিন্তু তার মধ্যে চিঠি পাঠানো বন্ধ থাকে প্রায় দু বছর। এই বিরতির কারণ সম্ভবত, অবধের বিদ্রোহ এবং নবাবের ফোর্টে বন্দীত্ব। ১৯ সংখ্যক পত্রে নবাব নিজের মুক্তির কথা লেখেন। চিঠিখানির তারিখ ১৬ই জুলাই। মুক্ত হন তার সপ্তাখানেক আগে। ৯ই জুলাই (১৮৫৮) তাঁর কারাবাস শেষ হবার দিন বোধ হয়।

মহম্মদ বাকর সংকলিত নবাবের এই পত্রাবলী 'তারিখ-এ-মুমতাজ' (প্রিয়তমার বৃত্তান্ত) নামে পুস্তকে প্রকাশ পায়। মূল রচনা রক্ষিত আছে বৃটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে। সে পাণ্ডুলিপি ৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৭টি হিসাবে পঙক্তি। সুশোভন, অলংকৃতলিপি—লেখার চারদিকে সোনালি কারুকর্ম।

নবাবের অন্যান্য রচনার মতন 'তারিখ-এ-মুমতাজ'এর লিপিকার অন্য ব্যক্তি। অর্থাৎ নবাবের স্বহস্তে লেখা নয়। সুতরাং এই সব প্রেমপত্রের পূর্ণ গোপনীয়তা ছিলনা।

তা ছাড়া, চিঠিগুলি পাঠাতে হত ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্প্যানীর প্রতিনিধি মারফৎ। পাঠাবার বিশেষ অসুবিধা ছিল। আর সময়ও যেত অনেক। কিন্তু নবাব সেজন্যে নিরস্ত হতেন না।

লক্ষ্ণৌ থেকে মুমতাজ জাহাঁ আকলীল্ মহলও পাত্র দিতেন। নবাবের প্রথম চিঠিখানি বেগমের পত্রের উত্তরে লেখা। আবার অনেক সময় নবাব নিজে থেকেই তাঁকে লিখতেন। জবাব দিতেন বেগম।

আকলীল্ মহলের পত্র রচনারও কোন লিপিকার ছিলেন। নবাবের কোন কোন চিঠিতেই বোঝা যায় সেকথা। কখনো 'মুন্সি' নামে কথিত কেউ কিংবা অন্য কোন লেখক বেগমের পত্রাবলী লিখে দিয়েছেন। বেগমের চিঠির এই দ্বিতীয় লিপিকারকের লিখন কৌশলের প্রশংসাও করেছেন নবাব। অন্যের সাহায্যে প্রেমপত্র রচনাও স্বীকৃত নবাবী কেতা হতে পারে!

বেগমের পত্রগুচ্ছ মুন্সী আকবর আলী সংকলিত। মুন্সিজীর বিবৃতি অনুসারে আকলীল মহলের পূর্বপুরুষ ছিলেন ফয়জাবাদের নবাব। অর্থাৎ ওয়াজিদ আলী ও আকলীল মহল সমবংশীয়। নবাবের এমন প্রিয় বেগম হয়েও কেন যে তিনি কলকাতায় আসেননি, সে এক রহস্য। আরো এক আশ্চর্য, নবাবের শেষ পত্রে বিদায়ের সুর বিচ্ছেদের ইঙ্গিত; বেগমের সঙ্গে যেন নবাবের চিরদিনের জন্যে যোগাযোগ রহিত হয়ে গেল—এমন আভাস। তিন বছর তো ছিলেন চোখের আড়ালে। এবার বুঝি অন্তরের অন্তরালেও চলে গেলেন। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সম্পর্ক-চ্যুতির কথা ঘোষিত হয়েছে নিতান্তই আকস্মিকভাবে। শেষ পত্র পাঠককে হঠাৎ বিষম ধাক্কা লাগায়। পুনর্মিলনের জন্যে এমন আকুল কামনা প্রকাশের এই পরিণতির জন্যে পাঠকের মন প্রস্তুত থাকে না।

কিন্তু তার কোন কারণ প্রকাশ পায়নি।···

এখন ক্রম অনুযায়ী নবাবের পত্রাবলীর বাংলা অনুবাদ দেওয়া হল— (চিঠি-গুলি দুটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে, দু বছরের বিরতির আগে ও পরে হিসাবে)—

প্রথম পর্যায়ঃ

(প্রথম পত্র—জবাবী)

আফসরে ফরকে জলীল্ মুমতাজ জাহাঁ নবাব আকলীল্ মহল—

তুমি আমার প্রিয়াদের মুকুটমণি। তোমার বিরহের তৃষ্ণায় প্রাণ যখন জ্বলছে, এমন সময় তোমার চিঠিখানি পাই। আমার স্বস্তিবিহীন মনে সেটি যেন বারি সিঞ্চন

করল।……আমার শরীর ভাল আছে।……এই দুঃসময়ে তুমি কেমন ভাবে তোমার দিনগুলি কাটাচ্ছ ?

সেই সব দিনের কথা আমি ভুলতে পারিনা, যখন তুমি সিকান্দার বাগে থাকতে আর আমি আমার গাড়িতে যেতাম সেখানে। সেই আমরা এখানে-সেখানে কত বিচরণ করেছি। ওরা নাচত, গান গাইত। আমরা রাত্রে বিশ্রাম করতাম বাগিচার মঞ্চে। ঢাক বাজত। শোনা যেত সানাইয়ের সুর—

সে সবই এখন দিনরাত আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই সমস্ত কথা যখন ভাবি, মনকে তখন দাবিয়ে রাখি আমি। পৃথিবীর মাটি কঠিন আর আকাশ সুন্দর। আমি আশমানেও চলে যেতে পারিনা। মাটি থেকেও পাইনা সান্ত্বনা।

এই যে সব ঘটনা ঘটে গেল, আমি তার জন্যে দায়ী নই। যারা আমার মহল ধ্বংস করেছে আর এখন আমার রাজ্য শাসন করছে, ঈশ্বর তাদের ধ্বংস করবেন। তাদের বন্ধু আর পরামর্শদাতাদেরও নিপাত করবেন তিনি।

এ পর্যন্ত ভাগ্য বরাবরই আমার প্রতি বিরূপ। আমার জীবন যেন একটা ঘন জঙ্গল। সামনে কালো কালো পাহাড়—কোন আশ্রয়ের স্থান নেই।

খোদার দয়ায় অবশেষে আমরা কলকাতায় পেঁছেচি। শত্রুরা সব সময় আমার সঙ্গে ছায়ার মতন রয়েছে। দুষ্কৃতি করবার কোন সুযোগ পেলেই ছাড়েনা তারা।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো তিনি যেন আমার শেষ দিনগুলি শান্তিময় করেন।

তোমার মুখ আর চোখ দুটি কখনোই ভুলিনি। কিন্তু এইসব সংবাদ-বাহকদের সব সময় পাওয়া যায় না এখানে। তাই খবর পাঠানো আমার পক্ষে বড় শক্ত হয়। যখনই সেরকম কোন লোক পাই আমি তাকে হাত জোড় করে অনুরোধ জানাই। আর এমনিভাবেই আমি দু'একখানি চিঠি পাঠাই।

ভগবান যে আমায় রাজা করেছিলেন সেজন্যে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু এখানে আমি ক্রীতদাসের তুল্য জীবন কাটাচ্ছি। যখনই আমি তোমাদের মতন কারো চিঠি পাই, বিশেষ করে তোমার কাছ থেকে কোন চিঠি—আমি চিঠিখানা বুকে জড়িয়ে ধরি, চোখের ওপর রাখি, চুম্বন করি। আমার চুম্বনের জন্যে কথাগুলি মুছে যায় কাগজের ওপর থেকে। কিন্তু সে চিঠির জবাব যতক্ষণনা দিতে পারি, আমি তৃপ্তি পাইনা।

এস আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি. তিনি যেন অচিরে আবার আমাদের মিলিয়ে দেন আর যে দুঃখকষ্ট আমরা ভোগ করছি তার লাঘব করেন।

ও আমার প্রাণ! দুর্ভাবনা কোরোনা। দোহাই তোমার, আর কেঁদো না। আর চোখের জলে তোমার মুখ ভাসিও না। খোদা আমাদের এই দুঃখ দিয়েছেন, তাই তা যে-কোন-প্রকারে সহ্য করা আমাদের উচিত। আমার দৃষ্টান্ত ধরো। বরাবর আমি আফসোস করেছি। কিন্তু আফসোস করে ত কিছু লাভ করিনি। ঈশ্বর যদি সহায় হন, আমরা এইসব বিপদের হাত থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। এই অত্যাচারী লোকেরা—এরা ভগবানকে ভয় করেনা। এরা কি পাচ্ছে আমার ওপর জুলুম করে, আমায় উত্যক্ত করে ?

আমরা এই আশা যেন করি যে খোদা আমাদের জন্যে কিছু করবেন। জুলুম-

বাজদের হাত থেকে অসহায় মানুষদের বাঁচাবার শক্তি তাঁর আছে। আর শুধু তোমার আমার কথাই বা কি? সারা শহরটাই অত্যাচারীদের কবলে পড়েছে।

আর কতদিন এই দুঃখের রাত চলবে, কতদিন দুনিয়া থাকবে আমাদের বিরুদ্ধে? আশার ঊষা কি দেখা দেবেনা? বিচারের রশ্মি সূর্য হয়ে উঠবে আর কতকাল পরে? মেঘের ওপর এই দুর্ভাগ্যের জাল কতদিন পাতা থাকবে? আর কতদিন এই নকল জগৎ টিঁকে থাকবে আর দুনিয়া তার কৃত্রিম প্রদর্শনী দেখাবে?

আমি অন্তরের সঙ্গে অপছন্দ করি এদের—এই বারাঙ্গনা আর দাগাবাজদের। এইসব দুনিয়াদারি আমার মন বরদাস্ত করেনা। একে আলিঙ্গন করতে গেলেই এ জানাবে অনিচ্ছা। আর যেই এর দিকে বিমুখ হবে অমনি এসে পায়ে পড়বে। এমনি এর ছলাকলা। কথায় বলে—দুনিয়া বড় তাজ্জব জিনিষ দেখাচ্ছে, পেট থেকে পা বেরুচ্ছে! কিন্তু কি হবে?…

৯ই জুলাই ১৮৫৬ খৃঃ — জানে আলম্ লিখিত

৫ জিবদ, ১২৭২ হিজরি

(দ্বিতীয় পত্র)

আকলীল্ বেগমের প্রতি জানে আলম্

রব্বে জলীল নবাব আকলীল্ মহল সাহেবা—

আমার মনের সমস্ত বিশ্বাস নিয়ে আমি এই কামনা করি যে, ঈশ্বর যেন অবিলম্বে আমাদের পুনর্মিলন ঘটান আর বাগানে প্রেমের খসবু আবার ছড়িয়ে পড়ে।

আমি তোমায় একখানি প্রেম-পত্র লিখেছি এবং আমি আশা করি তুমি হয়ত তা পেয়েছ। ঈশ্বর প্রাজ্ঞ।

কলকাতার এই মরুভূমিতে আমি প্রিয়জনদের বিচ্ছেদের আগুনে জ্বলে যাচ্ছি। আমার হৃদয়ে বিরহের ক্ষত দিরহামের (আরবী স্বর্ণমুদ্রা) মতন বড় হয়ে উঠেছে। ভাগ্যের এ কি বিচিত্র ব্যাপার যে, আমায় সে শেষ করে দিয়েছে আর তবু আমি বেঁচে আছি।

মীর হাসান (প্রসিদ্ধ উর্দু কবি। তাঁর মসনবী উর্দু সাহিত্যের একটি ক্লাসিক) বলেন, 'আশমান আমায় এত সুখ তো দেয়নি যে তার বদলে এত অশ্রু দেব।'

বরাতের ওপর আমাদের খুব ভরসা ছিল, তার বন্ধুত্বের ওপর আশা ছিল। কিন্তু অকারণেই সে এমন ভোঁতা যে দুটি মানুষের মিলন বা হৃদ্যতা সহ্য করতে পারেনা। যখনই সে দেখে দুজন মিলিত হয়েছে, অমনি বাধা দেয়। দেখা যাক, ভাগ্য কত দূর যায়—আমরা চূর্ণ করব তাকে।

আমি এই অবস্থায় এসে গেছি যে রোদন ও ক্রন্দন ছাড়া আমার আর কাজ নেই। আর আমি সর্বদা তোমায় স্মরণ করি। এ কি দুঃখ, ও দুনিয়ার জান্—কি সুখের দিনই সেসব ছিল যখন তুমি ছিলে বাতি আর আমি পতঙ্গ।

খোদা এই দিনগুলিও কাটিয়ে দেবেন। জীবনের বেশির ভাগটাই আমাদের কেটে গেছে, কমের ভাগটাও কাটবে। কিন্তু চাঁদকে নিয়ে যে শান্তি তার বিচ্ছেদে আমার বড় অনিচ্ছা। তাই এই (ফার্সী) কবিতার পঙ্‌ক্তি দুটি আমার মুখে মুখে থাকে—

ও বাতাস, তুমি আমার প্রিয়ার কাছে যাচ্ছ, তাকে আমার এই বার্তাটি দিও, তুমি আমাকে দুঃখ বেদনার অসহ্য বোঝা (পাহাড় আর জঙ্গলের চেয়েও বেশি) দিয়েছ।

এখন আমার অবস্থা সেই উর্দু কবিতাটির মতন—

অনেকে রাত কাটায় তাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে। আর অনেকের রাত কেটে যায় চোখের জলে, কারণ তারা থাকে প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক দূরে। হায় আল্লাহ্, আমার জন্যে এ কোন্ রাত্রি ? আমি না পারি ঘুমোতে, না পারি কাঁদতে।

তোমার নিজের বিষয়ে সবিস্তারে আমায় জানিও, তাহলে আমার তৃষিত মন তৃপ্ত হয়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমায় তুমি ভুলে যাওনি আর আমিও তোমাকে একই-ভাবে মনে রেখেছি। যদি আরো দিন এমনি বেদনায় বয়ে যায় তাহলে বিচ্ছেদ আর আমাকে বিশ্রাম করতে দেবে কেন ? বিশ্রাম আমি পাবনা।

তারিখ ২২, জুলাই, ১৮৫৬ খৃঃ। জানে আলম্ লিখিত।

(তৃতীয় পত্র)

সুলতান জাহাঁ নবাব আকলীল্ মহল সাহেবা—

তুমি জেনে রেখো যে, তোমার সঙ্গে আবার সুখময় মিলনের জন্যে আমি বড়ই উৎসুক। আর তোমার সঙ্গ উপভোগ করবার আমার হাজারো সখ্ আছে।

তোমায় জানাই যে, তোমার প্রেমপত্রখানি জানে আলমের উচ্চাশাভরা মনের মহলে এসে পেঁছেচে। আর সেই চিঠি একটি তাঁবু তৈরি করে নিয়েছে আমার হৃদয়ে। আমি তোমায় কামনা করেছিলাম, পেয়েছি। এটি যেন আমার শরীরে এক নতুন জীবনের আর খাঁটি, স্বচ্ছ, মার্জিত আত্মার হাওয়া বইয়ে দিয়েছে। তোমার চিঠিখানি দেখে আমার চোখ ভরে উঠেছে, মন পরিতৃপ্ত হয়েছে।

তুমি আমায় যে তাবিজটি পাঠিয়েছ সেটি হাতে পরছি আমাদের পুরানো প্রথা অনুসারে।

খোদা ও ইমামের দয়ায় আর আমার মনের সমস্ত বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা করি আল্লাহ্ যেন আমায় লক্ষ্ণৌর সিংহাসন ফিরে পাইয়ে দেন। হাত এই তাবিজ পরা যেন সফল হয় আমার। যেন প্রত্যেক দিনটি হয় ঈদ আর প্রতিটি রাত হয়ে ওঠে বরাত, সবে বরাত।

স্বদেশ থেকে দূরে আছে যে

তারিখ ৮, আগষ্ট, ১৮৫৬ খৃঃ জানে আলম তার লিখিত।

(চতুর্থ পত্র)

আকলীল্ মহল হল সূর্যের মহল, যা আলোয় ভরা। কেন নয় ? তাই হবার কথা। কারণ সে যে বড় মুক্তো—আকলীল্ মহল।

মিলনের রাত্রিতে সে আমার সঙ্গিনী, প্রিয়তমা। আমার বঁধু, আমার দরদী আকলীল্ মহল।

সূর্যের ফুল ঈর্ষা করে তার শরীরের গড়নকে। কারণ সে যে আশ্মানের সূর্য —আকলীল্ মহল।

সে আমার প্রিয়া, আমার প্রাণ। চাঁদের মতন তার মুখখানি। সুন্দর তার তনুলতা। আর দুনিয়ার সব সুন্দরীদের হিংসা তার ওপর। কারণ সে লক্ষ্ণৌর সেরা সুন্দরী—আকলীল্ মহল।

সর্বদা সে সুখদায়িনী সঙ্গে জড়িতা রাখে। সে রূপের প্রতিষ্ঠাত্রী, নেত্রী—আকলীল্ মহল।

তার দীঘল চেহারার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রেমিকদের প্রাণ বার করে দেয়। আর সে ঠিক যেন প্রেমিকদের ফাঁসিকাঠ—আকলীল্ মহল।

সে তার প্রেমিকের মুখ স্মরণ করে যখন চোখের জল ফেলে তখন প্রেমের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ে। আকলীল্ মহল।

প্রেম এই জগতে একটা ব্যাধি আর আকলীল্ মহলের চোখ দুটি নার্গিস (একটি সংস্কার আছে যে নার্গিস ফুল যেন রুগ্ন চোখ) ফুলের মতন। আকলীল্ মহল।

সে জ্বালিয়ে দেয় শত্রুদের বাসা। কারণ সে বিদ্যুৎ আর আগুন—আকলীল্ মহল।

সুরার দোকানের দাম দুনিয়ায় বাড়ে না কেন? কারণ তার চোখ দুটি যেন সুরার দোকান—আকলীল্ মহল।

আমি সব সময় তাতে দেখি আমার মক্কা আর কাবা। আখতার দুর্বল, কিন্তু সে প্রাণপূর্ণা—আকলীল্ মহল।

তোমার প্রতি আমায় প্রেম ও নিষ্ঠার জন্যে এই গজলটি রচনা করেছি আর তোমার আনন্দের জন্যে এটি পাঠাচ্ছি। খোদা যেন শীঘ্র আমাদের আবার মিলিয়ে দেন আর বিচ্ছেদের এইসব কঠোর দিনগুলি যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

আমার মন দুশ্চিন্তায় ভরে রয়েছে। আর আত্মসংযম, আত্মবিশ্বাসের সমস্ত গুণ হারিয়ে ফেলেছি আমি। প্রার্থনা করি, সে যেন তার সেই আগেকার সঙ্গ আর হাসি আর সব জিনিস ফিরে পায়।

রাজ্য-হারা
২৭, জিল্হজ, ১২৭২। জানে আলম্।

(পঞ্চম পত্র)

তোমার ধরণধারণ রূপের নিঃসার, ও মুমতাজ জাহাঁ। আর তোমার কণ্ঠস্বর যেন সুরা-পাত্রের ধ্বনি—মুমতাজ জাঁহা।

ও পরী, তোমার আঁখি পক্ষের (যেন তীরের মতন অসহ) আক্রমণ কে সহ্য করতে পারে—মুমতাজ জাহাঁ।

তোমার ঠমকে লোক খুন হয়ে গেছে—মুমতাজ জাহাঁ।

যখন থেকে আমার মন তোমার চিঠি আর কথা জেনেছে, আমার হৃদয় মুমতাজ জাহাঁর কণ্ঠস্বর কান হয়ে শুনেছে—মুমতাজ জাহাঁ!

সে আমার বঁধু, সে আমারই। আর অনেক, অনেক দিন থেকে সে জানে আমার সব কিছু গোপন—মুমতাজ জাহাঁ।

সে দুই জগতেরই গর্ব, বন্ধুর বিশ্বাসের পাত্রী আর পিয়ারীদের মধ্যে নির্বাচিতা

—মুমতাজ জাহাঁ।

নারীদের এই সব আলাদা ব্যবহার ইত্যাদির কথা তোমায় বলি। তুমি এসবে শেষ কথা—মুমতাজ জাহাঁ।

আল্লার কিরে এই সব বিচ্ছেদ আর যাত্রায় আমি দুঃখে নিমগ্ন হয়েছি আর তোমা জন্যে জীবন দিয়ে দিতে পারে এমন লোক এখন বিপন্ন—মুমতাজ জাহাঁ।

প্রতি দিন প্রতি রাত আমি তোমার গাল দুটি দেখবার কামনা করি আর মুমতা জাহাঁর ধরণধারণ কেমন করে ভুলে থাকা যায়—মুমতাজ জাহাঁ।

আমি সদাই দুয়ারে কান পেতে আছি। প্রেমের স্বরে আমায় ডাকো—ও মুমতা জাহাঁ।

তোমার কাছে আমি কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারিনা, কারণ তুমি আমার সমস্ত জানো, সব গোপন কথা—মুমতাজ জাহাঁ।

আমার হৃদয় মরে যাচ্ছে তোমার মুখের জন্যে, তোমার সর্বাঙ্গের জন্যে। আ যে প্রেমিক সব কিছু ভুলে গেছে সেও তোমাকে ভালবাসার জন্যে গর্বিত—মুমতা জাহাঁ।

আমি তোমার সেই সব রীত্ ভুলতে পারিনা, লাখ বছর কেটে গেলেও—না কারণ আখ্তারের নিজের একটা ধরণ আছে মুহব্বতের—মুমতাজ জাহাঁ।

আমার মনের অবস্থার আর তোমার প্রতি প্রেমের পরিচয় দিয়ে এই গজলটি রচন করেছি। কেউ আমার মানসিক অবস্থা আন্দাজ করতে পারবেনা, যার সব সম্প ধ্বংস হয়ে গেছে, লুঠ হয়ে গেছে।

প্রিয়জনদের থেকে দূরে আছে যে প্রেমিক, তুমি তার বিশ্বাসের স্থল। ঈশ্ব সাক্ষ্য—আমার প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে এক বছরের মতন করে আর কি যন্ত্রণা আ অস্বস্তি ভোগ করছি বিচ্ছেদের জন্যে। তুমি একবার আমার জীবনের সেই সব সু আর আরাম আর আড়ম্বরের কথা ভেবে দেখো। আর এখন ভাগ্যের ফেরে আ বর্ধমান রাজার কোঠিতে আছি যা শত্রুদের পক্ষে গারদখানার চেয়ে কম্তি নয়—আ কঠোর দিনগুলি কাটাচ্ছি। মনের কি ঘটবে? আমি আর লিখতে পারিনা।

৫, মহর্‌রম্ ১২৭৩। জানে আলম্।

(ষষ্ঠ পত্র)

হুরিদের সব আচরণ তার মধ্যে আছে আর সে ঝক্‌মক্ করছে আয়নার মতন—জয়নাব্ বেগম।

আমি তোমায় ভালবাসি, তুমিও আমায় ভালবাসো, ওগো ফুল। এস, আমর পরস্পর ভালবাসার শপথ নিই—জয়নাব্ বেগম।

সুখ, বিলাস আর আরামের হেতু সে। ভাল ব্যবহার তার আয়ত্তে আছে আ সে আমার প্রাণ—জয়নাব্ বেগম।

কেন তোমায় আকলীল্ মহল বল্‌বেনা বৃদ্ধ আর যুবকরা—রাজকীর মর্যাদ তোমার, তুমি মুকুটধারিণী জয়নাব্ বেগম।

তোমার মুখখানি আমি কখনো ভুলতে পারিনা আর আমি সর্বদা তোমাকে

স্মরণ করি—ও জয়নাব্ বেগম।

যেদিন থেকে তোমার কুঞ্চিত কেশদাম আমি দেখতে পাইনি, সেদিন থেকে আমার সমগ্র সত্বা বিস্রস্ত হয়ে আছে—জয়নাব্ বেগম।

ঈশ্বর, আমাদের অবিলম্বে মিলিত করুন, বিচ্ছেদের জন্যে আমার হৃদয় কাতর হয়ে আছে—জয়নাব্ বেগম।

যখন থেকে তোমার মধুর মুখটি আমার চোখের আড়াল হয়েছে তখন থেকে তা আয়নার মতন স্থির হয়ে গেছে—জয়নাব্ বেগম।

কাকে আমার সিক্ত চোখ জিজ্ঞাসা করবে?

আমার সাথী শুধু আশ্মান। কিন্তু সে তো আমার নাগালের বাইরে। সুতরাং কেমন করে আমার অশ্রু মুছবো—জয়নাব্ বেগম।

এ জগতের গুল্চিরা (যারা পুষ্প চয়ন করে) কেন গুলদারে (বাগান) বন্দী হবেনা—বুল্বুল্ যে জয়নাব্ বেগম।

তোমার উরু যেন সূর্যমুখ—চিকণ, সুগৌর। তোমার জঙ্ঘা দুটি দেখে চাঁদেরও তোমার প্রতি অসূয়া—ও জয়নাব্ বেগম।

যখনি কোন শুষ্ক পত্র তোমার চোখে পড়ে, তুমি বলো, 'এই—আখ্তারকে চেনা যাচ্ছে।' জয়নাব্ বেগম।

আকলীল্ মহল নবাব জয়নাব্ বেগম যেন জানে যে, জানে আলম্ তার শরীর আত্মার সঙ্গ কামনা করে। আমি এই গজলটি রচনা করেছি তোমার বিরহের ভারে, তোমার পুরানো জয়নাব্ নামে ডেকে। তুমি এটি পড়বে ও গাইবে।

এখানে সব ভাল আর আমি আশা করি তুমি খবর ও চিঠি পাঠাবে।

২৮, মহর্রম, ১২৭৩। স্বাক্ষর সিকান্দর জাঁ আখ্তার।

(সপ্তম পত্র)

কি চমৎকার তার সব ব্যবহার। আমাকে জ্বালাতন করবার নতুন নতুন উপায় সে সর্বদা বার করে। প্রেমের কর্ত্রী সে—জয়নাব্ বেগম।

কি চিকন তার গাল দুটি। হুরির মতন, পরীর মতন, চাঁদের মতন তাকে দেখতে—জয়নাব্ বেগম।

ওগো জয়নাব্ বেগম, তুমি আমায় অনেক দিয়েছ। তুমি আমায় ভুল্ ভুলাইয়ায় ঘুরতে বাধ্য করিয়েছ। তোমার কোঁকড়া চুলের রাশি কত ঘুরিয়েছে আমায়। আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি তোমার কাছে বিচার চাই—জয়নাব্ বেগম।

অন্যেরা তোমায় ঘিরে ফেলেছে আর আমি নিজে ছিটকে পড়েছি অনেক দূরে। আমাকে স্মরণ করবার কি সময় আছে তোমার? জয়নাব্ বেগম।

আমি সদাই গুণ গাই, তুমি দয়া করে আমায় কষ্ট দিও না। আমার ওপর কৃপা করো। আমার হৃদয় ভেঙ্গে গেছে—জয়নাব্ বেগম।

তার গাল যেন রাঙা আগুন আর লাল ফুল ঈর্ষা করে তাকে। সম্সাদ (গাছ খুব দীর্ঘ হয়) হিংসা করে যে দীর্ঘাঙ্গিনীকে—জয়নাব্ বেগম।

তোমার মনের মহলে দিন রাত হাজির থাকে অনেক সুন্দর মুখ। তোমার

হৃদয় তাদের নিয়ে ভরা—জয়নাব্ বেগম।

আমার প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তোমায় দেখ্লে। ওগো এ জগতের আত্মা, তুমি আমার প্রাণ, আমার পরী—জয়নাব্ বেগম।

তুমি সব সময় তোমার চুলের জাল ছুঁড়ে দাও আর তিলের বীজ দিয়ে বন্দী করো প্রেমের বুল্‌বুলিকে। তুমি একটি শিকারী—ওগো জয়নাব্ বেগম।

তোমার চিত্তবিনোদনের জন্যে রচনা করেছি এই নতুন গজলটি আর এইটি আমার প্রেমের চিহ্ন—ওগো জয়নাব্ বেগম।

এ তো তার চুল নয়—ধোঁকা। আসলে এসব তাঁর কাঁধের ওপর জাল। শিকারী যে জয়নাব্ বেগম।

ও আখ্তার, তুমি দুর্বল, দরিদ্র হয়ে গেছ। আর বেশী বল্তে বাধ্য কোরোনা আমায়। জয়নাব্ বেগম রূপের মহল, যা খোদা তাকে দিয়েছেন—জয়নাব্ বেগম।

মুম্তাজ জাহাঁ আকলীল মহলের যেন জানা থাকে যে, জানে আলম্ আগে দুটি কবিতা পাঠিয়েছেন। ঈশ্বর জানেন সে দুটি তোমার কাছে পেঁছেচে কিনা। আমি তোমার কোন প্রাপ্তি-স্বীকার পাইনি।

তোমার পুরানো খেতাব জয়নাব্ বেগম নামে এই তৃতীয় গজলটি আমি লিখেছি। আশা করি তিনটিই পাবার খবর তুমি দেবে। যদি তা না পেয়ে থাকো, অনুগ্রহ করে জানিও।

২৬, মহর্‌রম্, ১২৭৩। স্বাঃ গরীব আখ্তার।

(অষ্টম পত্র)

নবাব আকলীল মহল সাহেবা—

ভালো থাকো। আমি তোমার চিঠি চার তারিখে পেয়েছি। কাপ্তান কুন্‌সুদ্-দৌলা বাহাদুর আমার হাতে সেটি দিয়েছেন।

তাতে তুমি লিখেছ যে, তুমি একটি ইমাম জামিন (পুরুষরা বাইরে যাবার সময় ওপর হাতে টাকা বেঁধে রাখে। সংস্কার এই যে, ইমাম্ তাকে দেখবেন) পাঠিয়েছ। তোমার কথা মতন আমি খামে খুঁজে সেটি পাইনি। ঈশ্বর কৃপায় এখানে সব ভাল। জনাবে আলীয়া (নবাব-জননী) লণ্ডনে পেঁছেচেন। কিন্তু তাঁদের কোন পত্র পাইনি।

আশা করি তুমি এমনি মধুর সব চিঠি পাঠিয়ে আমায় আনন্দ দেবে।

৪ঠা সফর। স্বাঃ সুল্তান-এ আলম্।

(নবম পত্র)

আনন্দের ভাণ্ডার, সুখের কারণ, জীবনের পুলক, যৌবন-বাগিচার ফল, দুপুরের সূর্য, প্রেমের চাঁদ, সপ্রতিভ বুদ্ধিমতী, যে নানা হাবভাব দেখায়, রূপালী যার তনু, যে দিল্ আরাম, যার শরীর ফুলের মতন পেলব—নবাব আকলীল্ মহল সাহেবা—

তোমার চিঠি পেয়েছি। আমার প্রাণকে তা খাদ্য দিয়েছে, শান্ত করেছে আমার কাতর মনকে। মুজাহেদ্ উদ্দৌলা ১৫ই সফরে এই পত্র আমায় দিয়েছেন।

আমার হৃদয় তৃপ্ত হয়েছে। আমি সুখী হয়েছি তোমার বৃত্তান্ত জেনে।

আমাদের এই বিচ্ছেদে আমার মন খারাপ হয়ে আছে।

তোমার চিঠিতে সর্তের কথা দেখেছি। এখন আমার কথা শোনো। আমার কল্পনা লাল্‌চে মুখের দিকে। আমি কোন কথা বলতে ভুলে গেছি সেই মুখের কথা মনে করে। সব বিলাস আর আরাম এখন গল্প কথা হয়ে গেছে। আমার সদাই দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ঘুমোতে পারিনা রাতে। যারা আমার দিকে দেখে, তারা কাঁদে। চোখের জলে তাদের মুখ ভেসে যায়। তোমার সঙ্গে আমার মিলনের ইচ্ছা প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে আর চুম্বনের কামনার তো প্রশ্নই নেই। তোমাকে চুম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করা আমার ক্ষমতার বাইরে।

যখনই তোমার কোন ঘটনা, কোন কথা, তোমার কোন কিছু মনে পড়ে, আমি কাঁদি আর আমার সব জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আশ্‌মানের দিকে তাকিয়ে আমি বলি —ও নিষ্ঠুর, কখন তুমি তারার (আখতারের) সঙ্গে চাঁদের (বেগমের) মিলন ঘটাবে, কবে তুমি দেখাবে তার দীপ্ত মুখখানি, কখন এই প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে আলিঙ্গন করবে আর কবে শেষ হবে এই বিচ্ছেদ বেদনার দিন ?

তখন আকাশ বলে—তোমার দীন অবস্থা আর হতাশ মনের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে আর তোমার ওপর দয়া।

নিকট ভবিষ্যতে তোমার আর আমার পক্ষে ঘটনা ভালোর দিকে ঘুরবে।

মিলনের জন্যে উন্মুখ,

১৫ই সফর, ১২৭৩। দুঃখার্ত ও বিপর্যস্ত

জানে আলম্

দ্বিতীয় পর্যায় (প্রায় দু'বছর পরে) ঃ

(প্রথম পত্র)

তুমি কল্যাণী—বাগানের ফুল আর প্রেম-বাগিচার ফল, ওগো তরুণী মুম্‌তাজ জাহাঁ নবাব আকলীল্ মহল সাহেবা—

যে দুর্ভোগ আর কষ্টের মধ্যে দিয়ে আমার দিন কেটেছে সেসব জানে আলম্ বর্ণনা করবেনা। কলকাতার এই কেল্লায় গত ১৮ মাস যাবৎ আছি আর আমার সঙ্গী আছে ১২ জন। আমি একলা থেকেছি আর কি যন্ত্রণা ভোগ করেছি। তোমার বিরহে আমার প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে আসত।

আমি নির্দোষ। তুমি দুর্ভাবনা কোরো না। আমি শীঘ্রই তোমার খরচের জন্যে টাকা পাঠাবার বন্দোবস্ত করছি এবং ৫০০ টাকা তুমি এখনি পাবে। অনুগ্রহ করে দেনাটা মিটিয়ে দাও আর বাকিটা সামলে নেব।

দয়া করে প্রেমপত্র পাঠিও আমায় আনন্দ দেবার জন্যে। কারণ, কথায় আছে, চিঠি হল সাক্ষাতের অর্ধেক।

তোমার নিজের শরীরের জন্যে চিকিৎসা করাতে ভুলো না। ১৪ই রবিশ্মান আমি তোমার একটি চিঠি পেয়েছি। তুমি যে আমায় মনে রেখেছ আমি তাতে আনন্দিত।

কথায় আছে, সকালে যে বেরিয়ে চলে যায় আর সন্ধ্যায় ঠিক ফিরে আসে তাকে

ভুলো বলা হয়না।

তুমি লিখেছ যে তুমি লক্ষ্ণৌতেও থাকতে চাওনা, কল্‌কাতাতেও না ; কিন্তু তুমি চাও আমি কেল্লায় তোমার সঙ্গে দেখা করি। ঈশ্বর তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন। তুমি মহৎ। মহিলাদের পক্ষে এই ভালো যে তারা তাদের স্বামীদের বিপদে সাহায্য করবে।

আমি ভারি পাহারার মধ্যে কয়েদখানায় রয়েছি। এমন কি চিড়িয়ারা পর্যন্ত ভিতরে আসতে পারেনা। সুতরাং আমি কেমন করে তোমায় এখানে আনব। গোপন রেখো। লাট সাহেব বাহাদুর আমায় ২ লক্ষ টাকা দিয়েছেন আর প্রতিশ্রুতি করেছেন যে আমার দরকার মতন আরো টাকা দেবেন সরকার।

তুমি এখন ওখানে বসে ইজ্জৎ ও আব্রুর সঙ্গে আমার মুক্তির জন্যে প্রার্থনা করো। খোদার ওপর সর্বদা খেয়াল রেখো। ভয় কোরো না। আমি তোমার প্রেমিক।

তোমার মাকে আমার শুভেচ্ছা জানিও। তাঁকে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিও।

তোমার আনন্দের জন্যে আমি একটা নতুন গজল লিখেছি। যখন তোমার একঘেয়ে লাগবে এই গজল তুমি পড়ো আর আমাকে মনে কোরো।

এক হজরৎ তুর্‌ পর্‌ভি বাহ্‌রে রহ্‌ গ্যেয়ি,
এ্যায়সা কুছ্‌ দেখা কে আঁখো কো তমন্ন রহ্‌ গ্যেয়ি।

ইত্যাদি অর্থাৎ—মুসা তুর্‌ পাহাড়ে গেছেন। সেখানেও তাঁর একটি বাসনা ছিল যা পূর্ণ হয়নি। এমন কিছু দেখলেন যা এখন তাঁর চোখ আবার দেখতে চাইছে।

আয়নার দিকে যখন তুমি চাও তোমার প্রতিমূর্ত্তি সেখানে দেখো। আমি অবাক হয়েছি দুনিয়ার হাল্‌চাল্‌ দেখে।

ওগো ডাক্তার, (উর্দু কবিতায় প্রিয়াকে ডাক্তার সম্বোধনের রীতি আছে) তোমার লাল ঠোঁট দুখানি, আমাকে পরীক্ষা করো আর বলো আমার শক্তি ও ওজন বিচ্ছেদের সময় বেড়েছে না কমেছে।

আমার হৃদ্‌পিণ্ড লাফিয়ে উঠে স্থির হয়ে গেল দুনিয়ার বাগিচাকে (প্রিয়া) দেখে আর বুল্‌বুলের ঠোঁটে তার তারিফে ঝুলে রইল।

কি সে আলো যা দিল্‌কে উজ্জ্বল করে আর জায়গাটি স্মৃতি হয়ে থাকে সেই তুর্‌ ঘটনার (মুসার সামনে সেই পাহাড়ে খোদার আবির্ভাব হয়েছিল)।

বাগানে মালীই হয়েছে ধ্বংসের কারণ আর প্রতিটি কুঁড়ি শুকিয়ে গেছে আমার হৃদয়ের মতন।

মজনুর মতন আমি হৃদয়কে ফেলে এসেছি আমার প্রিয়ার রাস্তায় আর উট এগিয়ে গেছে আর লায়লা উটের পিঠে।

ও আমার পিয়ারী, যার চাঁদের মতন মুখখানি, সন্ধ্যার সময় তোমায় দেখতে আমার বাসনা। তুমি এস কোঠির ছাদে।

আমি তোমার সামনে নিজেকে খুন করে ফেল্‌ব যদি কোঁকড়ানো চুল থাকে তোমার মুখের ওপর।

তোমার ওই কুঞ্চিত কেশের শিকলে আমি বন্দী। যে মজ্‌লিসের বন্দোবস্ত করেছিলাম, সেখানে আমি যাইনি—সে মজলিস উপভোগ করিনি আমি।

সকালের গরম হাওয়ার মতন আমার নিঃশ্বাস আসা-যাওয়া করছে আর আমার প্রাণ হয়েছে বাতির নীচে রাখা কাপড়ের মতন (সদাই তাপ পাচ্ছে, আমার আত্মা জ্বলছে)।

ও চিড়িয়া, ভ্রূ-যুগলের তোরণের সামনে তুমি নত হও নি। এই কামনাটি তোমার হৃদয়ে অপূর্ণ রয়েছে।

সেই কণ্ঠস্বর শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে আমার কান এবং আমার চোখের অবস্থা এই যে সে দেখছে. চেয়ে আছে আর স্থির হয়ে রয়েছে।

আমার চোখ সদাই খোঁজ করছে আমার প্রিয়ার পানে চাইতে আর আমার মুখ চাইছে প্রেমের স্বাদ পেতে।

সংগ্রহ আর জমা করে তুমি কি লাভ করেছ, খোদার দোহাই, বলো। আখতার, বলো আমাকে, যে রূপ তারা রক্ষা করেছিল সে কোথায় গেল।

১৪ই রবিশানি, ১২৭৫। বেদনাহত জানে আলম্।

পুনশ্চ—লেফাফার ওপর এই ঠিকানা লিখো-

সম্পাদক, বৈদেশিক বিভাগ,
C% দফ্‌তরখানা এ মীর মুন্সী,
কৌন্সিল হাউস স্ট্রীট।

(দ্বিতীয় পত্র)

মুমতাজ জাহাঁ নবাব আকলীল্ মহল সাহেবা—

কর্নেল কনিয়াটুনকে দিয়ে ইতোমধ্যে তোমার খরচের জন্যে ৫০০ টাকা পাঠিয়েছি। আমাকে তোমার রসিদ পাঠিয়ে দিও আর তোমার নিজের বিষয়ে লিখো যাতে আমি সুখী হই।

১৯, রবিশানি, ১২৭৫। স্বাঃ অজধর রাজা

(তৃতীয় পত্র)

শকীল ও জমীল (মনোরমা ও সুন্দরী) মুমতাজ জাহাঁ নবাব আকলীল্ মহল সাহেবা, সালামৎ (সুখী হও)।

আমি একটি চিঠি পেয়েছি। এতে ৫০০ টাকার রসিদ আছে। আমি আবার ৫০০ টাকা পাঠিয়েছি অনুগ্রহ করে রসিদ পাঠিও। আরো ১৫০ টাকা তোমার মার জন্যে পাঠাতে অনুমতি দিয়েছি এবং মাসিক ৫০ টাকা হিসাবে। আমি ছ মাসের জন্যে মাহিনা বাবদ ৩০০ টাকা করে দিচ্ছি। কিন্তু পরের ছ মাস আমি কিছু দেবনা। হয় তুমি তাঁকে মাসে মাসে কিংবা একসঙ্গে দাও যা তুমি ভাল বোঝো, আর আমাকে রসিদ পাঠিও। তোমার খরচপত্রের দিকে নজর রেখো। বে হিসাবী খরচের দিকে সাবধান থেকো।

২৭, জামাদি উস্‌সানি, ১২৭৫। স্বাঃ জুলফুকারুদ্দৌলা বন্দগী
বরশদ্ জানে আলম্।

(চতুর্থ পত্র)

মুমতাজ জাহাঁ, তুমি আমার প্রেয়সীদের মুকুটমণি।
আকলীল মহল রাজার পিয়ারী ॥
তোমার মুখটি যেন এক কোরক, যেন একটি ফুল।
রাজা আখতারের বিবি তুমি ॥
তুমি লালা ফুল, অনিন্দ্য তোমার আচরণ।
তোমার ফুলেল তনু, মনোহারী চলন বলন ॥
এই যৌবন যেন অধিষ্ঠান করে তোমাতে,
যতদিন বয়ে যায় গঙ্গা যমুনার জল ॥
তুমি যেন সুখে থাকো।
যতদিন সূর্য থাকে সমুজ্জল ॥

আগে, তোমার মায়ের জন্যে ৪৫০ টাকা আমি পাঠিয়েছি[১] এই হিসাবে ঃ ১৫০ টাকা দিয়েছি নগদ আর ৬ মাসের জন্যে ৫০ টাকা মাস মাহিনায়, তার মানে ৩০০ টাকা আগাম। আর তোমার ব্যক্তিগত খরচের জন্যে ১৫০০ টাকা। মোট, এ পর্যন্ত, আমি তোমায় ২৯৫০ টাকা পাঠিয়েছি।* অনুগ্রহ করে রসিদ পাঠিও।

অনেক দিন অন্তর তুমি চিঠি পাঠাও। তোমার রূপের শ্রীবৃদ্ধি হোক।

সপ্তম রজব্ ১২৭৫। জানে আলম্।

পুনশ্চ—এই মাসের তিন তারিখে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। নবাব দিলদার বেগম সাহেবার মৃত্যু হয়েছে। তিনি আমায় একলা ফেলে চলে গেছেন।

(পঞ্চম পত্র)

মুমতাজ জাহাঁ আকলীল সাহেবা, সালামৎ।

তোমার প্রেমপত্রটি আমি ২২শে রজব তারিখে পেয়েছি। চিঠিখানি আমি আলিঙ্গন করেছি আমার বুকে। তুমি মিথ্যাবাদিনী। তুমি বলো যে চিঠি পাঠাচ্ছ। কিন্তু আমি মোট তিনটি মাত্র পেয়েছি, এইখানি সমেত। আর অন্যরা আমাকে ৩০ থেকে ৪০ খানি চিঠি দিয়েছে। আমি তাদেরও ওই সংখ্যক পত্র পাঠিয়েছি। তুমি আমায় তিনটি চিঠি দিয়েছ আর আমিও তিনখানি পাঠিয়েছি। তোমার চিঠি পেলে আমি প্রাণবন্ত হই।

তোমার মাকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।

২২শে রজব ১২৭৫। স্বাঃ জানে আলম্

(ষষ্ঠ পত্র)

ওগো মুমতাজ জাঁহা আকলীল মহল সাহেবা, সুখী হও। তোমার দুটি চিঠি আমি ৪ঠা শাওন পেয়েছি।

খোদার নামে শপথ করে আমি বলছি যে, এ পর্যন্ত আমি তোমায় তিন হাজার

১. পত্রাবলীর সম্পাদক এখানে মন্তব্য করেছেন যে, নবাবের ভুল হয়েছে—টাকার হিসাব হয় ১৯৫০ টাকা।

টাকারও বেশি পাঠিয়েছি। যদি তুমি না পেয়ে থাকো, সে দোষ আমার নয়। গত-কাল শুনেছি, লাট সাহেব বাহাদুর আমাকে যে ২ লাখ টাকা মঞ্জুর করেছেন তা এখানে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে আর কিছু বাকি নেই। আবার আমি জানিয়েছি। দেখা যাক ওঁরা কি বলেন। খবর যতক্ষণ না আসে, টাকা পাঠানো মুলতুবি থাকবে। আমি এজন্যে বড় লজ্জিত আছি আর সেই লজ্জায় চিঠি লিখতে পারিনা।

৫ই শাওন। স্বাঃ জানে আলম্।

(সপ্তম পত্র)

মুমতাজ জাহাঁ আকলীল্ মহল সাহেবা, আখতারের আত্মা—

তুমি আলীর হিফাজতে থাকো।

৬ই শাওন আমি একখানি চিঠি পেয়েছি।

ও আমার প্রাণ, ও আমার জীবন, ইংরেজ সরকারের কাছে যে ২ লাখ টাকা পাই তা তোমাদের সকলের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি। শপথ করে বলছি, আর কিছু বাকি নেই। এখন টাকার জন্যে দ্বিতীয় অনুরোধ সরকারের কাছে করা হয়েছে আর হাঁ বা না জবাব পাওয়া যাবে তা তোমায় জানানো হবে। আর এখন আমি লক্ষ্ণৌতে কোন টাকা পাঠাচ্ছি না। তিন হাজার টাকা আমি আগেই পাঠিয়েছি, তুমি যদি না পেয়ে থাকো তা আমার অপরাধ নয় আর এ ব্যাপারে আমি নাচার। এই বন্দী দশায় তোমার প্রার্থনা দিনে রাতে সব সময় আমার জিহ্বায় থাকে। সর্বদা আমি তোমার কথা ভাবি আর মুক্তোর মতন অশ্রু ঝরে পড়ে আমার চোখ থেকে।

তোমার জননীর দরখাস্ত আমি পেয়েছি। আমি লজ্জিত, কি তাঁকে আমি লিখ্‌ব।

৭ই শাওন ১২৭৫। স্বাঃ জানে আলম্।

(অষ্টম পত্র)

নবাব মুমতাজ জাহাঁ আকলীল্ মহল সাহেবা, সেলামৎ।

১৩ই শাওন আমি মীর ইবাদ আলী আর বুড়ো মুন্সীর লেখা দুটি চিঠি পেয়েছি।

ও আমার প্রাণ, আড়াই হাজার টাকা নাও আর ৪৫০ টাকা তোমার বাবা, মা, আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে তোমার নিজের ইচ্ছা মতন। টাকাটা আমি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। গতকাল আমি মাত্র ৫০০ টাকা পাওয়ার রসিদ পেয়েছি। বাকি টাকাটা অবিলম্বে হাচিন্‌সনের কাছারি থেকে সংগ্রহ করবে আর ওই টাকা থেকে তোমার বাবা ও মার তলব দিয়ে দেবে। এর চেয়ে বেশি আমি এখন আর খরচ করতে পারছি না। আমি এর মধ্যে জিল্‌হাইচ্ পর্যন্ত দিয়েছি আর এখন জিল্‌হাইচ্ পুরো হবার পর তোমার অনুরোধ করা উচিত।

১৩ শাওন ১২৭৫। স্বাঃ জানে আলম্।

(নবম পত্র)

বনা দে নূর কা পুত্‌লা খুদায়া মেরি মাট্টি কো,
বু তোঁকে বাস্তে পাথরকা করদে কল্‌ভ্‌ কো জী কো।

..... ইত্যাদি

অর্থাৎ—ও খোদা, আমার মাটিকে আলোর খেলনা করে নাও আর আমার প্রাণকে পিয়ারীদের জন্যে পাথর।

অকারণে তুমি তোমার বুক লুকিয়েছ।

আর ওই সব বুদ্বুদ দেখিয়ে দেয় হীরার তক্‌তি॥

ও আমার ভাগ্য, অত্যাচারী লোকেরাও চোখের জল ফেলে, আর যার মুখ মোমে তৈরি সে কেমন করে আলোকিত করে তার মুখ॥

আমি দীর্ঘশ্বাস মোচন করলে এই আবর্তমান আশ্‌মান মিলিয়ে যায় তৃণের মতন।

আমার নিঃশ্বাস পাথরের কাঠিন্যকে দেয় গলিয়ে॥

আমার প্রিয়ার পথের কুকুরকে২ কি দেব আমরা, কারণ আমি একেবারে জ্বলে গেছি হাড়ের মতন।

হয় কোন কুঁড়ি ফুল হয়ে ফোটে কিংবা এটি একটি চুম্বনের শব্দ। একটি কোরককে আমি জানি কারণ বাগিচার হৃদয় শুধু আমাকেই জানে॥

কোন মানুষ তার নিজের দোষ দেখতে পায়না এ দুনিয়ায়। ঈশ্বর প্রত্যেক মাছের মধ্যে দিয়েছেন একটি লুকানো কাঁটা॥

প্রেমিক প্রেমিকার যখন মিলন হবে তখন সেই শব্দে বুলবুল্‌ যাবে উড়ে॥

আর একবার সশব্দে চুম্বন করো আমার গালে॥

যখন আমি কাঁদি বাতাসের ঢেউ জল হয়ে যায়।

আর আমার ঝরা অশ্রু তৈরি করেছে এই নদীয়াপাথার॥

যদি তোমার নিজেকে কিংবা মুখটিকে উপাসনা করতে আরম্ভ করো তাহলেই তুমি হবে বিজয়িনী।

ওগো সবুজ রঙ্‌ (পিয়ারী), কালী দেবীকে ফুলের অঞ্জলি দিয়ে পূজা করতে যেওনা।

হয় তুমি প্রেমের জন্যে বাজি রাখো কিংবা প্রিয়ার স্বভাব যাক বদলে৩।

ওগো বিজুরি,৪ কেন এই মেঘ চড়েছে বাতাসের ওপর॥

আমার প্রিয়া যখন কথা বলে, দেখায় যেন হীরা, মুক্তা আর জরি বেরিয়ে আসছে।

কিন্তু এখন আমি দেখি প্রিয়ার মুখে আসে শুধু গালি॥

---

২. মজনু লায়লার কুকুরটিকে ঠিক যেমন ভালবাসত, তার ইঙ্গিত।

৩. উর্দু কবিতায় একটি রীতি প্রচলিত আছে যে প্রেমিকারা প্রেম জানায় না, উদাসীন বা নিরপেক্ষ থাকে।

৪. অর্থাৎ প্রিয়া।

ওগো পরীর মেয়ে, রূপের জন্যে কেন এত গরব—সে তো মরে যাবে দু'দিনেই।
(এই) অনিত্য সৌন্দর্যকে নিয়ে তুমি চলছ (লোকদের) শিকার করে॥
আমার মনের পাখি রাখা ছিল যে পিঞ্জরে,
তার শিকগুলি সূর্য চন্দ্রের রশ্মিতে তৈরি॥

ও আখতার, যে পদ্ধতি অনুসরণে তুমি এই গজলটি রচনা করেছ, এই ছন্দে রচনা করে তুমি বেশ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছ।

ও আমার প্রাণ, মুমতাজ জাহাঁ আকলীল্ মহল সাহেবা, আখতারের পিয়ারি, সুখী হও।

তুমি সৌজন্যভরা প্রিয়া, তুমি অনন্যা, প্রিয়া বাগানে বসন্ত, অতি স্পর্শকাতরা, খুসির সেরা, রঙ্গিনী, সুখদায়িণী, তুমি প্রেমে দাও উত্তেজনা, সব চেয়ে প্রদীপ্ত সূরয আর চাঁদ, নারীর সব গুণে গুণবতী, প্রিয়ার আকার তোমার, তোমার সর্বস্ব ভাল, তুমি আখতারের বঁধু—

তুমি জেনো যে আমার প্রেমের দশা আরো শোচনীয় হয়েছে। আর যখন থেকে আমি তোমার অবস্থার কথা শুনেছি, আমার রক্ত অশ্রু হয়ে গেছে। আমি রক্ত ঝরাব ভাবছি। আমার উদ্দীপনা আর হৃদয় তোমার আলোময়ী শরীরের একটি ছবি (ফটো) নিয়েছে আর এইভাবে আমি তোমার মুখের একটা প্রতিকৃতি পেয়েছি। চিত্রকর কিছু বদরঙ্ দেওয়ায় ছবিটা নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি অনুগ্রহ করে তোমার একটি সত্যিকারের প্রতিকৃতি আমায় পাঠিও, আমি তাহলে বাধিত হব আর সেই ছবিখানি প্রত্যেক দিনে রাতে দেখব। আমি তোমাকে সেজন্যে সম্মান ও অর্থ দেব। এই গজলটি আমি উদ্দীপনায় রচনা করেছি, কারণ তুমি গাথা গাইতে ভালবাস। সেজন্যেই আমি এত কষ্ট স্বীকার করেছি।

৮ই রমজান। জয়নাব্ বেগমের স্বামী।

(দশম পত্র)

মুমতাজ জাহাঁ নবাব আকলীল্ মহল সাহেবা,

আমি তোমার চিঠি ১৬ই রমজান পেয়েছি। তোমাকে আর তোমার মাকে যে টাকা আমি পাঠিয়েছি তার সব রসিদ পেয়েছি। এর চেয়ে বেশি আমি পাঠাইনি। তোমার মায়ের দরখাস্তও আমার কাছে এসেছে। খুব ব্যস্ত থাকার দরুণ আমি জবাব দিতে পারছি না। তুমি অনুগ্রহ করে তাঁকে মনে করিয়ে দিও আমার কথা। ও আমার প্রাণ, যে মুন্সী তোমার পত্রটি লিখেছেন তিনি অসাধারণ এবং একজন ভাল সুহৃদ হতে পারেন। তুমি তাঁকে তোমার চিঠিগুলি লিখতে বোলো আর যিনি সব সময় লেখেন আমি পছন্দ করিনা তাঁকে। তাঁর হাতের লেখা খারাপ আর তিনি রচনা করতে জানেন না।

১৭ই রমজান, ১২৭৫। স্বাঃ জানে আলম্।

(একাদশ পত্র)

মুমতাজ জাহাঁ নবাব আকলীল্ মহল সাহেবা, যে সব কিছু ভিতরের অর্থ বুঝতে

পারে আর যে রূপের মেয়ে—

তোমার কাছ থেকে আমি দুখানি চিঠি ২০শে রমজান পেয়েছি আর আমার আত্মীয় ও অন্যান্যদের অবস্থার কথা জানতে পেরেছি। তোমার ২৫০০ টাকার আর তোমার মায়ের ৪৫০ টাকার রসিদও আমার হাতে এসেছে। আমি মাত্র এই শর্তে তোমার মায়ের ভার নিতে পারি যে তিনি ৫০ টাকা মাসমাহিনা ও ১৫০ টাকা নজরানা পাবেন। তোমার অন্য আত্মীয়দের দায়িত্ব আমি নিতে পারব না আর এ সম্পর্কে আমায় অনুগ্রহ করে ভবিষ্যতে কিছু লিখো না। এই আমার স্পষ্ট জবাব। ওই হিসাবে আমি তোমার মায়ের তলব পাঠিয়ে দেব।

২১ শে রমজান, ১২৭৫। স্বাঃ জানে আলম্।

পুনশ্চ ঃ আমি ঈদল্ ফিতরের পোষাকের জন্যে আরো ১০০০ টাকা পাঠাচ্ছি। শেহাৎ উদ্দৌলা বাহাদুর ও মীর ওয়াজেদ আলীকে সাক্ষ্য রেখে টাকাটা নিও আর হাচিনসন সাহাবের কাছারি থেকে টাকা নেবে আর আমায় রসিদ পাঠাবে।

(দ্বাদশ পত্র)

তুমি জুলেখার[৫] তুল্য সুন্দরী, পরীর মতন তোমার ব্যবহার, ও আমার মুমতাজ জাহাঁ নবাব আকলীল্ মহল সাহেবা—সর্বদা সুখী হও, আরামে থাকো আর দুনিয়া ও আশমানের কোন কষ্ট যেন তোমার কাছে না আসতে পারে।

১৪ই সেওয়াল তারিখে আমি দুখানি পত্র পেয়েছি। একটি খুবই ছোট, যা পঁচিশে রমজান্ লেখা আর একখানি ২রা সওয়ালের সুদীর্ঘ চিঠি তা থেকে আমি তোমার প্রেমের অবস্থা আর অসুখ আর চিকিৎসার কথা জানতে পেরেছি। এসব নিয়ে আমি খুবই দুর্ভাবনায় আছি। সাবধানে থেকো। টক ও মিষ্টি জিনিষ খেওনা আর যদি তুমি আমায় ভালোবাসো, তাহলে তোমার ভাল চিকিৎসা করিও। আমার জন্যে যদি তোমার কোন দুশ্চিন্তা থাকে, খোদা তার সুরাহা করে দেবেন। ঈশ্বর যদি চান শীঘ্রই আমাদের মিলন হবে। এ জন্যেআমরা কেন দুশ্চিন্তা করব বা মাথা ঘামাবো।

ঈশ্বর বিলম্ব করেন না দয়া আর করুণা দেখাতে,
আর যে তাঁর সাহায্য পেতে চায় সে হয়না অসহায়।

আমি তোমাকে ৫০ কম ৩০০০ টাকা পাঠিয়েছি আর সব রসিদও পেয়েছি আর ঈদ বলে আরো ১০০০ টাকাও পাঠিয়েছি। কয়েদখানার অসুবিধা আর কষ্ট সব তেমনি আছে। আর আমি সমস্তই খরচ করে ফেলেছি। সেজন্যেই আমি খুব দুর্ভাবনাগ্রস্ত আছি। এখন রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে।

১৮ই সেওয়াল ১২৭৫ জানে আলম্।

(ত্রয়োদশ পত্র)

ওগো মিলন-বাগিচার তরু, সুখের গান-গাওয়া পাখি, মুমতাজ জাহাঁ নবাব

---

৫. মিশরের রাণী, অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী রূপসী।

আকলীল্ মহল সাহেবা, সুখী হও আর আড়ম্বরে থাকো। তোমার সঙ্গে পুনর্মিলন আমি কামনা করি। তোমার বিষণ্ণতার জন্যে আমার পূর্ণ সমবেদনা। আমার পিয়ারী বিবিকে আমার অবস্থা আমি এখানে লিখে জানাচ্ছি—মিলন থেকে আমার বিচ্ছেদের অবস্থা। ওগো বিল্‌কিস্,[৬] ওগো চিকন মুক্তা, ওগো পূর্ণ বিকশিত পুষ্প, আমি এখানে অনেক কাল এসেছি। সিকান্দার বাগের বারদোরি বাগান আমি বিন্যস্ত করেছি, সাজিয়েছি তোমার জন্যে। ওঃ কোথায় তুমি! না সেখানে, না এখানে। খোদার দোহাই, আমায় সত্যি বলো। আমাকে তোমার হাতখানি দাও, দেখো আমার হৃদ্‌পিণ্ডের কিরকম স্পন্দন হচ্ছে, ঠিক জবাই করা মুরগীর মতন। এসো, আমি আমার গাড়িতে চড়ি আর তোমার জন্যেও একটা গাড়ি আনাই। কোচোয়ান আর অল্পবয়সী যারা বাগানে বেড়াচ্ছে আমি তাদের চোখ কাপড়ে ঢেকে দেব। আমি তাদের একটা গল্প বল্‌ব আর তারা জায়গাটা ছেড়ে চলে যাবে। শিশির ঝরে ধোয়া হবে গাছগুলি। ওগো জগতের রাণী (মুম্‌তাজ জাহাঁ), সুখী হও। এসো আমরা আলিঙ্গন করি পরস্পরকে। সিকন্দারবাগে হামাম্[৭] প্রস্তুত। তুমি হুকুম দিলেই চৌবাচ্চায় জল ভরে দেওয়া হবে। যদি তুমি বলো আমি ওপরকার বড় চৌবাচ্চা খুলে দিই আর আমি ফোয়ারাদের বলি নিজে থেকে অশ্রু ঝরাতে; কোকিলেরা আপনাদের পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে; বুলবুলেরা নালিশ জানায় যে তাদের ডানা মিলিয়ে যাচ্ছে। আর ওই সব পাতা দুঃখে তাদের হাত ঘষ্‌তে থাকে। আর বাগিচা ও তার মালিরও হিংসা প্রকাশ পায় আমাদের মিলন দেখে।

ওগো প্রেমের বাগানের লতা, ওগো মিলন-বাগিচার ফুল, এ কি দুঃখ, এ কি ব্যথা। কি করে সেই সব দিনরাত জল্‌সায় কেটে গেছে। কেন তুমি আর আমি এই বিচ্ছেদের আর বন্দীদশার যন্ত্রণা ভোগ করলাম। সুখী ছিলাম আমরা আর বাগবাগিচা ছিল পূর্ণ ফলবন্ত। ওঃ, কে আমাদের অভিশাপ দিল, না কি কোকিলেরা শাপ দিয়েছে শিকারীকে। এ সবই আমাদের ভাগ্যের লিখন আর শিকারীই হল ভাগ্য। এসব জিনিষ দেখানো কান্নার বিষয়। এ শীতকাল (যখন পাতারা ঝরে পড়ে) আমাদের বড় কষ্ট দিয়েছে। আসল কথায় আসা যাক। হৃদয়ে আঘাত পেয়েছি আমি। এ সম্পর্কে আর কিছু আমি লিখব না। ওগো রূপসী পিয়ারীদের মুকুটমণি, ওগো সুন্দরীদের মধ্যে ঝলমলে তারা, আমি ২য়া জিন্‌কত্ তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি আমার নিজের কবিতা থেকে যে পদ লিখেছ, আমি খুবই উপভোগ করেছি। খোদার নামে বলছি, প্রত্যেকটি পদ সুতোর মুক্তার মতন।

(ফার্সীতে) আমি তোমাকে কবিতা রচনায় সাহায্যের জন্যে একটি পদ পাঠাই। তা হল—'চমন্ হ্যায় আব্‌র হ্যায় থিল্‌বৎ হ্যায় ঔর আরাম কি শয়।'

আমি যখন তোমাকে পদটি পাঠাই, আমি ভেবেছি যে তুমি এর ওপর কোন কবিতা রচনা করতে পারবে না, তাই আমি এ বিষয়ে বড় বিষণ্ণ ছিলাম। ওগো আমার প্রাণ, ওগো রাজার বিবি, আমি তোমাকে বুদ্ধিমত্তা, ভাষার অনর্গলতা আর

---

৬. সলোমনের রূপসী পত্নী

৭. স্নানাগার।

PATHAGAR

ভাল লেখার বিষয়ে অনেকবার লিখেছি। আমি আগেই প্রস্তাব করেছি মুন্সীকে কাজ করিয়ে নেবার আর তাঁকে মাহিনা দেবার কথা। আমার মনে হয় তুমি তাঁকে লিখতে বলেছ 'রোয়াই শাদকা' ৭ আর তার পড়বার সময় আমি কেঁদেছি। কিন্তু তুমি সে চিঠিখানির কোন জবাব পাঠাওনি। আবার আমি লিখছি। আমায় সে লিপিকারের নাম দয়া করে পাঠিও, তা'হলে আমি আমার কেতাবে তাঁর নাম লিখে নিতে পারি আর তাঁকে খেতাব দিই রাকিম্-ই ইদক-ই আখতার৮। আমি এ বিষয়ে স্থির করেছি যে, যখন থেকে তুমি সচেতন হয়েছ আর প্রেম ঘটেছে, আমাদের প্রেমের কাহিনী ৫০০০ থেকে ৬০০০ পদে রচনা করা যেতে পারে। তুমি ভাল ছন্দে রচনা করবে আর তোমার প্রতিটি প্রেমপত্রের সঙ্গে তুমি ২ কিংবা ৩টি অংশ আমায় পাঠাবে। তাতে বৃদ্ধি পাবে আমার প্রেম।

আমার ইচ্ছা যে, সেই মসনবীর কেতাবটির নাম হবে কিতাব-ই মসনবী-ই মুমতাজ আর নামটা তাহলে উপযুক্ত হয়। বাঁধাই করে ও সোনায় অলংকৃত করে এটি আমায় পাঠিয়ে দিও, খবর সব আমি দেব আর যদি তা সম্ভব না হয় অনুগ্রহ করে কিস্তিবন্দীতে পাঠিও, আমি আমার পছন্দ মতন তৈরি করে নেব। আমি তা ছাপাবার কথাও ভেবে দেখব। ঈশ্বরের নামে তুমি শপথ করো যে, আমার এই বাসনার কথা ভুলে যাবেনা আর আমার ইচ্ছা অনুসারে করবে, কারণ এই কবি দুর্লভ আর মুক্তার মতন ঝকঝকে। আমি তাঁর কণ্ঠে তোমার প্রেম-কথা শুনতে আর উপভোগ করতে কামনা করি। এই বিরাট ব্যাপার কিছু নয়। আমরা উপভোগ করব আর তিনি তাঁর অংশ পূরণ করে যাবেন আর তোমার রূপ ও আমার প্রেম শেষ দিন পর্যন্ত অমর হয়ে থাকবে দুনিয়ায়। তাহলে বিচারের দিন তোমার সৌন্দর্য আর আমার প্রেমের একটা নাম থেকে যাবে।

পুরু আলম্ (২)

জিন্‌কৎ ১২৭৫। জানে আলম্

(চতুর্দশ পত্র)

ওগো রূপসী মুমতাজ জাহাঁ নবাব আকলীল্ মহল সাহেবা, সালামৎ।

তোমার সুখদায়িনী পত্র ইহ জিন্‌কৎ পেয়েছি। হ্যাঁ, আমারই দোষ। কি করে তুমি একজন অপরিচিত লোকের সামনে বেরুবে বা বসবে।

ঈশ্বর যখন আমাদের পুনর্মিলন ঘটাবেন তখন তোমার সুন্দর মুখখানি দেখতে পাব। ওগো সুখের ভাণ্ডারী, গজলটি চমৎকার আর যে ব্যক্তি এটি রচনা৯ করেছেন তিনি অসাধারণ। আমি অনেকবার তোমাকে বলেছি, এই ব্যক্তিকে দিয়ে তোমার চিঠিগুলি১০ লিখিয়ে নেবার জন্যে। কিন্তু আমার মনে হয় আমার সেসব পত্র তুমি পাওনি, নচেৎ আমার ইচ্ছা অনুযায়ী তুমি করতে পারতে। আমি ওই কবির নাম

৮. ধর্মীয় কোন রচনা।

৯. যিনি আখ্‌তারের প্রেম-কাহিনী লেখেন।

১০. দুঃখে ভরা।

জানি না। তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে তাঁর নাম পাঠিয়ে দিও, যাতে আমি তাঁকে নিযুক্ত করতে পারি। তোমাকে দেখতে যে আমার কত বড় বাসনা তা লিখে বোঝাতে পারব না। খোদা যেন শীঘ্র আমাদের আবার মিলন করিয়ে দেন।

১০ই জিন্‌কৎ ১২৭৫। স্বাঃ জানে আলম্‌।

পুঃ আজ ফুফা১১ মুজাহেতুদ্দৌলার মৃত্যু হয়েছে মুচিখোলায়।

(পঞ্চদশ পত্র)

ওগো বিশ্বস্তা প্রেম-পাত্রী নবাব আকলীল্‌ মহল সাহেবা, সদা সুখী থাকো। তোমাকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করে জানাই যে, তোমার পত্র আমি ১৬ই জিন্‌কৎ পেয়েছি। তা থেকে চিঠির নকলগুলি আমীর আলী খাঁর হাতে দেবার বিষয়ে আমি জেনেছি। আমি তোমার শিরে শপথ করে বলছি যে, আমি সব সময়েই তোমার চিঠির জবাব সেইদিন কিংবা তারপরের দিনই লিখি। কিন্তু যদি আমি ভাল মেজাজে না থাকি জুলুফুকারুদ্দৌলাকে দিয়ে লিখিয়ে সেগুলো পাঠিয়ে দিই। যদি সেসব তোমার কাছে না পেঁছে থাকে, তাহলে আমি নাচার। যা-ই হোক, তোমাকে আমি ১০০০ টাকা পাঠিয়েছি তোমার ইদুজ্জোহার পোষাকের বাবদ। তা যখন পাবে, রসিদ পাঠিও। আমি আমার লেখা কবিতাবলী সংগ্রহ করছি। সে জন্যে আমি বেশি সময় পাচ্ছিনা আর জল্‌ফুকারুদ্দৌলাকে নির্দেশ দিয়েছি তোমার পত্রের উত্তর দিতে আর আমি তা দেখেছি। যতদিন পর্যন্ত আমি আমার কবিতা সংগ্রহে ব্যস্ত থাকি, আমি তোমার চিঠির জবাব নিজের হাতে লিখতে পারব না, তুমি সেজন্যে অনুগ্রহ করে কিছু মনে করো না আর ভেব না যে আমার হৃদয় থেকে তোমার প্রতি প্রেম কমে যাচ্ছে। এসব কাজ থেকে যখনই মুক্তি পাব, আমি নিজের হাতে তোমায় কবিতা ও গদ্যে লিখতে আরম্ভ করব।

পুঃ—তুমি তোমার চিঠিগুলির দুটি করে অনুলিপি পাঠাবে আর আমার লেখা গদ্য ও কবিতায় পত্রাবলী তোমাকে যেমন পাঠিয়েছি সেই কালানুক্রমে আমায় পাঠিয়ে দেবে। এই বন্দোবস্ত আর ভূমিকা হবে তোমারই নামে। তুমি ভূমিকা লিখবে—"জানে আলমের এই প্রেম-পত্রাবলী আমি প্রেমের আধিক্যে সংগ্রহ করেছি আর আমি নামকরণ করেছি 'তারিখ্‌-ই-মুম্‌তাজ।" তারপর তুমি তা বাঁধাই করে আমাকে পাঠিয়ে দেবে আর প্রতি মাসে এমনি করবে। আমি এই কাজে সুখী হব আর এর জন্যে খরচ করব। খেয়াল রেখো, যেন কোন ভুল কোরো না। যদিও আমি কম লিখেছি, কিন্তু তুমি এটি বড় করে ধরবে।

১৭ই জিন্‌কৎ, ১২৭৫। জানে আলমের হুকুমে
জুল্‌ফুকারুদ্দৌলা লিখিত।

(ষোড়শ পত্র)

সতী প্রিয়া, কুঞ্চিত কালো কেশ, লালা ফুলের মতন, দীর্ঘাঙ্গিনী, রাজার পিয়ারী, বিরহে অধীরা নবাব আকলীল্‌ মহল—আমাদের শত্রুদের যেন দুর্দিন

১১. পিসেমশায়।

আসে আর বন্ধুদের শ্রীবৃদ্ধি হয়। দেহে মনে মিলন কামনা করে আমার লেখনী তোমার সুখ প্রার্থনা করে। তোমার বিচ্ছেদের জ্বরে মরে যাচ্ছি আমি।

২০শে জিন্‌কৎ তোমার দুখানি চিঠি পেয়ে আমি প্রেরণা পেয়েছি। একখানি তুমি লিখেছ ১০ই জিন্‌কৎ আর দ্বিতীয়টি চল্‌তি মাসের ৫ তারিখে আর তার একটি কবিতার পদ আমি এখানে উদ্ধৃত করছি তোমার মনে পড়বার জন্যে।

'ওয়া কেয়া ওয়াকৎ পর্‌ আয়ে যানে জাঁহা ইয়াদ কিয়া' (ওঃ কি চমৎকার সময়টি তুমি বেছে নিয়েছ আমায় স্মরণ করবার জন্যে)।

তুমি আমায় লিখেছ যে, জায়েব্‌ মহল সাহেবা তোমায় ব্যঙ্গ করেছেন আর দ্বিতীয় পত্রে তুমি কোন স্বপ্নের বিবরণ দিয়েছ। ঈশ্বর ভাল জানেন বৃত্তান্তটা মিথ্যা কিংবা কাব্য, বা সত্যিই তুমি তা দেখেছ কিনা। ওগো আমার প্রাণ, স্বপ্নের বিষয়ে তুমি মিথ্যা কথা বোলোনা, কেননা সেটি একটি বড় অভিশাপ। কবিতা রচনার হাজারো রাস্তা আছে। যাই হোক, বিচ্ছেদের জন্যে আমি উত্যক্ত হয়ে আছি আর কয়েদখানার কষ্ট এখনো রয়েছে তোমার প্রেমিকের ওপর, কিন্তু এই প্রেমিক তোমার প্রেমের জন্যে প্রসিদ্ধ।

মুন্সী আকবর আলীকে ৪০ টাকা মাস মাহিনায় নিযুক্ত করা হয়েছে।

আমি তোমাকে ৫ টি রত্নের আঙুটি পাঠিয়েছি।

২৭ জিন্‌কৎ, ১২৭৫। জানে আলমের বকলমে লিখিত।

পুঃ—আমি একটি নব-রত্নের কণ্ঠহার তোমার জন্যে পাঠাচ্ছি। গ্রহণ কোরো এবং প্রাপ্তির কথা জানিও।

(সপ্তদশ পত্র)

নবাব আকলীল্‌ মহল সাহেবা, আমার বড় তারা—

৯ই জিন্‌কৎ তারিখে তুমি যে চিঠিখানি লিখেছ আর যাতে আছে এই গজলটি, তা আমি পেয়েছি—তল্‌বে দিল্‌কো ফির্‌ হ্যায় তুম্‌হারি নিশানি (তোমার কাছ থেকে আর একটি অভিজ্ঞান পেতে আমার ইচ্ছা করে।)

ওই সমস্ত সুলক্ষণ গন্তব্যস্থলের সম্পর্কে তুমি অভিজ্ঞান বা চিহ্ন বলেছ আর আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছি, ওগো আমার প্রাণ, বসত বাড়িটা কি নবাব জায়েব মহলের, না তোমার। আমার মনে পড়ে না যে, তোমায় আমি সেখানে কোন নিশানি দিয়েছি। যাই হোক, আমি নিজেকে শুধরে নিয়েছি আর আমি নিশ্চিত যে তুমি পেয়েছ।

২রা জিন্‌কৎ, ১২৭৫। জানে আলমের বকলমে লিখিত।

পুঃ—মহম্মদ সাজ্জাদ তোমাকে তাঁর অনুগত্য জানাচ্ছেন।

(অষ্টাদশ পত্র)

মুমতাজ জাঁহা নবাব আকলীল্‌ মহল সাহেবা, সালামৎ।

তোমার চিঠি আমি পেয়েছি আর সেই সঙ্গে ১৯শে জিন্‌কৎ তারিখে মুন্সী আকবর আলী খাঁ তকীবের লেখা গজলটি। আমার বিষণ্ণ হৃদয় সুখী হয়েছে। সব

পুরনো ঘটনাই আমার মনে পড়ল আর সেসব স্মৃতিতে আমি বড়ই অবসন্ন বোধ করেছি। আমাকে ছাড়া কি করা যাবে। খোদা যদি মঞ্জুর করেন তাহলে সব কিছুই আগেকার দিনের মতন হয়ে যাবে আর তেমনি বাগিচা হবে আমাদের। আমার দুর্ভাগ্যের কথা কি লিখব। এসব জিনিষের জন্যে আমি লজ্জিত। আমাদের এত রকম জিনিষ ছিল যে বিষয়ে তুমি কম লিখেছ আর এখন আমার অবস্থা দেখ। আমাকে আমার সব কাজ নিজের হাতে করতে হয়, কারণ আমার খিদমৎগারেরা আমি ডাকলে গ্রাহ্য করে না। যাই হোক, খোদার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন আর এসব তাঁরই ইচ্ছা। আশ্চর্যের নয়, যদি আমরা সেই সমস্ত জিনিষ আবার ফিরে পাই আর আমাদের দিন যায় উল্টে। ঈশ্বর শীঘ্রই তাঁর কৃপা দেখাবেন, কারণ এসবের সম্মুখীন হবার শক্তি আর আমার নেই।

জানে আলমের হুকুমে জুলফুকারুদ্দৌলা লিখিত।

(ঊনবিংশ পত্র)

বিশ্বস্তা পিয়ারীদের মুকুট আর বিশ্বস্তা অনুগামিনীদের মুকুট নবাব আকলীল্ মহল সাহেবা, শ্রীবৃদ্ধিশালিনী ও সুখী হও।

তোমার প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করবার মতন ক্ষমতা আমার কণ্ঠে নেই আর এই বিচ্ছেদ বিবৃত করবারও শক্তি আর মুখে নেই। আর যদি আমার লেখনী এসব লিখতে শুরু করে তা হলে আমার বুক ভেঙ্গে যাবে। ঈশ্বরের দয়ায় তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে আর অমর সুখ লাভ করেছি আমি। শনিবার, ৭ই জিল্হজ আমি মুক্তি পেয়েছি আর আমার পুরনো বাড়িতে এসে পেঁছেচি। ওইদিন আমি সুখের ফুল পেয়েছি আর তা আমাকে দিয়েছে শক্তি আর শান্তি। তাকে 'সবে মেহ্রাজ্'[১২] বলাই ঠিক আর সেদিনটা যেন সুখ ভোগ করবার ঈদ। খোদা যেন এই দুনিয়ার সব দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করেন।

তুমি ৫ তারিখে যে চিঠি লিখেছ তা আমি পেয়েছি আর আমায় দুশ্চিন্তা মুক্ত করেছে। চিনির মতন তা মিষ্টি আর তার লাইনগুলি ছায়াপথের চেয়েও সুন্দর আর সে লেখার প্রবাহ যেন স্বর্গের কউসরের[১৩] মতন। ঈশ্বর যেন আমাদের সেই সময় দেন যখন আমরা শীঘ্রই পুনরায় মিলিত হতে পারি। খবর সব ভাল আর আমি তোমার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

১৩ই জিল্হ্জ্ ১২৭৫। তোমাকে দেখতে বড় উৎসুক

জানে আলম্।

মীর আঘার বকলম।

---

১২. সবচেয়ে পবিত্র রাত্রি। পয়গম্বর মহম্মদ এই রাত্রে স্বর্গে উপস্থিত হয়েছিলেন।

১৩. স্বর্গীয় খাল, যা স্বর্গবাসীদের জন্যে জল সরবরাহ করে।

(বিংশ পত্র)

সঙ্গত কার্যকারিণী নবাব আকলীল্ মহল সাহেবা, তুমি সদাচারিণী, তুমি যেন প্রেমের পবিত্র কেতাব, যা সুন্দরভাবে শুরু ও সুখময় সমাপ্তিতে প্রেমের বর্ণনা করে। আমি তোমার পত্র পেয়েছি আর বিষণ্ণ আখ্তার সুখী হয়েছে। তার বিষয়বস্তু জেনে আমার হৃদয়ের কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটেছে। তোমায় দেখবার আমার বাসনার কথা আমি কি লিখব। বলো আর কতকাল বিচ্ছেদের যন্ত্রণা সইব। তোমার বিরহের অবস্থা আমায় সত্যি করে বলো। তুমি কি এজন্যে খুবই দুঃখিত? দয়া করে মিথ্যা বোলো না। প্রেমের পথে অবিচল থেকো। আমি আমার মেজাজের বিষয়ে কি বল্‌ব। এত দাগে চিহ্নিত আমার হৃদয়টি কেমন করে দেখাব। ঈশ্বরের নামে বল্‌ছি, আমি অধীর হয়ে আছি। ঈশ্বর যেন আমাদের পুনর্মিলিত করেন আর তিনি যেন সেই সুখের মুহূর্তকে অতি নিকট করে দেন। আমার চিঠির জবাব দিতে দয়া করে দেরি করোনা। আমার কামনার কথা খেয়াল রেখো। তোমার আসবার বিষয়ে আমি আগেই জানিয়েছি। আমার দিক থেকে কোন জবরদস্তি নেই। তুমি মুক্ত। আমার দিক থেকে কোন বাধ্যবাধকতা আর বোঝাবার চেষ্টা নেই।

৭ই সফর ১২৭৬। মীর মহম্মদ সরদর আলীর বকলম।

বেগম আকলীল মহলকে লিখিত নবাবের পত্রগুচ্ছ এখানেই শেষ হয়েছে। আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত এই সমাপ্তি। এতদিনের উচ্ছ্বসিত প্রেম নিবেদনের শেষে অকস্মাৎ বেজে উঠেছে বিচ্ছেদের সুর। প্রিয়তমা বেগমের সঙ্গে ভাগ্যহীন নবাবের এ কি চিরবিদায়ের পূরবী?

সেকথা আর কিছুই জানা যায়না নবাবের বৃত্তান্ত থেকে। নবাব মেটিয়াবুরুজে স্থায়ী হবার পরেও আকলীল মহলকে পত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই শেষ চিঠিখানির পর বেগম সাহিবার আর কোন উদ্দেশ্য পাওয়া যায়নি ওয়াজিদ আলীর জীবনে।

নবাবের মেটিয়াবুরুজ দরবারের পত্তন ১৮৫৮ সালের শেষ দিকে। তাঁর লক্ষ্ণৌ দরবারেই মেটিয়াবুরুজ সংস্করণ। কবি লেখক কলাকার ওয়াজিদ আলীর চেয়ে কম স্মরণীয় নয় তাঁর দরবারপতির পরিচয়। সঙ্গীতৈক প্রাণ নবাবের এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি মেটিয়াবুরুজের সঙ্গীত দরবার। জীবনের নিতান্ত দুর্দিনেও যে এসব উচ্চকোটির সঙ্গীতাসর তিনি গড়েছিলেন, সেজন্যে ভাবীকালের সঙ্গীত সমাজ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। গুণে এবং পরিমাণে মেটিয়াবুরুজের তুল্য সঙ্গীত দরবার সমকালে অল্পই ছিল।

আর বাংলার রাগ সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে মেটিয়াবুরুজ দরবার।

এদিক থেকে বলা যায়, নবাব জীবনে নির্বাসনের অভিশাপ বাংলার সঙ্গীত জগতে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়।

মেটিয়াবুরুজ থেকে একটি বড় ঢল নামে এই প্রদেশের সঙ্গীত ধারায়।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার সেই ঐতিহাসিক লগ্ন। সাংস্কৃতিক নানা বিভাগেই সেই শতাব্দীর শেষার্ধে বিপুল প্রেরণা জেগেছিল। কলকাতা তথা বাংলার সঙ্গীত-ক্ষেত্রেও তখন নব নব কর্মচাঞ্চল্যে, সৃষ্টিতে মুখর। ভারতীয় সঙ্গীতের মূল ধারা রাগ সঙ্গীতের চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে বাঙালীর প্রতিভা। ধ্রুপদাদি অঙ্গের কণ্ঠসঙ্গীতে, বীণা পাখোয়াজ সেতার ইত্যাদি যন্ত্রসঙ্গীতে, গীত রচনায় ও সংকলনে, সঙ্গীতগ্রন্থ মুদ্রণে, স্বরলিপিকরণে, সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়, বহুভাবে সঙ্গীতের সেবা ও প্রচারে তখন বাংলাদেশ তৎপর। বাঙালী ধনীগৃহে উচ্চ মানের নিয়মিত সঙ্গীতাসর। অনুকূল পরিবেশে পশ্চিমাঞ্চলের কলাবৎ কলাবতীদের সমাবেশ।

বাংলার সঙ্গীতচর্চার সেই সুবর্ণক্ষণে মেটিয়াবুরুজ দরবারের সূচনা অতি শুভ যোগাযোগ হয়েছিল। যত ভারত-বিখ্যাত গুণী নবাব দরবারে নানা সময়ে যুক্ত থাকেন, তাদের অনেককে লাভ করে বাংলাদেশ। কাকেও সাময়িক, কাউকে স্থায়ী-ভাবে। মেটিয়াবুরুজের কোন কোন কলাকার দরবার থেকেও বাংলার সঙ্গীত-ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগ রাখেন। কেউ দরবারের চাকুরি ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায় বা অন্যত্র। কেউ বা নবাবের মৃত্যুর পরে, মেটিয়াবুরুজের ভাঙা আসর থেকে হন কলকাতা নিবাসী। তাঁদের সকলের দ্বারাই বাংলার সঙ্গীত জগৎ উপকৃত হয়। কারুর বাঙালী শিষ্য গঠনের ফলে। কারুর দীর্ঘকাল বাংলার রাজসভায় অবস্থানের প্রভাবে বাদ দৃষ্টান্তে।

ওয়াজিদ আলী শাহ্ এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেছিলেন সেই গুণীদের প্রথমে মেটিয়াবুরুজে নিযুক্ত রেখে।

প্রায় ৩০ বছর মেটিয়াবুরুজ সঙ্গীত দরবার সগৌরবে বর্তমান ছিল। ১৮৫৮ সালের শেষ দিকে পত্তন হয়ে, ১৮৮৭ সালে নবাবের এখানেই মৃত্যু পর্যন্ত। তাঁর ৩৬ বছর বয়স থেকে ৬৫তে দেহান্ত অবধি।

নবাব তাঁর লক্ষ্ণৌ দরবারে যে কলাকারদের পোষণ করতেন তাঁরা অনেকে আশ্রয় নেন মেটিয়াবুরুজে। তাছাড়া আরো নানা কেন্দ্র থেকে এই নতুন দরবারে ওস্তাদ বাইজী-দের আগমন হত। কারণ, ওয়াজিদ আলীর তুল্য সঙ্গীত-গুণীদের পৃষ্ঠপোষক বেশি ছিলেন না সে যুগে।

PATHAGAR

মেটিয়াবুরুজে গঙ্গার কাছে নবাবের সেই দরবারগৃহ। বাড়িটির নাম কসরুল বায়জা অর্থাৎ ডিম্বাকৃতি সৌধ। দোতলায় যে বৃহৎ কক্ষে আসর বসত তার ডিমের আকার। সে ঘরে কোন কোণ ছিল না। দরবার-কক্ষের প্রকৃতিতেও ছিল বৈশিষ্ট্য। নবাবের নির্দেশে সেখানে সুরের কখনো বিরতি থাকত না। জলসা ছাড়া দিনের অন্য সময়েও কোন না কোন গায়ক বা বাদক দরবার পূর্ণ রাখতেন সঙ্গীতের গুঞ্জরনে। অন্তত একজনও বসে তানপুরায় ঝংকার দিতেন। যে কোন সময় এসেও নবাব যেন শুনতে পান সুরধ্বনি।

এই দরবারে বহু কলাকার নিযুক্ত থেকেছেন বিভিন্ন সময়। তাঁদের সকলের তো নয়ই, বেশির ভাগেরও নাম জানা যায়নি। কারণ নবাব বা আর কারুর কোন পুস্তক নেই এ সম্পর্কে। 'তারিখ-এ-পরীখানা'তে তিনি লক্ষ্ণৌ দরবারের অনেক ওস্তাদের নাম

দিয়েছেন। নবাবের মেটিয়াবুরুজ জীবনের তেমন কোন আত্মকাহিনী থাকলে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যেত।

কিন্তু আরেক উপায়ে জানা যায় মেটিয়াবুরুজ দরবারে নিযুক্ত কয়েকজন কলাকারের কথা। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বাঙালী শিষ্য করেছিলেন কিংবা বাংলার নানা রাজসভায় যোগ দেন, তাঁরা শ্রুতি স্মৃতিতে জীবিত রয়েছেন। পরোক্ষে হলেও এইভাবে জানা গেছে তাঁদের প্রসঙ্গ। তার আগে আর একটি বিষয়ও উল্লেখ্য।

কজন বাঙালী গুণীও যে দরবারে নবাবের সামনে গান বাজনা করেছিলেন তার বিবরণও এমনিভাবে পাওয়া যায়।

বাংলার স্বনামধন্য ধ্রুপদী যদু ভট্টের গান হয়েছিল মেটিয়াবুরুজে। প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী কেশবচন্দ্র মিত্র তাঁর ধ্রুপদের সঙ্গে সঙ্গত করেছিলেন।

সেতার সুরবাহারগুণী কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন সুরবাহার শুনিয়েছিলেন নবাবকে সেই দরবারে।

খেয়াল গায়ক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ বয়সে দরবারে গান গেয়েছিলেন। দরবারী ওস্তাদ আলী বখ্‌সের কাছেই তখন শিখতেন তিনি। বামাচরণের বয়স সে সময় ২০ বছর। অর্থাৎ ১৮৮৪ সালের কথা। নবাবের মৃত্যুর তিন বছর আগে।

যদু ভট্ট, কেশবচন্দ্র মিত্র, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান বাজনা নবাব দরবারে বসে শুনেছিলেন। তারিফও করেছিলেন বলে প্রকাশ।

আরেকদিন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতসভা থেকে কজন গায়ক মেটিয়াবুরুজে এসেছিলেন। তাঁরা গান শোনান নবাবকে। শেষে তাঁদের অনুরোধে নবাব নিজে একটি ঠুংরি গান গেয়েছিলেন। তখন তাঁর পরিণত বয়স।

মেটিয়াবুরুজ দরবার আর নবাব ওয়াজিদ আলীর সঙ্গে বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে যে যোগাযোগ ঘটে, ওপরের বিবরণ তার একদিকের কথা। অন্যদিকে হল তাঁর দরবারী গুণীদের প্রসঙ্গ।

মেটিয়াবুরুজ দরবারে সমাগত যে কলাকারদের প্রভাব বাংলার সঙ্গীত জীবনে, এবার তাঁদের কথা।

অসম্পূর্ণ হলেও নবাবের দরবারী শিল্পীদের একটি তালিকা এখান থেকে পাওয়া যাবে।

(১) মহা ধ্রুপদী মুরাদ আলী খাঁ। কিছুকাল দরবারে নিযুক্ত থেকে তিনি মেটিয়াবুরুজ থেকে চলে যান নবাবের জীবিতকালেই। পরে দীর্ঘকাল মুরাদ আলী কলকাতায় থাকেন। কিছুকাল ছিলেন মজিলপুরের সুপরিচিত দত্ত পরিবারের হেমচন্দ্র দত্তের সঙ্গীতসভায় নিযুক্ত কলাকার। মাঝে মাঝে অন্যতম শিষ্য কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে তমলুকেও মুরাদ আলী বাস করতে যেতেন। শৌখীন ধ্রুপদ গায়ক কিশোরীলাল ছিলেন আহিরীটোলার বেনিয়াটোলা নিবাসী। কিন্তু আইনজীবীর কাজে বাস করতেন তমলুকে। তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিপ্লবী যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং আমেরিকা প্রবাসী সাহিত্যিক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় তখন ওস্তাদ মুরাদ আলীকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেন। মুরাদ আলীর অসাধারণ গায়কক্ষমতা আর জোয়ারিদার কণ্ঠের কথা দুজনেই যথাক্রমে লেখেন তাঁদের গ্রন্থে। যথা

—'মোরাদ আলী খাঁ মালকোষ রাগের অদ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ বলে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নুলো গোপাল, আমার পিতা, ময়ূরভঞ্জের রাজগায়ক যদু রায় প্রভৃতির যশ দেশে ছেয়ে গিয়েছিল।.....পূর্বদিন বেশি রাত্রে ওস্তাদজীর মালকোশ নাকি এমন উৎরে ছিল এবং এমন জমেছিল যে, তেমন গান ক্বচিৎ কদাচিৎ লোকে শুনে থাকবে। শ্রোতাদের মুখে বাহবার অন্ত ছিল না।' (যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃষ্ঠা ৮১)। কিশোরীলালের কনিষ্ঠ পুত্র ধনগোপাল তাঁর My brother's face পুস্তকে মুরাদ আলী খাঁর কণ্ঠে অসাধারণ জোয়ারির বর্ণনা করেছেন: 'Ah, what a voice!

He was the only one left who would sing Dipak—the fine and thunder melody. His tone was deep and vibrant as a bull forg's.' (Dhan Gopal Mukherjee, My brother's Face, p 130).

মুরাদ আলীর সব শিষ্যই বাঙালী। আমৃত্যু তিনি কলকাতা নিবাসী। তাঁর উত্তরাধিকারও লাভ করেন বাংলার গুণীরা। যথা—যদুনাথ রায় (পরে ময়ূরভঞ্জ রাজ-সভায় নিযুক্ত ধ্রুপদী। বীণাবাদও। ধ্রুপদী, অঘোরনাথ চক্রবর্তী (তাঁর প্রধান ওস্তাদ ধ্রুপদী আলীবখ্‌স। কিন্তু অঘোরনাথ আলী বখ্‌সেরই নির্দেশে মুরাদ আলীর তামিলও নেন।), ধ্রুপদী এবং সুরশৃঙ্গারগুণী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (তাঁর অন্য ওস্তাদরাও ছিলেন), অসামান্য সুমিষ্ট কণ্ঠ ধ্রুপদগায়ক আশুতোষ রায় (যদুনাথ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং পরে মুরাদ আলীর ইচ্ছায় যদুনাথেরও শিক্ষাপ্রাপ্ত), অপূর্বকৃষ্ণ দত্ত, কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। তাছাড়া, গোয়াবাগানের অবিনাশ ঘোষও মুরাদ আলীর এক প্রিয় শিষ্য। সেখানে অবিনাশ ঘোষেরই নামাঙ্কিত পথে তাঁর বাড়িতে মুরাদ আলী অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত বাস করেছিলেন। খাঁ সাহেবের সঙ্গীত জীবনে অনেকদিন সহযোগী ছিলেন এক শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজগুণী কেশবচন্দ্র মিত্র (বিচারপতি স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের অগ্রজ)। কেশবচন্দ্রের ভবানীপুর পদ্মপুকুর রোডের বাড়িতে মুরাদ আলী কয়েকমাস বাসও করেছিলেন। কোন কোন মতে, মুরাদ আলী খাঁ ছিলেন তিলমণ্ডী ঘরানাদার।

(২) গোয়ালিয়রের খেয়াল-গুণী আলী বখ্‌স্। মেটিয়াবুরুজ দরবারে তিনি নবাবের মৃত্যু পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। দরবার ভেঙে যাবার পর তিনি ক'বছর থাকেন বড়বাজার অঞ্চলে। শেষ জীবনে ফিরে যান গোয়ালিয়রে। আলী বখ্‌সের একমাত্র বাঙালী শিষ্য, বেহালার বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেয়াল গায়করূপে আচার্যস্থানীয় হন বামাচরণ। আলী বখ্‌সের শিষ্য হিসাবেই এক-দিন তিনি দরবারে নবাবের সামনে ভূপালীর খেয়াল গেয়েছিলেন। স্বনামধন্য দিলীপ কুমার রায় 'সাঙ্গীতিকী' পুস্তকে লিখেছেন যে, মেটিয়াবুরুজের ওস্তাদ আলী বখ্‌সের শিষ্য অঘোরনাথ চক্রবর্তী ও বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু একথা সঠিক নয়। মেটিয়াবুরুজের দরবারী কলাবৎ আলী বখ্‌সে খেয়াল গায়ক, বামাচরণের ওস্তাদ এবং গোয়ালিয়রে পরলোকগত। আর অঘোরনাথের ওস্তাদ ধ্রুপদী এবং সে আলী বখ্‌সের মৃত্যু হয় কলকাতাতেই। দুই আলী বখ্‌স ভিন্ন ব্যক্তি।

(৩) লক্ষ্ণৌর খেয়াল ও টপ্পা-গুণী আহম্মদ খাঁ। অনেক বছর তিনি নবাব

দরবারে এবং মেটিয়াবুরুজে থাকেন। আহম্মদ খাঁর একাধিক বাঙালী শিষ্যের অন্যতম হলেন বেণীমাধব অধিকারী। উত্তর কলিকাতা নিবাসী অধিকারী মশায় 'বেণী ওস্তাদ' নামে সংগীতসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। বিখ্যাত কলাকার অমৃতলাল দত্ত (হাবু নামে প্রসিদ্ধ। স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাতিভ্রাতা। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর প্রথম সংগীতগুরু), স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ প্রথম জীবনে ছিলেন বেণী ওস্তাদের সংগীতশিষ্য। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্য-লীলা', 'দক্ষযজ্ঞ' প্রভৃতি বিখ্যাত নাটকের সুরসংযোজক, সংগীত পরিচালকও বেণী ওস্তাদ। তিনি ভিন্ন পূর্বোক্ত বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আহম্মদ খাঁর আরেক শিষ্য। বামাচরণ আলী বখ্‌সের মতন আহম্মদ খাঁর তালিমও পান মেটিয়াবুরুজে।

(৪) বীন্‌কার-রবাবী কাসিম আলী খাঁ। তানসেনের পুত্রবংশীয়, ভারতের এক শ্রেষ্ঠ তন্ত্রকার। মেটিয়াবুরুজ দরবারে ক'বছর থেকে তিনি বাংলার বিভিন্ন রাজ-সভায় আমৃত্যু নিযুক্ত ছিলেন। যথা—পঞ্চকোট রাজার কাশীপুর দরবার, ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের দরবার ও ভাওয়ালরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের দরবার। ভাওয়ালেই অপুত্রক কাসিম আলীর মৃত্যু হয়। সংগীতজীবনের অনেকাংশ বাংলায় অতিবাহিত হলেও এখানে কোন শিষ্য করেননি খাঁ সাহেব। ধ্রুপদী যদু ভট্ট কদিন লুকিয়ে তাঁর বাজনা শুনে কিছু সংগ্রহ করেন মাত্র। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর পিতা সদু খাঁ ত্রিপুরায় কাসিম আলীর কাছে শিক্ষার জন্যে যাতায়াত করতেন। কিন্তু খাঁ সাহেবের নিকটে সদু খাঁ সেতারের জন্যে পান দুটি মাত্র গৎ—ইমন ও ছায়ানট। ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ (তবলিয়া আতা হুসেনের শিষ্য) নিজের সংগীত-সভায় অনিচ্ছুক কাসিম আলীর সঙ্গে তবলা সংগত করতেন। লক্ষ্ণৌ থেকে কাসিম আলী আসেন মেটিয়াবুরুজ দরবারে।

(৫) তানসেনের আরেক পুত্রবংশীয় ধ্রুপদী তাজ খাঁ। তিনি খেয়ালগুণীও। তিনিও লক্ষ্ণৌ থেকে মেটিয়াবুরুজ দরবারে যোগ দেন। তারপর নবাবের চাকুরি ছেড়ে চলে যান নেপাল দরবারে। তাজ খাঁ মেটিয়াবুরুজে থাকবার সময় কিছুদিন বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাছে শিখেছিলেন। আরেকজন বাঙালী খাঁ সাহেবের তালিম পান অনেক বেশি। তিনি হলেন কালীঘাট সাহানগর নিবাসী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৩—১৮৯৯)। গোপালচন্দ্রের নামে সাহানগরে একটি পথের নামকরণ করা আছে।

(৬) সেতার-সুরবাহারের স্বনামপ্রসিদ্ধ কলাবৎ সাজ্জাদ মহম্মদ। তিনিও সম্ভবত লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছিলেন মেটিয়াবুরুজ দরবারে। সাজ্জাদ মহম্মদের দৃষ্টান্তে বাল্যকালে সুরবাহারে উপকৃত হন কৌকব খাঁ, পরবর্তীকালের বিখ্যাত শরদী। মেটিয়াবুরুজ বাসের সময় সজ্জাদ মহম্মদকে কৌকব খাঁ অতি নিকটে পান। কারণ, কৌকব পিতা নিয়ামৎউল্লাও ছিলেন নবাবের দরবারী বাদক এবং সাজ্জাদ মহম্মদের ঘনিষ্ঠ পরিচিত। মেটিয়াবুরুজ দরবারের পরে সাজ্জাদ মহম্মদ যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের সংগীত সভায়ও নিযুক্ত থাকেন। কোন কোন মতে, সে সময় তাঁর কাছে শিক্ষার্থী ছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। শোনা যায়, সাজ্জাদ মহম্মদের অজ্ঞাতে তাঁর বাজনা শুনে সেতার সুরবাহার বাদক এমদাদ খাঁ কিছু সংগ্রহ

করেন। সেকালের বাংলার প্রতিভাবান সেতারবাদক বামাচরণ ভট্টাচার্য ও সাজ্জাদ মহম্মদের শিক্ষা পেয়েছিলেন বলে কথিত আছে।

(৭) তানসেনের পুত্র বংশের নেতৃস্থানীয় ধ্রুপদী-রবাবী বাসৎ খাঁ। তিনি আগে লক্ষ্ণৌতে ছিলেন এবং সেখানেও নবাব দরবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। মেটিয়াবুরুজ দরবারে বাসৎ খাঁ প্রায় দু বছর নিযুক্ত থাকেন। তারপর কিছুকাল ছিলেন রাণাঘাটের পাল চৌধুরী পরিবারের সঙ্গীতসভায়। তাছাড়া কলকাতার সঙ্গীত-ক্ষেত্রে ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারের সঙ্গেও বাসৎ খাঁর সম্পর্ক ছিল। তিনি মেটিয়াবুরুজে থাকবার সময় তালিম দিয়েছিলেন শরদী নিয়ামতুল্লাকে। লক্ষ্ণৌতেও নিয়ামতুল্লা বাসৎ খাঁর কিছু শিক্ষা পান। তারই পরিণতি ঘটেছিল মেটিয়াবুরুজে, বাসৎ খাঁ এবং নিয়ামতুল্লা দুজনেই নবাব দরবারে নিযুক্ত থাকার জন্যে। সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের অন্যতম সঙ্গীত গুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ১৮৬৮ সালে 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থটি লেখেন সঙ্গীতের তত্ত্ব বিষয়ে। বাসৎ খাঁ তার যে প্রশংসাপত্র উর্দুতে লিখে দেন সেটি বইয়ের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত আছে। রাণাঘাটের পাল চৌধুরীদের সঙ্গীতসভায় বাসৎ খাঁ যখন ছিলেন, তাঁর কাছে শিক্ষার সুযোগ পান সেতারী বামাচরণ ভট্টাচার্য।

(৮) লক্ষ্ণৌর খেয়ালগায়ক ছোটে মিঞা। তবলা-গুণী হোসেন বখ্‌স্‌ বা বখ্‌সু মিঞার পত্তন-করা লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত তবলাবাদক বংশীয় তিনি। কিন্তু তবলা বাদক না হয়ে ছোটে মিঞা খেয়াল গায়ক হন। নবাবের মেটিয়াবুরুজ দরবারেও যুক্ত থাকেন খেয়ালীয়া হিসাবে। বাংলার সঙ্গীত ক্ষেত্রের সঙ্গেও ছোটে মিঞার যোগাযোগ হয়েছিল। একটি বাংলা সঙ্গীত সংকলন গ্রন্থে দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান' মুদ্রিত দেখা যায় ছোটে মিঞা রচিত একটি তরানা গান (ছায়ানট—তেওট)।

(৯) ছোটী বিবি। উক্ত ছোটে মিঞার পত্নী। ছোটী বিবিও লক্ষ্ণৌ থেকে মেটিয়াবুরুজে এসেছিলেন। স্বামী তবলিয়া না হলেও তিনি ছিলেন তবলাবাদিকা। নবাব দরবারে পর্দার অন্তরালে থেকে ছোটী বিবি তবলা সঙ্গত করতেন। বিবিজীর তবলা-গুণের এক প্রমাণ, পুত্র বাবু খাঁকে তালিম। ছোটী মিঞা ছোটী বিবির পুত্র বাবু খাঁ তবলা বাদক হয়েছিলেন জননীর তালিমে। বাবু খাঁও মেটিয়াবুরুজ দরবারের শেষ দিকে তবলিয়া নিযুক্ত থাকেন।

(১০) শরদী নিয়ামতুল্লা খাঁ। লক্ষ্ণৌ থেকে শরদ বাদক হিসাবে তিনি নবাব দরবারে যোগ দেন মেটিয়াবুরুজে। নিয়ামতুল্লা শরদ বাদনে একটি ঘরানার প্রবর্তক এবং পরবর্তীকালের দুই কৃতী শরদী ভ্রাতা করামতুল্লা ও আসাদুল্লা খাঁ কৌকবের পিতা। কৌকবের জন্মও মেটিয়াবুরুজে। করামতুল্লা ও কৌকবের পরবর্তী জীবনের প্রধান অংশ কলকাতায় অতিবাহিত হয়। তাঁদের অধিকাংশ শিষ্যই কলকাতায় গঠিত এবং বাঙালী। দুই শরদী ভ্রাতার সঙ্গীতজীবনের ও কলকাতার সঙ্গে সংযোগের সূচনা পিতা নিয়ামতুল্লা খাঁর মেটিয়াবুরুজ দরবারে নিযুক্ত থাকার জন্যই। নবাব দরবার থেকে নিয়ামতুল্লা পরে পুত্রদের নিয়ে নেপাল দরবারে চলে যান। কৌকব খাঁর একটি বিবৃতি পাওয়া যায় এ সম্পর্কে। 'গানের আচার্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন—প্যারে জাফর

খাঁ, জাফর খাঁ, হায়দার খাঁ এবং বাসিত খাঁ। এঁরা সবাই মিয়াঁ তানসেনের খানদানের স্মৃতিবাহক।...আমার পিতা নেমৎউল্লাহ্ খাঁ এই বাসিত খাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। নেমতউল্লাহ খাঁ মেটিয়াবুরুজে ওয়াজিদ আলী শাহর কাছে প্রায় এগার বছর ছিলেন; তারপরে ত্রিশ বছর ছিলেন নেপাল দরবারে।' (পুরানো লখনউ, পৃষ্ঠা ১৮৬)। কৌকব খাঁ আরো জানিয়েছেন, 'ওয়াজিদ আলীর শাহ দরবারে কলাকারদের প্রভূত আদর সম্মান হত। তার কারণ, ওয়াজিদ আলী শাহও গান শিখেছিলেন বাসিত খাঁর কাছে, এবং নিজে প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত বোদ্ধা ছিলেন।...বস্তুত, ওয়াজিদ আলী শাহকে এই শিল্পের আচার্য মনে করা হত। কিন্তু সঙ্গীত মর্মজ্ঞ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সব চেয়ে যে দোষ—যা থেকে তিনি কোনদিন মুক্ত হতে পারেননি—নিম্নশ্রেণীর রুচি, তাই দিয়ে তিনি লখনউ সঙ্গীতকে তার স্বস্থান থেকে নামিয়ে সাধারণের স্তরে এনে ফেলেছিলেন। কালের এই রীতি দেখে সুরুচিসম্পন্ন গায়করাও কষ্টসাধ্য রাগ-রাগিণী পরিত্যাগ করে ছোট ছোট, সরল সুখদ, জনগণের পক্ষে সুগম গান রচনা করতে লাগলেন। উপেক্ষিত হল ধ্রুপদ, হোরীর মতো কঠিন সবরাগ; বাজার চল হল গজল, ঠুমরি।...' (পুরানো লখনউ, পৃষ্ঠা ১৮৭-১৮৮)। বাসৎ খাঁর নিকটে ওয়াজিদ আলীর সঙ্গীত শিক্ষা লক্ষ্ণৌতে হয়েছিল। নবাবের সঙ্গীত বিষয়ে কৌকব তাঁর ওই সমালোচনাও তাঁর লক্ষ্ণৌ দরবার সম্পর্কে ধর্তব্য। মেটিয়াবুরুজে ওয়াজিদ আলী আর শিক্ষা করেননি।

(১১) সানাইয়ের কলাকার প্যারে খাঁ। মেটিয়াবুরুজে নবাব যত সানাইবাদক নিযুক্ত করেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনি। রাগসঙ্গীতে সানাই-গুণী প্যারে খাঁর কাছে একজন বাঙালী অনেক বছর শিখেছিলেন। তাঁর নাম শ্যামলাল গোস্বামী। প্যারে খাঁর কাছে শিখলও শ্যামলাল বাজাতেন এস্রাজ। কিন্তু তাঁর এস্রাজ বাদনে সানাইয়ের বিশিষ্ট ধ্বনি মাধুর্য প্রকাশ পেত। এজন্যে শ্যামলালের গুণপনাও স্বীকৃত ছিল সঙ্গীত সমাজে। ভবানীপুরের ধ্রুপদী সুরশৃঙ্গার শিল্পী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম জীবনে শ্যামলালের শিক্ষা পান এবং এস্রাজ বাজাতেন সেই রীতিতে। তার উৎস মূলে মেটিয়াবুরুজ দরবারের সানাই শিল্পী প্যারে খাঁ।

(১২) তবলিয়া বাবু খাঁ। লক্ষ্ণৌ থেকে আগত, ছোটে মিঞা-ছোটী বিবির তিনি পুত্র ও জননীর শিক্ষাপ্রাপ্ত, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বাবু খাঁ নবাবের মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিলেন মেটিয়াবুরুজে দরবারে। তার পর রাজাবাজার অঞ্চলে বাস করতে থাকেন। তিনি তবলা শিক্ষা দিতেন পেশাদার ওস্তাদ রূপে। বাবু খাঁর কলকাতায় তবলাবাদক শিষ্যমণ্ডলী গড়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বসু, ভূতেশ্বর দে, গোবর্ধন পাল, মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (পরবর্তীকালের তবলা-গুণী হীরেন্দ্রকুমারের পিতা), লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী, মণিলাল মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুভূষণ দত্ত প্রভৃতি। অপুত্রক বাবু খাঁর রাজাবাজারেই মৃত্যু হয় ১৮৯৯ সালে। তিনি লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত তবলা ঘরানাদার। তাই বলা যায়, নবাব দরবারে আসার ফলে বাবু খাঁ বাংলার সঙ্গীত সমাজের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ তবলা ঘরানার যোগ সাধন করেছিলেন। সেই প্রক্রিয়ায় আরো শ্রীবৃদ্ধি হয় তাঁদেরই ঘরানার উত্তরসাধক তবলিয়া আবিদ হোসেনের কলকাতায় আগমনে এবং বাঙালী শিষ্য

গোষ্ঠী গঠনে।

(১৩) সারঙ্গ বাদক বাদল খাঁ। প্রথম জীবনে তিনি মেটিয়াবুরুজ দরবারে নিযুক্ত থাকেন। সেবার বাদল খাঁ বেশিদিন অবস্থান না করলেও তা-ই তাঁর কলকাতা বাসের সূচনা। নবাবের মৃত্যুর অনেক বছর পরে, বিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে বাদল খাঁ প্রায় ২০ বছর কলকাতার সঙ্গীতজীবনে একাত্ম হন বাঙালী শিষ্যবৃন্দ গঠন করে।

(১৪) কোন কোন মতে, কাশীর কলাবতী টপ্পাগায়িকা ইমামবাদীও মেটিয়াবুরুজের দরবারী গায়িকা ছিলেন। ইমামবাদীর পুত্র—টপ্পা ও টপ্ খেয়ালের স্বনামধন্য গায়ক রমজান খাঁ। সঙ্গীত জীবনের অধিকাংশ এবং আমৃত্যু রমজান কলকাতাবাসী থাকেন কৃতী বাঙালী শিষ্য মণ্ডলীর ওস্তাদ রূপে। ইমামবাদীর একমাত্র বাঙালী শিষ্য রাণাঘাটের নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ টপ্পা গুণী নগেন্দ্রনাথের অবশ্য অন্যান্য ওস্তাদও ছিলেন। তিনি একাধারে ধ্রুপদ খেয়াল ঠুংরি গায়কও। ইমামবাদীর শিষ্য রূপে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে রমজান খাঁর ছিল প্রীতির সম্পর্ক। ইমামবাদীর নিকটে নগেন্দ্রনাথ মেটিয়াবুরুজ কিংবা অন্যত্র তালিম পান, তা সঠিক জানা যায়নি।

তা ছাড়াও আরো কলাবৎ এবং বাইজী নিযুক্ত ছিলেন মেটিয়াবুরুজ দরবারে। বাংলার সঙ্গীত সমাজে যুক্ত না থাকার জন্যে তাঁদের অনেকেরই কথা অজ্ঞাত আছে। কেবল কজনের নাম শোনা যায়, যেমন—তবলিয়া নান্নে খাঁ (পরবর্তীকালের তবলা বাদক মসিদ্ খাঁর পিতা নান্নে খাঁ ভিন্ন ব্যক্তি), পাখোরাজী নিসার আলী খাঁ, পাঞ্জাবের ধ্রুপদী-খেয়ালিয়া মুবারক আলী খাঁ প্রভৃতি।

আবদুল হলীম শরররের বিবৃতিতে আরো একজন গায়কের কথা জানা গেছে—গোলাম হোসেন খাঁ, আবদুল হলীম লিখেছেন। 'মেটিয়াবুরুজে ওয়াজিদ আলী শাহের দরবারে যে সমস্ত গায়ক ও বাদক নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের সকলের গান আমি নিজে শুনেছি। এহমদ খাঁ, তাজ খাঁ ও গুলাম হুসেন খাঁ সে সময়কার ধুরন্ধর সঙ্গীতকার ছিলেন।...' (পুরানো লখনউ, পৃ ১১০)।

উল্লিখিত প্রথম দুজন অর্থাৎ এহমদ বা আহমদ খাঁ ও তাজ খাঁর নাম ওপরের তালিকায় আছে।

ওয়াজিদ আলীর মেটিয়াবুরুজ দরবারের গুণীদের আরেকভাবে সংযোগ ছিল। কলকাতার সংযোগ ছিল কলকাতার সংগীত সমাজের সঙ্গে। নবাবের জন্য ইংরেজ সরকারের বৃত্তি আনয়নের একজন ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ভবানীপুরের রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়। সেই সূত্রে ওয়াজিদ আলী তথা তাঁর দরবারী গুণীদের সঙ্গে রূপচাঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। কারণ রূপচাঁদও ছিলেন সংগীতপ্রেমী। তার কালীঘাট রোডের বাড়িতে উচ্চ মানের আসর বসত প্রতি সপ্তায়। সেখানে বাংলায় যদু ভট্ট, কেশবচন্দ্র মিত্র প্রমুখ কলাকাররা যোগ দিতেন। আর মেটিয়াবুরুজের দরবারী গায়কগায়িকাদেরও গানবাজনার ব্যবস্থা করতেন রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর সেই গৃহেই হোলির উৎসব বিরাট আকারে হত। সকাল থেকে আবীর, রঙ খেলা। আর সন্ধ্যা থেকে সারা রাত সংগীতের আসর। নবাব স্বয়ং দোলের দিন আসতেন রূপ-

চাঁদের বাড়িতে। রাত্রের জলসায় বাঙালী গায়ক বাদকদের সংগে নবাবের দরবারী কলাকাররাও যোগ দিতেন।

এমনি নানাভাবে রূপচাঁদের গৃহ ছিল মেটিয়াবুরুজ দরবারের সঙ্গে বাঙালী সঙ্গীত সমাজের একটি যোগসূত্র।

নবাবের দরবারী গুণীদের তালিকায় দেখা গেল, ধ্রুপদী খেয়ালীয়ারাই বেশি রয়েছেন। কৌকব খাঁ যে সমালোচনা করেছেন নবাবের লঘুতর গান আর সেই শ্রেণীর গায়ক গায়িকাদের জন্যে, তাঁদের নাম উল্লেখ নেই এখানে। তার কারণ, গজল ঠুংরির গায়ক বাইজীদের তেমন খ্যাতি না থাকায় তাঁদের কথা জানা যায়নি। শিক্ষাদান ইত্যাদি না করার জন্যেও তাঁদের শ্রুতি স্মৃতি থাকেনি কলকাতার সঙ্গীত সমাজে। তবে বাইজীরা ভালভাবেই মেটিয়াবুরুজ দরবারে ছিলেন। তা জানা গেছে রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের আসরের সূত্রে। মেটিয়াবুরুজের গায়ক বাদকদের সঙ্গে বাইজীরাও তাঁর বাড়ির জলসায় গান শুনিয়েছেন। একদিন সেখানে যদুভট্টের আসরে ছিলেন দুজন বাইজী। তাঁরা ভট্টজীর ধ্রুপদ শুনে বিস্ময় বিমুগ্ধা হন এবং নবাবকে এই অসামান্য গায়কের কথা জানান। তার ফলে নবাব দরবারে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন যদুভট্ট।

ওয়াজিদ আলীর ঠুংরি-প্রীতি ত সারা জীবনই ছিল। তিনি নিজেও সব চেয়ে বেশি রচনা করেন ঠুংরি গান। শুনতেও বেশি ভালবাসতেন ঠুংরি। স্বয়ং ঠুংরি গানই গাইতেন। তাঁরা প্রিয় সেই ঠুংরির চাল ছিল—'বোল, ভাও কি' ঠুংরি। অর্থাৎ যে ঠুংরি গান ভাব প্রদর্শনের সঙ্গে গাওয়া হয়। মুখের হাবভাব, হাতের মুদ্রা আর দেহভঙ্গিমায় গানের বোল্ বা ভাষাকে রূপায়িত করা এই রীতিতে ঠুংরি গান গাইবার সঙ্গে। যেমন, বিন্দা দীন রচিত এই ঠুংরিটি—

'নিয়ল ত্রিভঙ্ কদম তলে ঠারো।
মোহত ব্রিজ কি বাম।
বাঁশুরিয়া কেইসী বজাই শ্যাম।'

গানখানি গাইবার সময় গায়িকা মুখভাব ও অঙ্গভঙ্গিতে দেখাবেন—কদম গাছের তলায় ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়ানো, ব্রজবালাদের মোহিতা রূপ, শ্যামের বাঁশি বাজাবার ধরন ইত্যাদি। এমনি ভাব প্রদর্শনের ফলে গাছের ভাষা ও বক্তব্য আরো অর্থপূর্ণ, চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে। লক্ষ্ণৌয়ের বাইজীরা এই 'বোল্ ভাও কি' ঠুংরি বেশি গাইতেন। নবাব নিজেও গাইতেন এই রীতির ঠুংরি। আর সে ভাও বা ভাব ছিল নায়িকা ভাব। নায়িকার ভাব যথাযথ প্রকাশের জন্যে নবাব তাই নর্তকীর বেশে ঠুংরি গাইতেন। একদিন মেটিয়াবুরুজে উপস্থিত কজন বাঙালী গুণীকে নবাব ঠুংরি শুনিয়েছিলেন নারীর সাজ-সজ্জায়। লক্ষ্ণৌয়ের পরীখানায় বা তাঁর নিজস্ব আসরেও নবাব নর্তকীর সাজে ঠুংরি গাইতেন। তার উল্লেখ আছে নবাবকে তাঁর জননীর ভর্ৎসনায়। রাজ্য হারাবার সরকারী আদেশ পাবার পর নবাব জননী যে ধিক্কার দিয়েছিলেন, 'তোর কোন বাপ, দাদা কখনো নাচ গান আর হৈ-হল্লা করেছে মেয়েমানুষ সেজে?'

সেসবই নবাবের 'বোল্ ভাও কি' ঠুংরি চর্চার আধিক্যের ফল। এই রীতির ঠুংরি নবাবের জন্যেই লক্ষ্ণৌতে বেশি চলন হয়। নবাবকে খুশি করবার জন্যে গাইতে

থাকেন বাইজীরা। আর পরেও বাইজীদের মধ্যে এ ঠুংরির চর্চা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। নবাব যতদিন মেটিয়াবুরুজে বর্তমান ছিলেন, ততদিন লক্ষ্ণৌর ঠুংরি গায়িকা বাইজীরাও অলংকার হয়ে থাকেন দরবারে। নবাবের নিজের রচনা ঠুংরিও বাইজীরা গেয়ে শোনাতেন। লক্ষ্ণৌর মতন নবাব গীতি-নাটিকারও অভিনয় করতেন মেটিয়াবুরুজে। তার গীতাবলীও প্রধানত ঠুংরি অঙ্গের হ'ত। এই সব কারণেই মেটিয়াবুরুজের দরবারী কলাকারদের একটি উল্লেখ্য অংশ ছিলেন বাইজীরা। কিন্তু তাঁদের নাম অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

এখন নবাবের গীত রচনার প্রসঙ্গ। সারা জীবনে ওয়াজিদ আলী অনেক গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু তার পূর্ণ তালিকা অপ্রাপ্য। কারণ নবাবের কোন গীত পুস্তক নেই। তাঁর রচিত কটি বইয়ের অনুবাদ দেওয়া হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। তার মধ্যে আকলীল্ মহলকে লেখা পত্রাবলীর মধ্যে তিনখানি গজল গান আছে। 'রাধা কান্হাইয়াকা এক কিস্সা'তেও আছে ঠুংরি গান। কিন্তু পৃথক কোন গীত সংকলন পুস্তক নবাব প্রকাশ করেননি। তাঁর প্রণীত আরো তিনখানি পুস্তকের নাম শোনা গেছে, কিন্তু, চাক্ষুষ করা যায়নি, যেমন 'নাজু', 'বাজী' ও 'দুল্হন্।' বই তিনটিতে সঙ্গীতের প্রসঙ্গ আছে শোনা যায়। কিন্তু নবাবের কোন গান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা জানা যায়নি। নবাবের নিজস্ব মুদ্রাণালয় ছিল মেটিয়াবুরুজে। তার নাম মতবা-ই-সুলতানী

অর্থাৎ সুলতানের ছাপাখানা। সেখানেই নবাবের অন্য পুস্তকাবলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁর গীতাবলী কেন মুদ্রিত হয়নি তার কারণ অজ্ঞাত।

তবে নবাবের কতকগুলি গান উদ্ধার পেয়েছে। সঙ্গীত জগতের শ্রুতি স্মৃতিতেও বেঁচে আছে তাঁর কটি গান। আর, নবাবের মৃত্যুর অনেক পরে, উর্দু থেকে বাংলা পর্যন্ত বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থেও কিছু প্রকাশিত হয়েছে। সেই সব সূত্রে সংগৃহীত নবাবের রচনা গান দেওয়া হল এখানে—

(১) ধ্রুপদ

শুক্ল বেলাবল—ঝাঁপতাল

শুভ সগন শুভ লগন ছত্র ধরাউঁ
সব মিলি পণ্ডিত লগন ধরাউঁ ॥
নন্দ নন্দন তুম্ যুগ যুগ জীয়ো
এ্যায়সে বড়ো য্যায়সে চন্দ্র মুবারক ॥

(২) ধ্রুপদ

যোগীয়া—চৌতাল

পুর মন ধন মধকা কলাসে
ডগমগাওত গাওয়েঁ চরাওত
কিধণ কুঁয়ার কানা বনোয়ারি
যো গোপী আওত
বাঁশরী চুরাওত
কানা অধর ধারী।

(৩) ঠুংরি

তিলক কামোদ—তেতালা

ম্যয় নীর ভরণ ক্যয়সী যাউঁ সজনী
ডগর চলত মোসেঁ করত রার ॥
চঞ্চল চপল হট মানত নাহি কাহুকি
শুনত নাহি বিনতি করত হার ॥

(৪) ঠুংরি

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা

ডোলেরে যোবন মদমাতি গুজরিয়াঁ,
তেরা সন জোরা মোসেঁ মরালে কটারিয়াঁ ॥
লট পট শোহত কুজ ভবনমে,
পহর কুসুম রঙ্গকিরে চুন্ হরিয়াঁ ॥

(৫) গজল

দোস্ত্ মেরা দিল্‌সে আপনা দিল্ মিলাতে ক্যোঁ নাহি
মৈ তো তেরো দোস্ত্ হৈ তুম্ কাহে নেহ লগা নাহি।
অগর হরদম্ তুম্ দুখ দিল মে লায়ে, ক্যা হো সকতা নাহি,
দুখ অনল কো তুম্ পানি মে ভার দে, পানি মফিক দিল্ হো রহি॥

(৬) ঠুংরি
খাম্বাজ

শাহাজাদে আলম তেরে লিয়ে
ম্যয় তো জঙ্গলা সেহারা বিয়াবানা ফিরে॥
তানা খাকা মালি পাহনি কাকালি
কারা যোফেনাকা সমান ফিরি॥
পুরবা পশ্চিম উত্তরা দক্ষিণ
দিল্লী সহরা মুলতানা ফিরি

(৭) ঠুংরি
লুম্ খাম্বাজ

কেয়া শোচ্ মে হো সওদা কর লে,
জগ্ দো দিন্‌কি হ্যায় বাজরিয়া।
যব্ আওয়ে রবি সুত পাখড় লে চলে গা,
ভুল পড়ে সব নাগরিয়া।
পানি ঘটঘট পড়রস্‌ড়ি টুটি,
এক চঞ্চল নারী ভরে গাগরিয়া।
গুণন গুণন সব পার উতর গয়ে,
ম্যয় নিগুর্ণ ঠাঁড়ে ভাগরিয়া।

(৮) ঠুংরি
পিলু

নদীয়া ধীরে ধীরে বহো,
মোরে সৈয়াঁ উৎরেঙ্গে পার
গহরি নদীয়া নাও পুরাণি
তুম্ হি খেওয়ন হার।

(৯) সাদরা
খাম্বাজ

হম্ বিসর গয়ি আজ আপনে গুণন
তুম দাতা দো জগ্‌কে শিওয়ন হার।
মান ডে মান্‌ডাইয়া ছাওয়ন লাগি
লাখি আখতার পীর ফকির সব হি গুণী সুর মুনি।

(১০) টপ-খেয়াল
ভৈরবী, তেতালা

মদৎ কিজিও মেরে,
তুম্ দাতা দো জগ্‌কে আলী
ওয়ালী এ্যায় শাহ্ মেরি।
হাসান হুসেন নয়ন চয়ন এক তারা,
এত্‌নি আরজ মেরি ॥

(১১) হোরী

কানা লাজ্‌কি গারী সম্‌ঝা কে*ও না দেত।
সসুর হামারি আসিয়া বরবকি
সাস হামারি বারী
কন্থ হামারি ঝোলে*
পালান্‌মে হাম্‌হি ঝোলাউ* হারিয়ে।

(১২) হোরী

আখ্‌তর পিয়ারী সঙ্গ খেলন কো
নুর মঞ্জিল বিচ চলিও রে
রঙ্গ বেরঙ্গ বাদল ছায়ী
আবীর গুলালকো মিলিও রে।

(১৩) ঠুংরি
বহারী

কারি আয়ে বাদরা
এ ননদিয়া রে
আখ্‌তর ছলিয়া করত
নাহি নন্দলাল সঙ্গ ঝগড়া।

(১৪) খেয়াল

আল্‌হাইয়া—জলদ তেতালা

স্থায়ী

ইতনি আরজ মোরী মান লে সেইয়াঁ
মিনতি করহুঁ পড়হুঁ পাইয়াঁ

অন্তরা

হা হা করত হুঁ কর জোড়ত হুঁ
অব না বিসারো আখ্‌তর গোঁসাইয়া

(১৫) খেয়াল

বাহার

স্থায়ী

সে ধে শুভন মইকা বসন্ত্‌
গারোয়া মোল্‌ লে দেরে।

অন্তরা

আখতার পিয়া সে ইঁয়ো যা কহিও
তানিক সা বিরওয়া মোল্‌ লে দেরে ॥

(১৬) খেয়াল

গারা

স্থায়ী

আয়ি ঘিরোন্দা খেল্‌নে রি সাকি
সব সাকি জন সঙ্গ।
রুত শাওন কি এ্যায়সে মন ভায়ি
আখ্‌তার পিয়া নেগ লাগায়ি ॥

তা ছাড়া নবাবের একটি সঙ্গীতের গ্রন্থ আছে। বইখানির নাম 'দুলহন'। তিনি জানিয়েছেন, 'এর নাম দুল্‌হন রেখেছি, ফার্সীতে যার অর্থ কনে।' অর্থাৎ বিবাহের বধূ।

পুস্তকের নামকরণ থেকে কিন্তু তার বিষয়বস্তুর সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। কারণ এটি গীত সংগ্রহ। বিভিন্ন রীতির প্রায় দু'শ গান সংকলিত হয়েছে এই পুস্তকে। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, হোরী, ত্রিবট, তেলেনা, চাঁচর, দাদরা ইত্যাদি। তার মধ্যে দাদরার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি—প্রায় সত্তর। ঠুংরি গান স্থান পেয়েছে পঞ্চাশেরও বেশি। খেয়ালের সংখ্যা সতের আঠারটি। টপ্পা অন্তত দশটি। অবশিষ্ট গান অন্যান্য রীতির।

দুল্‌হনের সমস্ত গীত কিন্তু নবাব রচিত নয়। কতগুলি তাঁর এবং কতগুলি অপরের তা নিরূপণ করাও অসম্ভব। কারণ গানের সঙ্গে রচয়িতাদের নাম উল্লেখ

করা নেই। কিন্তু অন্য গীতিকারদের রচনাও যে পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা বোঝা যায় সেনীয়া ধ্রুপদী প্যার খাঁর দুটি ধ্রুপদ সঙ্গীত থেকে। প্যার খাঁ হলেন তানসেনের পুত্র বংশীয় (বিলাস খাঁর ধারায়) ছজ্জু খাঁর দ্বিতীয় পুত্র—জাফর খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আর বাসৎ খাঁর অগ্রজ।

প্যার খাঁ সেনী রচিত এই দুটি ধ্রুপদের একটি হল নবাবের বহু-বিবাহের কোন একটি উপলক্ষ্যে—

খাম্বাজ, চৌতাল
তখত বখত বলী ওয়াজেদ আলী
শাহেন্‌শাহ্‌কো বিয়াহ্‌ রচো।
জগমগ ভি সব সুপল গাওয়ে সেন
চাওয়ে বনীবনাকো সঙ্গোগ
সুলতানে আলম কি সঙ্গ।

প্যার খাঁর আর একটি ধ্রুপদ রচনা—

ঝিঞ্জোটি, চৌতাল
রাজ রাজ অধিরাজ
আয়ে রুত বনোয়ারি
সেন চাওয়ে গোপী* জিয়ারা
গোপী সরোঁ শুনত আখতরকি।

প্যার খাঁ দুটি গানেই নিজেকে 'সেন' বলে উল্লেখ করেছেন। তানসেনের বংশধরদের 'সেন' দেখা যায় নামের শেষাংশে—শরৎসেন, করিমসেন, অমৃতসেন ইত্যাদি হয়ে হালফিল্‌ নিহালসেন পর্যন্ত।

ওয়াজেদ আলীর সঙ্গে প্যারী খাঁর এই সংযোগ থেকে বোঝা যায় তিনি লক্ষ্ণৌতে নবাবের সমকালীন ছিলেন এবং সম্ভবত তাঁর লক্ষ্ণৌ দরবারের নিযুক্ত কলাবৎ-ও।

নবাবের 'দুলহন' কিতাবে প্যার খাঁর রচনা থাকায় মনে হয়, শ দুয়েক গানের মধ্যে অন্য রচয়িতাদের গীতও আছে। দরবারপতির দৌলতে প্রকাশিত গ্রন্থে সেকালে অপরের রচনা সংগ্রহের রেওয়াজ ছিল। তেমনি আবার জানার উপায় নেই দুলহনে নবাব রচিত কতগুলি গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিংবা কোন্‌ কোন্‌টি তাঁর রচনা। যেসব গানে 'আখতর' ভনিতা আছে, কিংবা তাঁর নুরমঞ্জিল ভবনের নাম পাওয়া যায়, তা নবাবের রচনারূপে ধর্তব্য। সেই সঙ্গে তাঁর প্রেমিক, সৌন্দর্যবিলাসী রসিক কবি-চরিত্র রচনাকার হিসাবে নানা গীতি লক্ষ্যণীয়। এইভাবে অনুধাবন করে নিম্নলিখিত গান কটিও নবাবের গীতাবলী তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হল। তাছাড়াও তাঁর রচনা অবশ্যই থাকতে পারে দুলহন পুস্তকে।

(১৭) খেয়াল
সুরট, জলদ তেতালা
স্থায়ী
বোলন লাগিয়ে কহি* মোর।

অন্তরা

ইত্‌না সন্দেশ মেরা উয়োঁ সন কহিও
তুম্‌ চন্দা হম্‌ চকোর ॥

(১৮) খেয়াল

মিয়াঁ কি মল্‌হার, জলদ তেতালা

স্থায়ী

করক কঙ্গনোয়া মোরা
ছাঁড় দে আঁচরোয়া
শুন ও লঙ্গরোয়া ম্যয় গাড়ি দুঙ্গি
তোহেকো মোরি বহিয়াঁ পকড় ।

অন্তরা

গরজ গরজ বাদর বুদন বরষে
ফুহা করত মোরি আঁখিয়া
লজায়ি* আঁখিয়া লজায়ি* গরোরা লগায়ি*
হামারি বাতিয়াঁ মান লে ॥

(১৯) খেয়াল

খাম্বাজ, জলদ তেতালা

স্থায়ী

মিল গাওরে সন্দেশরা
আবকি ফাগনমে লালন আয়ে ॥

অন্তরা

গহা পুকারত গহা ছোড়ত
গহা মুরত নাকাসেরা ॥

(২০) খেয়াল

সুরট, জলদ তেতালা

স্থায়ী

পিয়া বিন গুজর গেয়ি রয়েন মোহেকো
আজ হো নেহি আয়ে পীতম মোরি ।
মোহে তড়পত বিতি ঘড়ি পল দিন দিন

অন্তরা

উন্‌কো বিয়ান তন মনমে রম্‌ রহো
বিছড়ত নাহি*
মোরি হতচিত শুন্‌
তদ্‌লগ সুন্দর পিয়ারে মোরি
মোহসে তদ্‌হুয়ি মেরি জিয়াক চৈন॥

(২১) ঠুংরি
জলদ তেতালা
স্থায়ী

ননদিয়ারে রাত মালা লে গয়ে

অন্তরা

শুতিথি ম্যয় আপনি মন্দিলমে
সিন্‌নমে কুছ কহা গয়ে ॥

(২২) ঠুংরি
জলদ তেতালা
স্থায়ী

আরে সেইয়াঁ আয় বিদেশরা
চৈৎকা সঙ্গ খেলুঁ
অম্বুরা কি ডালে কোয়েল কুকিঁকুকিরে
আয় পাপিহারা।

(২৩) ঠুংরি
জলদ তেতালা
স্থায়ী

কাহোকা জাগায়ী সারী রাত (রসিয়া) ॥

অন্তরা

সগরী রায়ন মোহে তড়পত বিতি
মোনো জী মানো জী মেরি বাত ॥

(২৪) ঝিঁঝোটি, জলদ তেতালা
স্থায়ী

বংশী শুনি নেহি যায়ে রে
সাঁওলিয়া নে জাদু ডালা
এক ডর হ্যায় মোহে শাস ননদকা
দুঁজে ডর হ্যায় জিয়া বালা ॥

(২৫) ঠুংরি

পিলু, সাত্তারখানী

স্থায়ী

হরি ভরণ দে পানি

রোজ বেরোজ ভঁর যমুনা জল

নিত উঠ সাঁঝ বিহানী ॥

অন্তরা (১)

বরজ কি ছোর ছিছুর কহাওত

টোকত না রবগানী ॥

অন্তরা (২)

তোম্ তো ঠাকুর মথুরা নগর কি

হম্ তোম্‌কো পহ্‌চানী

বনা জগত জানী

না পায়ো লায়ো মাহসুল চুকানী ॥

(২৬) ঠুংরি

জলদ তেতালা

স্থায়ী

ইস্ বংশীওয়ালে সাঁওরিয়ানে

মেরে মন মোহেলিয়া ॥

অন্তরা

চৈনক আচানক ঘর সে নিকলি দেখ্ পড়ী

সুরত মোহন কি

সুধ না রহে কুছ্ আপন তন কি ॥

(২৭) ঠুংরি

ইমন কি মাঞ্জ, জলদ তেতালা

স্থায়ী

নদীয়া কাহেকো বৈরণ ভয়ি

লো সেইয়াঁ রহিও হো পায় ॥

অন্তরা

শুনরে মাল্লাহ্ আরে ছুরারে

নাইয়া লগা দে মোরি পার

হাথ কি দুঙ্গি কঙ্গনা

আওর গলে কি হার ॥

দেখা গেল, ঠুংরির মধ্যেও নবাব স্থায়ী ও অন্তরা কলির ভাগ করেছেন। একটি গানে দুটি অন্তরাও আছে। ঠুংরী গানে তালের নামও দিয়েছেন। আবার কোনটির রাগ নামও উল্লিখিত। 'ইমন কি মাঞ্জ' রাগ প্রকারটি লক্ষ্যণীয়, এটি ক্বচিৎ শ্রুত। একটি গানে 'সাত্তারখানি' তাল নির্দেশ করেছেন নবাব। 'সেতারখানি' নামে একটি তাল প্রচলিত আছে। প্রকৃত কথাটি কি হবে 'সাত্তারখানী'? সাত্তার খাঁ নামে কোন তবলিয়ার প্রচলিত এই তাল? নবাবের নির্দেশিত 'সাত্তারখানী' হয়ত পরে 'সেতারখানি' রূপে বিকৃত হয়েছে।

তাঁর কয়েকটি দাদরা এখানে উৎকলিত হল 'দুল্‌হন' থেকে।

(২৮) দাদরা

হিলমিল পানিয়া কো যায়ে রে ননদিয়া
গাগরী ম্যয় ছোড় আয়ী কুয়ে* কি জগৎপর
পাৎলে কোমর বল খায়ীরে ননদিয়া ॥

(২৯) দাদরা

রাত বালম হাম্‌ সে লড়ে হ্যাঁয়
হামসে লড়ে সারী জগসে ভুলী হ্যাঁয়
না ম্যায় বোলী না ম্যায় চালী
শুনি শেজড়িয়া একেলি পড়ী হ্যাঁয়।

(৩০) দাদরা

আঁঠুই বরষ চাতুরায়ি আয়ি* থোড়ি
নওয়ি* বরষ তিরিয়া মান করে বাস কি।
দশারি বরষ তিরিয়া ভয়ি এক রস কি
গেয়ারা হুঁয়ি বরষ যোবনমে জরা কসাকি।
বারহুঁয়ি বরষমে শিঙ্গার সব সাধকি
তীর মারে যায়ে তিরিয়া তেরহুঁয়ি* বরষ কি ॥

(৩১) হোরী

কানা লাজ কি গারী সমুঝা কেঁউ না দেত।
শশুর হামারি আশিয়া বরষ কি
শাশ্‌ হামারি বারী
কন্থ হামারি ঝোলে*
পালানুমে হাম্‌হি ঝোলাউঁ* হারিয়ে ॥

নবাব রচিত এই গীতাবলীর মধ্যে ধ্রুপদ, খেয়াল অঙ্গে কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনা দেখা যায়। তাঁর ঠুংরি ত উত্তম, লক্ষ্ণৌ নবাবীর সময় এবং সেখান থেকে বিদায় নেবার প্রাক্‌কালেও সে গুণের পরিচয় দিয়েছেন স্মরণীয় ভাবে। মেটিয়াবুরুজে

তাঁর পরিণত বয়সেও তার নিদর্শন পাওয়া গেল।

গানগুলিতে নবাবের গীত রচয়িতা এবং কবি সত্তা প্রকাশ পেয়েছে অংগাংগী-ভাবে। একাধারে তাঁর গীতিকার ও সুরকাররূপে সাক্ষ্য স্বরূপ এই গীতাবলী।

'দুল্‌হন' পুস্তকটি মেটিয়াবুরুজে ১২৯০ হিজরীতে মুদ্রিত। নবাবের কলকাতায় আগমনের পরে। বোঝা যায়, এ পুস্তকের গানগুলি মেটিয়াবুরুজে বাসকালে ওই সালের কিছু পূর্বে রচিত। আর এখানে তাঁর সংগীতের দরবারে যে নিত্য আসর বসত, সেখানেও তার কোন কোনটি পরিবেশিত হয়, এমন অনুমানও করা চলে।

নবাবের রচনা গানের ভাষায় উর্দু শব্দ খুবই কম। দেশী ভাষাই তিনি ব্যবহার করেছেন, ব্রজভাষার সংগে প্রাদেশিক ভাষার মিশ্রণে।

গীতিকার, কবি, সুরকার, নাট্যকার, সঙ্গীত শিল্পী, গুণী পোষক দরবারপতি। কলকাতায় পরিণত বয়সেও নবাবের জীবন এই ভাবে অতিবাহিত হতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়মের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার পর, ১৮৫৮ থেকে। সরকারের বৃত্তিভোগী, জীবনের শেষ ত্রিশ বছর মেটিয়াবুরুজে নিয়মিত বাসকালে। এই পর্বে ওয়াজিদ আলী মেটিয়াবুরুজ ও কলকাতার বাইরে কোথাও যাননি, গঙ্গাপারে শিবপুরের বটানিকাল গার্ডেন ভিন্ন। উপকণ্ঠ মুচিখোলার বেগম বাইজী দরবার পরিবার পরিজনদের নিয়ে সাধ্যমত সাড়ম্বরে নবাবী করেছেন। কসরুল বায়জা, নুর মঞ্জিল ইত্যাদি ইমারতে চিহ্নিত এলাকায় তাঁর নির্বাসিত জীবনের প্রধান বিচরণক্ষেত্রে। কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় এবং বাঙালী সমাজে তিনি কথিত হতে লাগলেন

'মেটিয়াবুরুজের নবাব' নামে। লক্ষ্ণৌ কিংবা উত্তরপ্রদেশের লোকমুখে তখনো তাঁর পরিচয় 'আউধের নবাব' বলে।

কলকাতার সংগীত সমাজে মেটিয়াবুরুজ দরবারের নামডাক ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর ভারতের এত নামী ওস্তাদ, গায়ক বাদক রয়েছেন মেটিয়াবুরুজে। এ সংবাদ প্রচারিত হয় কলকাতার সংগীতজ্ঞ, শিক্ষার্থী এবং সংগীত প্রিয় মহলে। কোন সুযোগ বা উপলক্ষ্যে বাঙালী গুণী, শিক্ষাপ্রয়াসী ও বিশিষ্ট শ্রোতাদেরও মেটিয়াবুরুজে আসা যাওয়া শুরু হয়। তেমনি নবাবের কোন কোন দরবারী কলাবতেরও যোগাযোগ ঘটে কলকাতার সংগীত সমাজে।

তখনকার সংগীতসমাজে অন্যতম প্রধান যুগপুরুষ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। তাঁর পাথুরিয়াঘাটা দরবারও উত্তর ভারতীয় নানা কলাকারের সমাবেশে বিশিষ্ট। সৌরীন্দ্রমোহনের আনুকুল্যে, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রমুখের উদ্‌যোগে পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে যে সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলন হয় ১৮৬৭ সালে, সেখানেও যোগ দেন মেটিয়াবুরুজ দরবারের কোন কোন কলাবৎ। সেই সম্মেলনের সূত্রে পরের বছর ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত 'সংগীতসার' তত্ত্ব গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ভারতীয় সংগীত পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথম প্রকাশিত এই পুস্তকে প্রশংসাপত্র দেন সেনীয়া ধ্রুপদী রবাবী বাসৎ খাঁ এবং খেয়াল গুণী আহম্মদ খাঁ। তাঁরা দুজনেই সম্মেলনের সময়ে নবাব দরবারে নিযুক্ত ছিলেন এবং মেটিয়াবুরুজ নিবাসীও।

বাসৎ খাঁ ও আহম্মদ খাঁ এইভাবে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তেমনি নবাবের দুজন দরবারী খেয়ালীয়া আনসাদদৌলা ও মস্তাকিনদৌলা, শানাইবাদক প্যারে খাঁ এবং কোন কোন গায়িকাও অংশ নেন রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের আসরে। তাঁর ভবানীপুর গৃহের সাপ্তাহিক জলসায়।

আবার বাংলার উদীয়মান খেয়াল গায়ক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেটিয়াবুরুজের একাধিক ওস্তাদের তালিম পান। যথা—দিকপাল খেয়াল গুণী আলী বখ্‌স্‌ এবং টপ্পাবাজ খেয়ালীয়া আহম্মদ খাঁ।

ওয়াজিদ আলীর কোন কোন দরবারী কলাবৎ নিযুক্ত হন অন্যান্য সঙ্গীতসভায়। যেমন, বাসৎ খাঁ যান রানাঘাটে পাল চৌধুরীদের দরবারে। ধ্রুপদ-গুণী মুরাদ আলী মজিলপুর দত্ত বাড়ির সঙ্গীতাসরে। আরেক নেতৃস্থানীয় সেনীয়া ধ্রুপদী তাজ খাঁ নেপালের রাণা দরবারে। তানসেন বংশের স্বনামধন্য রবাবী-বীণ্‌কার কাসিম আলী খাঁ পঞ্চকোটরাজ ও ভাওয়াল-রাজ দরবারে। তাঁরা সবাই নবাবের জীবিত কালেই মেটিয়াবুরুজ দরবার ত্যাগ করে ওইসব সঙ্গীতসভায় চলে গিয়েছিলেন। তবে নবাব তাঁদের বাংলায় আনার ফলেই তাঁরা যোগ দিতে পারেন ওইসব আসরে।

বিপরীত ভাবেও বাংলার সঙ্গীতজগতের সঙ্গে মেটিয়াবুরুজের সংযোগ ঘটে। তা হল, নবাব দরবারে বাঙ্গালী গুণীদের সংগীত পরিবেশন। কসরুল বায়জার সেই ডিম্বাকৃতি জলসাঘরে কলাকার পরিবৃত নবাব শোনেন যদু ভট্টের ধ্রুপদ, কেশব মিত্রের পাখোয়াজ, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরবাহার, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেয়াল। সেই বাঙালী বালকদের নবাব দস্তুরমত তারিফ করেছিলেন। সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের সংগীতসভা থেকেও কোন কোন গায়ক গান গেয়েছিলেন ওয়াজিদ

আলীর সামনে, মেটিয়াবুরুজে। তাঁদের নাম অজ্ঞাত। তবে নবাব তাঁদের গান শুনে খুশি হয়েছিলেন বলে প্রকাশ।

দরবার আর সংগীতের সূত্রেই ওয়াজিদ আলীর সংগে বাঙালীদের যোগাযোগ। আর গুণীজনের অন্তরঙ্গ হয়ে থাকেন তিনি স্বয়ং। গায়ক রূপে নর্তক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সমঝদারদের সভয়ে অভিমানশূন্য নন্দন-চিত্ত।

একদিন সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আসর থেকে কজন গায়ক এলেন মেটিয়াবুরুজে। দরবারে তাদের গান শুনে নবাব প্রীতিলাভ করলেন।

সন্তুষ্ট চিত্তে বললেন, 'আমি বড় খুশি হয়েছি। এখন ফরমায়েশ করুন, কি করে আপনাদের খাতির জানাতে পারি।'

নবাবের বিনয় দেখে অতিথিরা মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করলেন, 'নবাব বাহাদুর, মাফ করুন। আমরা আর কিছু পুরস্কার চাই না। শুধু যদি মেহেরবানি করে আপনি স্বয়ং একটি ঠুংরি গেয়ে শোনান, আমরা কৃতার্থ হব!'

সেদিন ওয়াজিদ আলী শাহ্ তাঁদের প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন কিছুক্ষণ পরে। একখানি স্বরচিত ঠুংরি গেয়েছিলেন। কিন্তু বাইজীর সাজে সজ্জিত হয়ে। দরবারী নর্তকীর পেশোয়াজ, ওড়নি পরিধানে আর নানা আভরণে ভূষিত, বাইজীর ঢঙেই গানখানি শুনিয়েছিলেন। আর সেই সঙ্গে হাতের মুদ্রায়, চোখ মুখের হাবভাবে নিপুণা নটীর মতন ভাও বাৎলানো পর্যন্ত। নায়িকা ভাবের মনোরম ঠুংরিটি নবাব রূপায়িত করেন রমণীর বেশে।

নৃত্যের চর্চা প্রথম জীবনে লক্ষ্ণৌতে রীতিমত করতেন। আর তা বজায় রাখেন পরিণত বয়সেও।

বাগবাজারে নন্দ বসুদের ভবনে একদিন সে গুণেরও পরিচয় দেন নবাব— 'নৃত্যরসিকদের মুখে শুনেছি, তাঁকে একদিন বাগবাজারের পশুপতি বসু নিমন্ত্রণ করেছিলেন দোলের রাত্রে। গান বাজনার পর সকলের অনুরোধে নবাবের নৃত্য হল পুরো ঘরভরা আবিরের উপর বিছানো মসলিনের উপর। মসলিন তুলে নিলে দেখা গেল রাধাকৃষ্ণের যুগল ছবি অঙ্কিত হয়েছে—স্থূল শরীর থাকা সত্ত্বেও পায়ের আঙ্গুলের এত সূক্ষ্ম কাজ সম্ভব হয়েছিল।··· ··গংগা পার হয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনসে বহু সংখ্যক উর্দিপরা দেহরক্ষী নিয়ে তখনকার কালের কারুকার্যখচিত প্রশস্ত রিক্শাতে তিনি ঘুরে বেড়াতেন আর বাঙ্গালীদের সাথে গল্প, আলাপ করতেন।' (অতুল প্রসাদ, পৃঃ ১১—বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত)।

নবাবের অসামান্য নৃত্য পটুতার পরিচয় একদিন যোশীবুয়াও পেয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রের স্বনাম প্রসিদ্ধ খেয়াল গুণী যোশীবুয়া। সেবার তিনি নেপাল দরবারে যাবার পথে এসেছিলেন কলকাতায়। তখন মেটিয়াবুরুজ দরবারের নৃত্য দেখেন আর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

উপরে উৎকলিত অংশে যে 'কারুকার্যখচিত প্রশস্ত রিক্শা'টির কথা আছে, তা তাঁর নিজস্ব যান। জাপানী ধরনের সে গাড়ি, ছ জনে টানা। সেই যানে তাঁকে মাঝে মাঝে মেটিয়াবুরুজ থেকে নির্গত হতে দেখা যেত। বটানিক্যাল গার্ডেনে যেমন, তেমনি কলকাতায় একাধিক অঞ্চলে কখনো কোন উপলক্ষ্যে, পথে। কখনো কোন গৃহাসরে, দক্ষিণ ও উত্তর কলকাতায়। কখনো বড়বাজারের একটি বিশিষ্ট জহুরীর

ভবনে। কখনো আলীপুর পশুপক্ষীশালায়।

চিড়িয়াখানার দর্শক রূপে তিনি আলীপুরে আসতেন। নবাবের পশুপাখীর শখ সুবিদিত। তাঁর নিজস্ব চিড়িয়াখানাও পত্তন করেছিলেন মেটিয়াবুরুজে। সেই প্রীতিতে তিনি সরকারী চিড়িয়াখানায় হাজির হতেন সেই সুদৃশ্য রিকশায় বাহিত হয়ে।

জুলজিক্যালে গার্ডেনের সুপারিনটেন্ডেণ্ট তখন রামব্রহ্ম সান্যাল। একদিন নবাব তাঁর যানে দেহরক্ষীদল নিয়ে উপস্থিত। তাঁকে রিকশা সমেত সান্যাল মহাশয় বাগানের মধ্যে নিয়ে গেলেন খাতির দেখিয়ে। যানে বসেই নবাব ঘুরে ঘুরে জীব-জন্তুদের দেখে যেতে লাগলেন। সংগে সংগে চলেছেন রামব্রহ্ম সান্যাল পদব্রজে।

খানিক পরে নবাব তাঁকে বললেন, 'আপনি পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আর আমি রিকশায়—এ আমার কেমন লাগছে।'

রামব্রহ্ম বিনয় প্রকাশ করে উত্তর দিলেন, 'এই তো স্বাভাবিক। আপনি নবাব, আপনি যাবেন গাড়িতে। আর আমি হেঁটে যাব, কারণ আমি তো প্রজা।

ওয়াজিদ আলী তারিফ করে বললেন, 'আপ, শেরিফজাদা।'

অর্থাৎ 'আপনি সুভদ্র।'

দুর্গাপুজার বিসর্জন উৎসব দেখতেও নবাব যেতেন কলকাতায়। তার একটি স্মৃতিচিত্র নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বর্ণনায় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের সুহৃদ, সমবয়সী নগেন্দ্রনাথ একাধারে কবি, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, ইংরেজী ও বাংলায় প্রসিদ্ধ সাংবাদিক। লাহোরের 'ট্রিবিউন' ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকার সম্পাদক রূপে সর্বভারতীয় খ্যাতি ছিল তাঁর। নগেন্দ্রনাথের নবাব সম্পর্কে স্মৃতিচারণ অংশটি এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হল—

'পরে আমি ওয়াজিদ আলী শাহকে একবার কলকাতায় দেখি। সেটি দুর্গা-পুজার শেষ দিন এবং ভূতপূর্ব রাজা তাঁর নেপথ্যলোক থেকে বাইরে এসেছিলেন প্রতিমাগুলির বিসর্জন দেওয়া দেখতে। যখন তিনি প্রকাণ্ড একটা ফিটন গাড়িতে বসেছিলেন আর গাড়িটা আস্তে আস্তে চলছিল, তখন আমি তাঁকে ভাল করে দেখেছিলুম। তাঁর দুই পাশে ছিল দেহরক্ষী একদল সাধারণ ঘোড়সওয়ার সেপাই। ওয়াজিদ আলী শাহ নির্বিকার চিত্তে গড়গড়ায় ধূমপান করছিলেন। তাঁর পিছনের আসনে গড়গড়া ধরে বসেছিল তাঁর হুঁকাবরদার। রাজ্যহারা রাজা বৃদ্ধ হলেও শরীর বেশ ভালই রেখেছিলেন—পাকা আমের মত তিনি তপ্ত গৌরবর্ণ (একটি চমৎকার বাংলা বাক্যরীতি অনুসারে)। গৌরবচ্যুত নৃপতির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হতে লাগল ভাগ্যচক্রের কথা।' (Reminiscences and Recollections P 3 -41 Nagendra Nath Gupta)।

হিন্দুদের দুর্গা প্রতিমার ভাসান উৎসব দেখতে নবাব যেমন ভালবাসতেন, তেমনি আরো কোন কোন পর্বের অনুষ্ঠানও তাঁর প্রিয় ছিল। যেমন হোলি উৎসব ও রাসলীলা। কৃষ্ণ রাধার রাস অবলম্বনে নবাব গীতিনাট্য অভিনয় করেন মেটিয়াবুরুজ দরবারে। তাঁর ভাষায় রাসের রূপ দাঁড়িয়েছিল 'রহস।' নিজের পরিচালিত নৃত্যগীতের 'রহস' পালায় নবাব অযোধ্যারাজের সেই বহুমূল্য মুকুট-শোভন হয়ে কৃষ্ণের ভূমিকায় দেখা দিতেন। যেমন 'ইন্দ্রসভা'র অভিনয়ে তিনি ইন্দ্র রূপে অবতীর্ণ

হতেন লক্ষ্ণৌ নবাবের সেই হীরা মুক্তা খচিত মুকুট শিরোধার্য করে।

পশুপতি বসুদের ভবনে হোলি উপলক্ষ্যে তাঁর নৃত্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মেটিয়াবুরুজেও তিনি হোলির উৎসব করতেন বর্ণাঢ্য আড়ম্বরে। বেগম প্রভৃতিদের সংগে আবীর গুলাল রঙ্ খেলায় মেতে উঠতেন। কবি-গীতিকার রূপেও তিনি এ উৎসবের অন্তরঙ্গ বর্ণনাকারী। হোলির বিষয়বস্তু দেখা গেছে তাঁর রচিত একাধিক ঠুংরি গানেও। যেমন একটি—'পাও লাগাও কর জোড়ি মোসে খেলো না হোরি'—রাধা অনুনয় করছেন কৃষ্ণকে।

প্রিয় হোলির আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নবাব রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের আসরেও সমাগত হতেন। ভবানীপুরে রূপচাঁদের সেই চড়কডাঙ্গার আবাসে। কালীঘাট রোড যেখানে উত্তরমুখে হরিশ মুখুজ্যে রোড পার হয়ে ট্রাম রাস্তার দিকে ঘুরে গেছে, সেকালে সেই অঞ্চলটির নাম চড়কডাংগা। সেখানে কালীঘাট রোডের সংযোগস্থলে গলিটি 'রূপচাঁদ মুখার্জী লেন' নামে আজও বর্তমান। সেই গলির এই মুখে উত্তর ও দক্ষিণ দিক জুড়ে রূপচাঁদের বিশাল ভবনের চত্বর ছিল। এখনো তো দেখা যায় রূপান্তরিত ও খণ্ডিত আকারে। সে আমলের শিবমন্দিরটি এবং তোরণের আকার লোপ পায়নি আজও। সেদিন রূপচাঁদের গৃহ এলাকার সামনে সমস্ত চড়কডাংগা পথটি (এখনকার কালীঘাট রোড) হোলির ফাগ ও রঙ্ খেলায় লোহিত বর্ণ ধারণ করত। সে পথের সব পথিকদের সেদিন রূপচাঁদ ভবনে আনা হত সাদর আহ্বান করে। উৎসবের অংগরূপে মিষ্টিমুখ করানো হত।

আর একেকবার সম্মানিত অতিথিরূপে আসতেন ওয়াজিদ আলী। গৃহস্বামী তাঁকে উপযুক্ত খাতির আপ্যায়ন করতেন। নবাবও যোগ দিতেন সদর মহলের উৎসবে। হোলি খেলতেন সুগন্ধী আবির আর পিচকারি হাতে। রঙ্ খেলার পরে নবাব গোলাপ জলের ফোয়ারায় স্নান করতেন, যা তাঁরই জন্যে রূপচাঁদের প্রস্তুত করা।

সে রাত্রে সংগীতের বিরাট আসর বসত তোষাখানায়, তোরণ দ্বারের দক্ষিণে। রূপচাঁদের আমন্ত্রিত গুণীরা নবাবকে মধ্যমণি করে নিশিজাগর অনুষ্ঠান করতেন।

রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিশেষ সংগীতপ্রেমী, সৌখীন, মজলিশী এবং সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর শনি ও রবিবারের সাপ্তাহিক আসর সংগীতপ্রিয় সমাজে খুবই সুখ্যাত ছিল। নানা প্রসিদ্ধ বাঙালী এবং পশ্চিমাঞ্চলের গুণীও যোগ দিতেন সে আসরে। যদুভট্টের ধ্রুপদ এবং কেশব মিত্রের পাখোয়াজ সেখানে কয়েকবারই শোনা গেছে। তেমনি গান বাজনা করেছেন মেটিয়াবুরুজের দরবারী কলাবৎ তথা বাইজীরাও। রূপচাঁদের আসরেই একদিন যদুভট্টের গান শুনে এক বাইজী মুগ্ধ হয়ে যান। তাঁর মুখেই নবাব শোনেন যদুভট্টের গুণপনার কথা। তারপর যদু ভট্টকে মেটিয়াবুরুজ দরবারে আমন্ত্রণ জানান।

নবাবের সঙ্গে রূপচাঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল কর্মসূত্রে। আলীপুর কালেক্টোরেটে রূপচাঁদের দায়িত্বপূর্ণ পদ। ফার্সী ভাষায়ও বিশেষ অভিজ্ঞ তিনি। ওয়াজিদ আলীকে বারো লক্ষ টাকা সরকারী বৃত্তি রূপচাঁদের মারফৎ প্রদত্ত হ'ত। সেই সুবাদে তাঁর দীর্ঘকালীন যোগাযোগ থাকে নবাবের সঙ্গে। আর সঙ্গীতপ্রেম

উচ্চমানের আসর, হোলি উৎসব ইত্যাদির জন্যে তাঁদের হৃদ্য সম্পর্কও গড়ে ওঠে। তার ফলে রূপচাঁদের আসরে দরবারী কলাকার ও বাইজীদেরও যোগদানে সম্মতি দিতেন নবাব। রূপচাঁদের জলসাঘর কলকাতার একটি শ্রেষ্ঠ আসর হয়ে ওঠে।

কলকাতার আরেকটি সঙ্গীতপ্রেমী, অভিজাত, সংস্কৃতিবান পরিবারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয় ওয়াজিদ আলীর। শোভাবাজার রাজবাড়ি নামে সুপরিচিত দেব পরিবার। রূপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব প্রমুখ নবকৃষ্ণের কোন কোন বংশধর মেটিয়াবুরুজে নবাবের সঙ্গে মিলিত হতেন। তার কিছু শ্রুতিস্মৃতি কথা জানা যায় পরবর্তী যুগের দেববংশীয় মনস্বী হারীতকৃষ্ণ দেবের সূত্রে।

সেকালের তেমনি একটি নবাবী প্রসঙ্গ। একদিন রূপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব মেটিয়াবুরুজে এসেছেন। নবাবের সঙ্গ করছেন তাঁর মঞ্জিলে। আতরের খসবুতে সুরভিত সান্নিধ্য। নকশাদার দেয়ালগিরিতে জ্বলন্ত বাতির সারি।

তখন পৌষ মাসের শীত। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। রূপেন্দ্রকৃষ্ণ আশ্চর্য বোধ করলেন নবাবের জামাটি লক্ষ্য করে। সুদৃশ্য কারুশোভন বলে নয়, কিন্তু কি সূক্ষ্ম। এমন মিহি পরিধান এত শীতের রাতে। আর দ্বিতীয় অন্তর্বাস নবাবের গায়ে নেই তা বোঝা যায় তাঁর গৌর অঙ্গের আভাসে।

দেব মহাশয় নিজের বিস্ময় প্রকাশ করলেন নবাবের কাছে, 'এই ঠাণ্ডায় আপনার এত পাতলা জামা—শীত করছে না, নবাব সাহেব?'

ওয়াজিদ আলী মৃদু হেসে জবাব দিলেন, 'না। কারণ আমার মুখে এই পান রয়েছে।'

বলে, নিজের তাম্বুল-চর্বণ ইঙ্গিতে দেখালেন।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি একটি পান খাবেন?'

রত্ন-খচিত তাম্বুলধার অতিথির দিকে মেলে ধরলেন খাতির করে। রূপেন্দ্রকৃষ্ণ সুগন্ধি একটি পান তুলে নিলেন। মুখে দিতে চমৎকৃত বোধ করলেন অপূর্ব আস্বাদে। জর্দা নয়, মসল্লার মধ্যেই দুর্লভ বিশেষত্ব।

তিনি ধন্যবাদ জানালেন নবাবকে। সুস্বাদু চর্বের প্রশংসা করলেন।

নবাব আর কিছু বললেন না এ সম্পর্কে। আবার তাঁদের কথাবার্তা চলতে লাগল।

খানিক পরে দেব মহাশয়ের বিদায় নেবার সময় হল। গাত্রোত্থানের আগে নবাবকে পুনরায় ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, 'পানের স্বাদ আরেকবার পেতে ইচ্ছে করছে। আরেকটি খাওয়ান।'

কিন্তু নবাব একটু আপত্তি জানালেন, 'আর না খেলেই ভাল হত আপনার পক্ষে। সহ্য করতে পারবেন না।'

রূপেন্দ্র বললেন, 'এই তো একটা খেলুম। কি আর হবে?'

নবাব আর কিছু না বলে তাম্বুলাধারটি এগিয়ে দিলেন। পান মুখে দিয়ে উঠে পড়লেন অতিথি।

তারপর ঘোড়ার গাড়িতে মেটিয়াবুরুজ থেকে যাত্রা করলেন।

কোচওয়ান গাড়ি হাঁকাতে লাগল সেই শীতের রাতে। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া

ভেতরে আসছে। কিন্তু জানলা খুলে দিলেন দেব মহাশয়। বড় গরম বোধ হচ্ছে। আলোয়ান খুলে ফেললেন গা থেকে। তবুও ঠাণ্ডা লাগছে না। ক্রমে গরম অসহ্য হয়ে উঠল। আর থাকতে পারলেন না গাড়ির মধ্যে।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চালককে বললেন, 'রোকো, রোকো।'

গাড়ি থামলে, তিনি বেরিয়ে গিয়ে কোচওয়ানের পাশের জায়গায় বসলেন। হত-চকিত চালককে হুকুম দিলেন, 'আভি চালাও।'

একেবারে খোলা ঠাণ্ডায় বসে তবে সুস্থবোধ করলেন। এতক্ষণে তিনি বুঝতে পেরেছেন, ওয়াজিদ আলীর সতর্কবাণীর তাৎপর্য। আর লক্ষ্ণৌয়ি পান-মসল্লার তাকৎ।

আবার অন্য সূত্রে ভেসে আসে নবাবী মেজাজ মর্জির একেকটা খোশখবর।

একদিন তিনি কসরুল বায়জার একটি কক্ষে রয়েছেন। হঠাৎ একটি বেলোয়ারি ঝাড় খসে পড়ল কাঠ থেকে। মেঝেতে পড়েই ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে চূর্ণ হয়ে গেল।

নবাব মুগ্ধ হলেন সেই ধ্বনি ব্যঞ্জনায়। মনে মনে তারিফ করলেন।

'বড়ি মিঠি আওয়াজ হুয়ি থি,' বলে পুনরায় শুনতে চাইলেন সেই শব্দতরঙ্গ। খিদ্‌মদ্‌গারদের ফরমায়েশ করলেন, 'ঔর একঠো তোড়ো।'

অমনি আরেকটি ঝাড় লণ্ঠনের শিকলি কেটে দেওয়া হল। বেলোয়ারি বাতিদানগুলি ভূপাতিত হল ঝনন্‌ ঝনন্‌ নিক্কণে।

লক্ষ্ণৌর ভূতপূর্ব নবাব মাথা দুলিয়ে খুশি হয়ে শুনলেন।

তাঁর ঘড়িরও শখ ছিল খুব। নাচ গান বাজনা আর কোন বিলাসিতারই কাছাকাছি। নুর মঞ্জিল আর দরবারের ঘড়ির সংখ্যা পঞ্চাশটিরও বেশি। বিভিন্ন আকার প্রকার তাদের। নানা ছাঁদের আওয়াজ। নবাব সেই সব বিচিত্র শব্দ সম্ভার কোন কোন ঘণ্টায় শোনেন। ভারি ভাল লাগে রকমারি ধ্বনি। আবার সমস্ত ঘড়ি রবিবার বেলা বারোটায় বাজিয়ে দেওয়া হত একসঙ্গে। নবাব শুনে যেতেন। নানা স্বরের সে এক ঐক্যতান বাদন যেন। কোনটির চড়া শব্দ টাঙ্‌টাঙ্‌। কোনটি খাদে বাজে। কোনটির রিন্‌রিন্‌ ধ্বনি। কোনটি গম্ভীর। কারুর অতি মিহি সুর। কারুর ঢঙ্‌ ঢঙ্‌ মোটা আওয়াজ। কোনটি বা কোন নটীর ঘুঙুরের মতন মিষ্টি, ঠিন্‌ঠিন্‌ ঝিন্‌ঝিন্‌। ঘুরে ঘুরে খুস্‌ মেজাজে ঘড়ির বাজনা শ্রবণরত নবাব।

ওয়াজিদ আলীর বিলাস জীবন তথা নির্বাসিত জীবন বাংলার বিদগ্ধ সমাজেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। তার স্বাক্ষর থেকে যায় বাংলা সাহিত্যেও।

নবাব ফোর্ট উইলিয়ম থেকে মুক্তি পাবার পনর ষোল বছর পরের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' তখন সগৌরবে প্রকাশিত হচ্ছে। তার 'কমলাকান্ত' পর্যায়ে একটি নিবন্ধ বেরুল ১২৮০, ফাল্গুন সংখ্যায়। শিরোনাম 'চন্দ্রালোকে।' এটি কিন্তু বঙ্কিমের রচনা নয়। লেখক হলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। 'বঙ্গদর্শন' এবং বঙ্কিম-গোষ্ঠীর অন্যতম প্রবন্ধকার তিনি, পরবর্তীকালের 'সাধারণী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। 'চন্দ্রালোকে লেখাটি বঙ্কিমচন্দ্রর 'কমলাকান্ত' গ্রন্থেও স্থান পায় ১২৯২ সালে। ওয়াজিদ আলী তখনো মেটিয়াবুরুজে বিদ্যমান, মৃত্যুর আগের বছরে।

কমলাকান্তের জবানীতে লক্ষ্ণৌ নবাবের ভীরুতাকে কটাক্ষ করা হয়। আর শ্রদ্ধা জানানো হয় তাঁর বেগম হজরৎ মহলকে—যিনি মহাবিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন সিপাহীপক্ষে। তারপর বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে নানাসাহেবের মতন নেপালে আশ্রয় নেন। 'চন্দ্রালোকে'র সেই অংশ বিশেষ—'আমাদিগের মতে চন্দ্র হি, ইংরাজী মতে চন্দ্র শী। এখন উপায়? হি কি শী, তাহা স্থির হইবে কি প্রকারে? ··আমার এই বিষয়ে নানা সন্দেহ হয়। যে ওয়াজিদ আলী শাহ লক্ষ্ণৌ নগরী হইতে স্বচ্ছন্দে চতুর্দোলারোহণে মুচিখোলায় আগমন করিয়া, হংসহংসী কপোত কপোতী লইয়া ক্রীড়া করেন, গোলাপ সহিত বারি হ্রদে নিত্য স্নান করিয়া স্বীয়ানুরূপী পিঞ্জরস্থ বুলবুলিকে সঘৃত পলান্ন প্রদান করেন, তিনি হি না শী? এবং যে মহিষী দেশ বাৎসল্যে ঐহিক সুখ সম্পত্তি বিসর্জন করিয়া—রাজপুরুষগণের শরণাপেক্ষা ভিক্ষান্ন শ্রেয়ঃ বোধে, নেপালের পার্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি শী না হি?'

কলকাতায় যে বাঙালীদের সঙ্গে নবাবের আলাপ পরিচয় হয়েছিল তাঁরা অবশ্য তাঁর এমন সমালোচক হননি। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ সঙ্গীতের সূত্রে। তাই তিনি সম্মানিত ছিলেন নান্দনিক যোগ্যতায়। দরাজ গুণীজন পালক দরবার-পতি রূপেও। কলকাতা তথা বাংলার রাগসংগীতচর্চায় তার দরবারের প্রভাব ঐতিহাসিক হয়ে থাকে। বিশেষ ঠুংরির প্রচলনে সহায়তা করে নবাবের দৃষ্টান্ত। তাই এখানে সঙ্গীতসমাজের সঙ্গেই তিনি যুক্ত থেকে যান। আর মেটিয়াবুরুজ হয়ে ওঠে যেন বাংলারই এক সঙ্গীতকেন্দ্র। ওয়াজিদ আলী স্মরণীয় থাকেন মেটিয়াবুরুজের সাঙ্গীতিক সম্পর্কেই। বাঙালী সমাজে তাঁর রাজনৈতিক জীবন সচরাচর আলোচ্য ছিল না। আর কলকাতার যে ক'টি বাঙালীগৃহে নবাবের যাতায়াত ছিল, সবই তাঁর সাঙ্গীতিক পরিচয়ে। তার বাইরে কটি দর্শনীয় স্থানে তাঁকে কখনো কখনো দেখা যেত। যেমন বটানিক্যাল তথা জুলজিক্যাল গার্ডেনে। তাঁর সেই ছয় বাহকে টানা সুদৃশ্য প্রশস্ত রিকশাটিতে। চিত্রবৎ 'নির্বিকার চিত্তে' গড়গড়ায় ধূমপানরত।

শোনা যায়, কেবল একটি বাড়িতে তাঁকে যেতে হ'ত যা সঙ্গীতের সংস্রবহীন। বড়বাজারের এক নামী জহুরীর আস্তানায়। নিজস্ব সেই যানে নবাব সেখানে মাঝে মাঝে যান। মেটিয়াবুরুজের সোনাই বাজার পার হয়ে সদর পথে খিদিরপুর। তারপর বরাবর ধর্মতলা অতিক্রম করে চিৎপুরের রাস্তা। খানিক পরে বড় মসজিদ পার হয়ে বাঁ দিকের সড়কে। জহুরীর বাড়িটিও সে পথের বাঁ দিকে, উত্তরমুখী।

শকট থেকে নেমে নবাব প্রবেশ করেন সেই বাড়িতে। সঙ্গে থাকে রেশমী রুমালে বাঁধা কিছু মুক্তা জহরৎ। জহুরীর সঙ্গে তার নিরালায় সাক্ষাৎ হয়। শিষ্টাচার বিনিময়ের পর কাগজী মুদ্রা হস্তান্তরিত হয়ে আসে মণি-মাণিক্যের বদলে। নবাবকে বহন করে যানটি পুনরায় মেটিয়াবুরুজে ফিরে যায়।

কোন কর্মচারীকে নবাব ন্যস্ত করতেন না এ দায়িত্বটি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রত্ন-দৌলতের মায়া তাঁকে ত্যাগ করতে হ'ত। কারণ সরকারী বৃত্তি ছিল বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মাসে লাখ টাকা 'মাত্র'। তাতে নবাবের ব্যয় সংকুলান হওয়া কঠিন। এত কলাবৎ বাইজী নিযুক্ত করা দরবার। বিরাট হারেম। পোষ্য আত্মীয়স্বজনদের গোষ্ঠী। নবাবজাদা ও নবাবজাদীদের

সংখ্যাই চল্লিশের অধিক। নানা শ্রেণীর পরিচারকবর্গ। জীবজন্তু আর তত্ত্বাবধায়করা সমেত চিড়িয়াখানা। মুদ্রণ ও প্রকাশনের লোকজনদের নিয়ে ছাপাখানা, যার মুদ্রিত গ্রন্থাবলী বিনামূল্যে উপহারের জন্যে। তা ছাড়া নবাবের খেয়াল খুশি মর্জিমাফিক কেনাকাটার বহর। এত কাণ্ডর পক্ষে মাসিক লক্ষ তনখা অল্প বৈকি। তাই মাঝে মাঝে খালি হয়ে যায় ওয়াজিদ আলীর দরাজ হাত। আর অযোধ্যা নবাব বংশের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত জহরৎ সম্ভারে টান পড়তে থাকে।

এইভাবে চলে বছরের পর বছর। অব্যাহত বিলাসের নবাবী ধারা। প্রায় ষাট বছর বয়সেও তাঁর নবাগতা বেগমের কথা জানা যায়। সম্ভবত বাইজী থেকেই উন্নীতা! সে অন্তরালবর্তিনী পর্দানসীনার গান একদিন ভেসে আসে দরবারে, নবাবেরই ইচ্ছায়। এ সব রকমের শখ তাঁর শেষ পর্যন্ত থাকে। আর গল্প কথার মতন ওয়াজিদ আলীর দিলদরিয়া নজর।

একটানা ত্রিশ বছরের নবাবীয়ানা মেটিয়াবুরুজে। ইংরেজ সরকারের ওই বাঁধা বৃত্তিতে কি পোষায়? হাত তো পড়বেই লক্ষ্ণৌ থেকে আনা সোনা দানা মুক্তা জহরতে।

অযোধ্যা থেকে দুটো সোনার পালংকও আসবাব পত্রের সঙ্গে এসেছিল। নবাব তার একটি গালিয়ে ফেলেন মুচিখোলায় আসবার আট বছর পরেই, ১৮৬৪তে (Private life of an Eastern King, P. 242—Knighton William)।

তেমন তেমন বেগমদের খাস তহবিলও কত। নবাবের তখন কলকাতায় আসবার কথা হচ্ছে সরকারী বৃত্তি নিয়ে। বড়ী বেগম নাকি শুনে বলেছিলেন, 'ইংরেজের কাছে হাত পেতে ও টাকা নেবার দরকার নেই। আমার সব মণি-মানিক আপনাকে দেব।'

কিন্তু ওয়াজিদ আলী রাজি হননি বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা ছাড়তে। সর্বনাশের মধ্যে যথা লাভ। ও তনখা না পেলে রাজ্য হারিয়েও এমন নবাবী কি চলত?

আউধ তোশাখানার ঝড়তি পড়তি মোহর জহর সোনা চাঁদিও শেষ পর্যন্ত তলানিতে ঠেকে। নবাবের শেষ দিনের আগেই। তারপর দেনার খাত শুরু।

তবু বদলায় না মজ্জাগত নবাবী স্বভাব। সেই লক্ষ্ণৌয়ী দিল্ আর লালচ্ নাচিয়ে রাখে মেটিয়াবুরুজের নবাবকে। বয়সকালেও রেহাই নেই।

সেই পরীখানা আর হারেম। আসরে মজলিসে নাচ গান বাজনায়। ইলাহী খানাপিনার বহর। ওদিকে শাহী চিড়িয়াখানা। এদিকে মঞ্জিলে বুলবুলি আর হরেক রকম কবুতরের ঝাঁক। রকমারি লোক লস্কর খিদমদগার। হাজারো খেয়াল, ভোগ বিলাস, আরাম। নির্বাসিত জীবনেও কোন বিরাম কি তারতম্য নেই। শেষ পর্যন্তই যেন অযোধ্যার নবাব। হারিয়ে গেছে কেবল সিংহাসনটা আর নগদা আদায়। হালচাল্ দেখে বৃটিশ সরকার নিশ্চিন্ত থাকে আসল বিষয়ে। আউধের দাবিদারী হিম্মৎ ওয়াজিদ আলীর ধাতে কোনদিনই হবে না।

কিন্তু সবেরই তো শেষ আছে ইহ জগতে। তাই একদিন সেই অমোঘ অন্তিমক্ষণ ঘনিয়ে এল। লক্ষ্ণৌ থেকে যাত্রা করা নবাবীর পরিসমাপ্তি ঘটল মেটিয়াবুরুজের কোঠিতে। ১৮৮৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর। বয়স তখন পঁয়ষট্টি বছর। ওয়াজিদ্

আলী শাহ্ সব ভোগ দুর্ভোগের পারে চলে গেলেন।

যে ভাঁটার ঢল্ নামছিল তাঁর প্রবীণ পর্বে, তাতেই ভেসে গেল মুচিখোলার নবাবী এলাকা। বিশাল শাহী পরিবার দেখতে দেখতে ছত্রভঙ্গ। টুকরো টুকরো শরিকানি ছাড়িয়ে পড়ল মেটিয়াবুরুজের এখানে সেখানে, খিদিরপুরে, ওয়েলেস্লী অঞ্চলে। কসরুল বায়জা, নুর মঞ্জিল আর আর শাহী মোকান হস্তান্তরিত হল। এসব স্থাবর সম্পত্তির উত্তাধিকারী তখন বিগত নবাবের উত্তমর্ণ এক বাঙালী ধনকুবের। আবার পরবর্তী মালিক হলেন নতুন ক্রেতা, নতুন যুগের এক বণিক পতি।

মুচিখোলার ভুগোল আবার নতুন করে ওলটপালট হয়ে গেল। কোথায় সেই প্রতাপাদিত্য আমলের মাটির গড়—বাংলার নবাবী আমলের মাটির বুরুজ—ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাসাঞ্চল—নির্বাসিত লক্ষ্ণৌ নবাবের মঞ্জিল, দরবার! গঙ্গাতীরের সেই সব কোঠি বাগ বাগিচা নিশ্চিহ্ন হতে লাগল। গড়ে উঠল ইস্পাহানি জুট মিল ইত্যাদি যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান। মধ্যযুগ থেকে যন্ত্রযুগের আবর্তন।

বিশ শতকের মেটিয়াবুরুজ কল-কারখানার চেহারা নিয়ে দেখা দিতে লাগল। ওয়াজিদ আলীর সমাপ্তি পর্যায়ের সব বিচরণ ক্ষেত্র লুপ্ত হল নতুন নতুন শেড আর গুদামঘরে। বিশাল ওয়ারহাউসের কোথায় আত্মগোপন করে সাধের নুর মঞ্জিল। অষ্টপ্রহর সুর মুখর কসরুল বায়জার দরবার চব্বিশ ঘণ্টার ঘর্ঘর রবে কবে বিলীন হয়ে গেছে।

কেবল আছে নবাব ও তাঁর পরিবারবর্গের নমাজপড়া মসজিদটি। আর সেকালের একটি স্বাক্ষর মেটিয়াবুরুজ ইমামবাড়া। তারই একটি সজ্জিত কক্ষে রক্ষিত নবাবের মরদেহের অবশেষ।

কোন্ শূন্যে মিলিয়ে গেছে সেই সব গানের রেশ—

যব্ ছোড়্ চলি লখ্নৌ নগরী……

কিংবা—বাবুল মোরা নৈহারা ছুট্ যায়……

মেটিয়াবুরুজে গঙ্গার ধার থেকে বাতাস হাহাকার করে বেড়ায়।

গ্রন্থপঞ্জী

Lucknow (The Capital of Oudh)—Herbert Andrews New
Reminiscences of the great mutiny—William Forbes Mitche
Historic Lucknow—Sidney Hey
Hazrat Wajid Ali Shah King of Oudh—A. C. Bose
Private life of an Eastern King—William Knighton
Elihu Jan's story or the Private life
of an Eastern Queen—William Knight
Journey through the Kingdom of Oudh in 1849—
—W. H. Sleem
1857—Surendra Nath Sen
Reminiscences and Recollections—Nagendra Nath Gupta
Lucknow, past and present—Ikramuddin Kidwai
The Pictorial Lucknow—Purna Chandra Mukherjee
Squires and Sepoys—Lionel Dawson
Lucknow the last phase of an oriental
culture—Abdul Halim Shar
The First two Nababs of Oudh—A. L. Srivastava
Day by day Lucknow—a journal of the
siege of Lucknow—Adelaide Ca
Lt. General Sir James Outram's campaign in India, 1857-58.
My Brothers' Face—Dhan Gopal Mnkherjee

কমলাকান্ত—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অতুলপ্রসাদ—বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
রাজস্থান কাহিনী—কালিকারঞ্জন কানুনগো
পুরানো লখনউ—আবদুল হলীম শরর
বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়